ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

Fish Culture & Breeding-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন
বিএসসি, ফিশারিজ (অনার্স)
এম.এস.ইন একোয়াকালচার

সম্পাদক

ড. মোঃ আনিচুর রহমান মৃধা
এম.এস.ইন ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড লিমনোলজি
পিএইচ.ডি (একোয়াকালচার)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২ (প্রথম পত্র)

বিষয় কোড- ৭৫১৪, নবম শ্রেণি

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মৎস্য চাষের জন্য রেণুপোনার গুণগত মান ও পরিমাণ	১-১১
দ্বিতীয়	মৎস্য প্রজনন	১২-২৮
তৃতীয়	হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা	২৯-৪২
চতুর্থ	মাছের প্রণোদিত প্রজননে প্রয়োজনীয় উপকরণ	৪৩-৪৯
পঞ্চম	প্রণোদিত প্রজননের জন্য ব্রুড মাছ লালন-পালন	৫০-৬৯
ষষ্ঠ	চাষযোগ্য মাছের পরিপক্বতা ও প্রজনন আচরণ	৭০-১১৮
সপ্তম	হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণ	১১৯-১২৪
	ব্যবহারিক	১২৫-১৪২

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২ (দ্বিতীয় পত্র)

বিষয় কোড- ৭৫২৪, দশম শ্রেণি

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ব্রুড মাছ পালন, রেণু ও ধানী পোনা উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা	১৪৩-১৭৫
দ্বিতীয়	মাছের কৌলতাত্ত্বিক উন্নয়ন ও ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা	১৭৬-১৯৫
তৃতীয়	পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	১৯৬-২০৩
চতুর্থ	কৃত্রিম প্রজননের জন্য পিজি দ্রবণ তৈরি, ইনজেকশন প্রয়োগ ও প্রণোদিত প্রজনন	২০৪-২২২
পঞ্চম	মাছের রেণু ব্যবস্থাপনা	২২৩-২৫৮
ষষ্ঠ	মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন কৌশল	২৫৯-২৭২
	ব্যবহারিক	২৭৩-২৯৬

প্রথম পত্র

প্রথম অধ্যায়

মৎস্য চাষের জন্য রেণু-পোনার গুণগত মান ও পরিমাণ

প্রকৃতির অফুরন্ত দান জলজ সম্পদে পরিপূর্ণ এই বাংলাদেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকে মাছ এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা এদেশের জনগণের জীবন যাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই দশক আগেও এদেশে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পোনার প্রায় পুরোটাই প্রাকৃতিক উৎস অর্থাৎ নদ-নদী থেকে সংগ্রহ করা হতো। মিঠা পানির মাছ প্রধানত তিন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন করে–

১. বদ্ধ জলাশয়

২. স্রোতশীল নদী ও খাল এবং

৩. প্লাবন ভূমি।

(১) বদ্ধ জলাশয় :

বদ্ধ জলাশয়ে প্রজননকারী মাছের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে। কিছু মাছ যাদের আঠালো ডিম যেমন- শিং, মাগুর এরা ডুবন্ত ঘাস, নুড়ি বা ডুবন্ত কোনো বস্তুর গায়ে ডিম ছাড়ে। আবার যাদের ডিম ভাসমান থাকে যেমন : মলা, ঢেলা; এরা পানির মধ্যে ডিম ছাড়ে। কিছু কিছু মাছ মাটিতে সামান্য গর্ত করে সেখানে ডিম পাড়ে, যেমন তেলাপিয়া। অনেক ছোট ছোট মাছ আছে যারা গাছের শিকড়ে বা ঘাসের মধ্যে বুঁদবুঁদের সাহায্যে ফেনার মতো বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে। যেমন- খলিশা, বেলে ইত্যাদি।

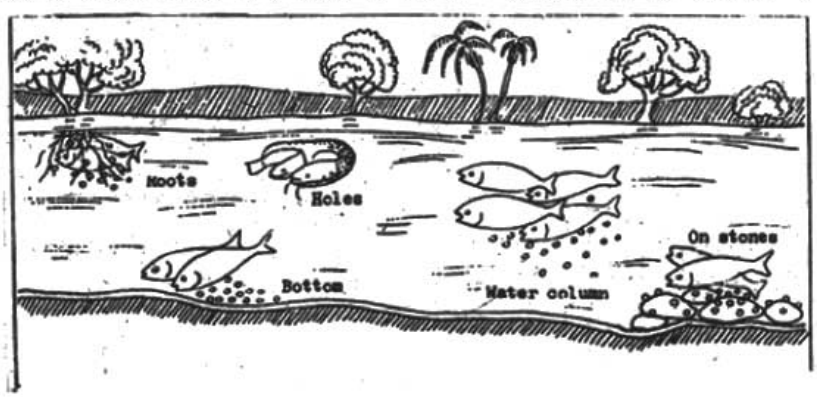

ক. নদী

২) স্রোতশীল নদী ও খাল :

যেসব মাছের ডিম আঠালো নয় তবে ভাসমান এবং ঘূর্ণায়মান প্রকৃতির এমন সব মাছ স্রোতশীল নদী বা খালে প্রজনন করে থাকে। স্রোতশীল পরিবেশের সুবিধা হলো এখানে ডিম বা রেণু অনবরত চলমান থাকে এবং অনেক সময় ঘোলা পরিবেশে এরা বেশি নিরাপদ ও থাকে। নদীর স্রোত এসব সদ্য ফুটে বের হওয়া রেণু

পোনাকে প্লাবিত অঞ্চলে নিয়ে যায় যেখানে এসব রেণুপোনা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। স্রোতশীল পরিবেশে প্রজনন করে রুই, কাতলা, গ্রাসকার্প, সরপুঁটি, পাঙ্গাশ প্রভৃতি প্রজাতির মাছ।

মিঠাপানির মাছের প্রজনন স্থানগুলো নিম্নরূপ :

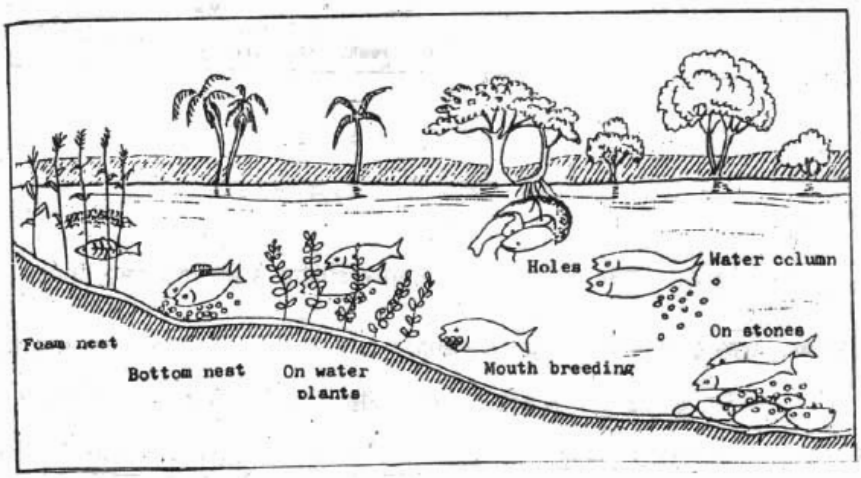

খ. বদ্ধ জলাশয়

৩। প্লাবন ভূমি :

সদ্য প্লাবিত জলাভূমিকে আদর্শ প্রজনন স্থান হিসেবে অনেক মাছই ব্যবহার করে। এ রকম জলাশয়ের সুবিধা হলো এসব জায়গায় সদ্য প্রজননকৃত ডিম বা পোনার তেমন কোনো শিকারি বা শত্রু থাকে না অথচ পোনা বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকে। উপরোক্ত সদ্য প্লাবিত এলাকার পানি যথেষ্ট উষ্ণ ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ বলে ডিম বা পোনার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়ক। চাষযোগ্য মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কমন কার্প সদ্য প্লাবিত জলাভূমিতে প্রজনন করে। এছাড়া অন্যান্য অনেক প্রকার ছোট মাছ প্লাবন ভূমিতে প্রজনন করে।

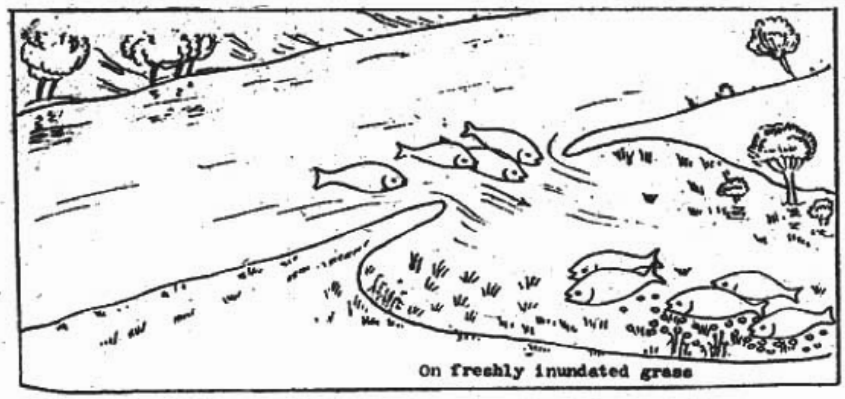

গ. সদ্য প্লাবিত এলাকা

মাছ চাষের ক্ষেত্রে একসময় মূলত ধনী শ্রেণির লোকেরা জেলেদের নিকট থেকে আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে রুই জাতীয় মাছের আঙ্গুলী পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে মজুদ করত। জেলেরা আষাঢ়-শ্রাবন (জুন-জুলাই) মাসে অমাবস্যা রাতে সূক্ষ্ম জাল দিয়ে নদী থেকে রেণুপোনা সংগ্রহ করত।

বাংলাদেশের সকল নদ-নদীতে সব ধরনের পোনা পাওয়া যায় না। পোনা সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর উপ নদী হালদা এবং যমুনা নদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে নদীর যেসব স্থানে মাছের ডিম ও রেণু পোনা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় সেগুলোর প্রধান কয়েকটির নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

i. **হালদা নদী :** চট্টগ্রাম, মদনঘাট, সাঘাটা, রামদাসহাট ও নয়ারহাট।

ii. **যমুনা নদী :** রংপুরে ফুলবাড়ি ঘাট, মানিকগঞ্জের আরিচা ঘাট, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা এবং যমুনার পার্শ্ববর্তী বাহাদুরাবাদ ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট, সিরাজগঞ্জ ঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা।

iii. **ব্রহ্মপুত্র নদ :** ময়মনসিংহ শহরের পার্শ্ববর্তী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ।

iv. **পদ্মা নদী :** রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ঘাট, ফরিদপুর জেলার সি অ্যান্ড বি ঘাট, পাবনার পাকশি ঘাট, কুষ্টিয়ার রায়টা ঘাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিকটস্থ পদ্মা নদী।

v. **গড়াই নদী :** কুষ্টিয়া, কুমারখালী।

vi. **মধুমতি নদী :** ফরিদপুরের কামারখালী ও যশোরের শ্রীপুর ও লোদাপাড়া।

vii. **আড়িয়াল খাঁ নদ :** ফরিদপুরের কবিরাজপুর, মানিকগঞ্জ জেলার তরা ঘাট থেকে শেখ ঘাট পর্যন্ত সংলগ্ন এলাকা।

viii. **বড়াল নদী :** বড়াল নদী যেখানে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার অন্তর্গত আড়ানী রেল স্টেশন পর্যন্ত।

ফরিদপুরের টেকেরহাটের নিকটস্থ কুমার নদে ও পোনা মাছ ধরা হয়ে থাকে। ময়মনসিংহের উত্তরে বেগুনবাড়ি রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শুরু করে দক্ষিণে কালি বাজার রেল স্টেশনের পার্শ্ববতী এলাকায় ধানী পোনা পাওয়া যায়। এছাড়া তিস্তা, কংস, সোমেশ্বরী, কালীগঙ্গা, কুমার নদীও পোনা প্রাপ্তির জন্য একসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পোনা সংগ্রহ পদ্ধতি :

জেলেরা সাধারণত নিম্ন লিখিত দুই ভাবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছের রেণু-পোনা সংগ্রহ করে থাকে।

১) সাভার বা বেহুন্দি জালের মাধ্যমে ও

২) টানা জাল দিয়ে।

চিত্রঃ সাভার বা বেহুন্দী জাল।

১) সাভার বা বেহুন্দি জালের মাধ্যমে :

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলোই কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক রেণু-পোনার প্রধান উৎস। মুলতঃ বর্ষাকালে (মে-আগস্ট) দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো থেকে কোটি কোটি রেণু-পোনা ধরা হয়। নদী থেকে রেণু-পোনা ধরার কাজে কয়েকজন জেলে মিলে একটি দল গঠন করে থাকে। রেণু-পোনা ধরার জন্য বিশেষ এক ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। যাকে সাভার জাল বলে। জালের দৈর্ঘ্য ৩০০-৩৬০ সে.মি. জালের মুখ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ২৪০-৩০০ সে.মি. শেষের খোলা মুখ ১৫-২২ সে.মি. এর মতো গোলাকার অঙ্গুরি থাকে। অবশেষে গামছা থাকে ৭৫-৯০ সে.মি. মাপের। ২টি বাঁশের খুটির সাহায্যে জাল খাটানো হয়। পিছনে ২টি বাঁশের খুঁটি থাকে। গামছার শেষ অংশে ২টি বাঁশের খুঁটি থাকে। জালের বড় মুখ স্রোতের দিকে থাকে। পানির স্রোতের সাথে রেণু-পোনা জালের মধ্যে আসে, পানি বেরিয়ে যায়, রেণু পোনা আবদ্ধ হয়। জালের শেষের দিকে ছোট গোলাকার খোলা মুখ থাকে তাতে বাঁশের বা বেতের তৈরি একটি গোল ধরনের অঙ্গুরি থাকে এবং রেণু-পোনা ধরে রাখবার জন্য গামছাটি চতুষ্কোণ করে সাজানো হয়। যাতে অঙ্গুরির মধ্য দিয়ে রেণু পোনা এসে গামছায় জড়ো হয় এবং বেঁচে থাকে। গামছা উঠিয়ে মাঝে মাঝে রেণু-পোনা এনে হাঁড়ির উপর ঘন জালের ছাঁকনি বিছিয়ে ঢালা হয়। এতে রেণু-পোনার সাথে যদি অন্যান্য ছোট মাছ বা ময়লা থাকে তা ছাঁকানি দিয়ে বাদ দেওয়া হয়। তারপর জীবিত রেণু-পোনা সাময়িকভাবে হাপাতে জমা করা হয়। নদীর কিনারের দিকে যেখানে রেণু-পোনা ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে এরকম অনেক জাল পরপর খাটানো হয় এবং রেণু-পোনা সংগৃহীত হয়, বহু জেলে সাময়িক ভাবে নদী থেকে রেণু-পোনা ধরার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

চিত্র : নদী থেকে রুই-কাতলা মাছের রেণুপোনা সংগ্রহ

২) টানা জাল দিয়ে পোনা সংগ্রহ পদ্ধতি :

আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ জাল দিয়েই পোনা সংগ্রহ করা হয় বেশি এবং এই জাল দিয়ে পোনা সংগ্রহ করা খুবই সহজ ও যে কেউ সহজে পোনা ধরতে পারে। এই জাল তৈরি করা খুবই সহজ এবং ব্যয় কম। আমাদের দেশে বর্ষাকালে বা মাছের প্রজনন মৌসুমে দেশের সমুদ্রের মোহনায়, নদীর কিনারায়, প্লাবন ভূমি, বিল প্রভৃতি স্থানে পোনা সংগ্রহ করা হয়। এই ক্ষেত্রে তিনটি বাঁশের অংশ দ্বারা ত্রিভূজ আকৃত্রির একটি ফ্রেম প্রথমে তৈরি করা হয় যার একটি বাঁশ লম্বা থাকে যা হাতলের কাজ করে। এরপর সূক্ষ্ম নাইলনের জাল বা সাইন নেটের জাল ৪ কোনোাকৃতির লম্বা করে তৈরি করা হয়। যার পেছনের পাশ সরু এবং সামনের অংশ প্রশস্ত থাকে। জালের প্রশস্ত অংশটি ফ্রেমের সাথে চিকন নাইলনের সুতা দ্বারা বাঁধা থাকে। যাতে ফাঁকা হয়ে না যায়। চার মাথায় চারটি লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। পোনা ধরার সময় জালের ফ্রেমসহ প্রশস্থ অংশটি অগভীর জলাশয়ের নিচে রাখা হয়। জালের তিন ভাগ পানির নিচে থাকে এ অবস্থায় জালের পিছনের অংশ স্রোতের দিকে বা টানার বিপরীত দিকে টানটান করা অবস্থায় বা লম্বা অবস্থায় থাকে। সুতা চারটি এক এক করে একত্র করে এবং নিচের সুতা দুটি একটু ঢিল দিয়ে উপরের অংশ দুটি ধরে ক্রমান্বয়ে টানতে হয়। এভাবে জাল টানার ফলে পোনা সহজেই ফ্রেমের মধ্য দিয়ে জালের শেষ প্রান্তে গিয়ে আটকে যায়। কিছু সময় পর জালের মধ্য হতে নির্দিষ্ট প্রজাতির পোনা সংগ্রহ করে পোনা হাঁড়িতে রাখতে হয়। কিন্তু নদ-নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাঁধ তৈরির মাধ্যমে মাছের চলাচলের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, প্রজননক্ষম মাছের অতি আহরণ এবং মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন– কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, পানি দূষণ, কারেন্ট জালের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এসব মাছের পোনার উৎস ধ্বংসের

মুখে। এখন এসব স্থানে খুব সামান্য পরিমাণ মাছের পোনা পাওয়া যায়। আর তাই মানুষ এখন মাছ চাষের জন্য হ্যাচারির পোনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

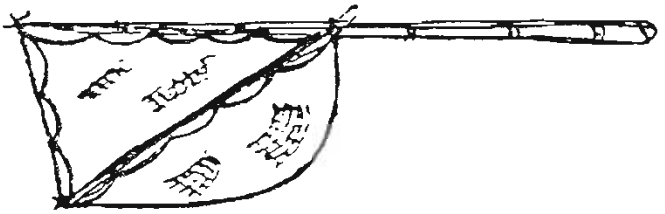

চিত্র : টানা জাল

প্রাকৃতিক পোনার সুবিধা :

i. প্রাকৃতিক পরিবেশে পুরুষ এবং স্ত্রী ব্রুড মাছে অবাধে প্রজনন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সুযোগ পায় এবং মাছের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পরিবেশের পূর্ণ অনুকূল অবস্থায় প্রজনন ঘটে, তাই রেণু পোনার গুণগত মান ভালো থাকে।

ii. পোনা দ্রুত বর্ধনশীল।

iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।

iv. পোনার মৃত্যুহার কম।

প্রাকৃতিক পোনার অসুবিধা :

i. আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলে প্রাকৃতিক উৎসের পোনা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

ii. কাঙ্ক্ষিত মাছের পোনার সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত মাছের পোনা চলে আসতে পারে।

iii. পোনা মিশ্রণ থাকায় অনেক সময় চাষাবাদে আশানুরূপ লাভ হয় না।

হ্যাচারির পোনার সুবিধা :

i. প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

ii. মাছের পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

iii. চাহিদা আনুসারে একক প্রজাতির বা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করা যায়।

iv. পোনার মৃত্যুর হার কম হয়।

v. গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুডমাছ ব্যবহার করা হলে মাছের বৃদ্ধির হার ভালো হয়।

হ্যাচারির পোনার অসুবিধা :

i. ইদানীং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, দৈহিক বিকৃতি, রোগ-বালাই এবং ব্যাপক মৃত্যুহার সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে ধারণা করা যায় যে, পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন,

প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাইয়ে অসচেতনতা (অর্থাৎ নেগেটিভ বা ঋনাত্বক নির্বাচন প্রবণতা) এবং অপরিকল্পিত সংকরায়ণজনিত কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

ii. ব্রুড মাছের গুণগত মান বজায় রাখা না হলে পোনার বৃদ্ধি আশানুরূপ নাও হতে পারে।

iii. আবহাওয়াগত বার্ষিক গড় অবস্থা মাছের পরিপক্বতার জন্য অনুকূলে না থাকলে সঠিক সময়ে পোনা না-ও পাওয়া যেতে পারে।

নিম্নে বাংলাদেশের রেণু পোনার উৎপাদনের বিবরণ দেওয়া হলো :

রেণুর উৎস		বছর						
		১৯৮৭	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	২০০৪	২০০৭
প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ (কেজি)		২২০০৮	৯১৪৪	২৩৯৯	২৮২৪	২৮৮৫	১৫৭৭	২০৬১
হ্যাচারির উৎপাদন	সরকারি	১৪৫৯	৩২৭২	৩৬১৬	৩৮৮৮	৩৭০০	৪৮০২	৬২৪৪
	বেসরকারি	৬৮৮০	৯৭২০৫	১১২৫৯৫	১৩৭০৪২	১১৪৪০০	৩৪৫২২৭	৪৫৭২৮৮
মোট রেণু উৎপাদন	কেজি	৩০৩৪৭	১০৯৬২১	১১৮৬১০	১৪৩৭৫৪	১২০৯৮৫	৩৫১৬০৬	৫৬৫৫৯৩

প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা আহরণের ছক :

বছর	মাছের রেণু (কেজি)
২০০৯	১৯৮৪
২০১০	২২০৪
২০১১	৪৩৭০
২০১২	৪০৯৩
২০১৩	৩৩২৬
২০১৪	২৬৯৫
২০১৬	৪৮১৯

২০১৬ সালে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উৎস থেকে পোনা উৎপাদনের ছক :

পোনার উৎস	হ্যাচারির সংখ্যা	রেণু উৎপাদন (কেজি)	%
প্রাকৃতিক উৎস		৪৮১৯	০.৭৮
কৃত্রিম উৎস (সরকারি হ্যাচারি)	৮৯টি	১৪৭৭৫	২.৪০
কৃত্রিম উৎস (বেসরকারি হ্যাচারি)	৮১৩টি	৫৯৪৮৩৯	৯৬.৮১
মোট-	৯০২টি	৬১৪৪৩৩	১০০

রেণু উৎপাদনের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ২০ বছর আগে দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি আসতো প্রাকৃতিক উৎস অর্থাৎ নদ-নদী থেকে। ১০ বছর আগে প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু উৎপাদন শতকরা মাত্র ১.৪ ভাগ এসে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পোনার উৎস হচ্ছে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র বা হ্যাচারি। ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু উৎপাদন দেশের মোট রেণু উৎপাদনের শতকরা মাত্র ০.৫ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৯.৫ ভাগ পোনার উৎস হচ্ছে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র বা হ্যাচারি, বরং বলা যায় নিকট ভবিষ্যতে মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ বা পোনার শতকরা একশ' ভাগই হ্যাচারি উৎপন্ন পোনা দ্বারা পূরণ করতে হবে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮৯টি সরকারি হ্যাচারি এবং ৮১৩টি বেসরকারি কার্প হ্যাচারি রয়েছে, সেগুলো থেকে বছরে প্রায় ৬০৯৬১৪ কেজি রেণু পোনা উৎপাদিত হচ্ছে।

অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে ভালো পোনার গুরুত্ব :

মৎস্য চাষের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে মৎস্য বীজ অর্থাৎ পোনা প্রধানতম উপকরণ। বীজ ভালো না হলে যেমন- ফসলের ফলন ভালো হয় না, তেমনি পোনা ভালো গুণ-সম্পন্ন না হলে পুকুর বা জলাশয়ে মাছের ফলন ও আশানুরূপ পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সে হারে জমি বাড়ছে না। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার মাছের চাহিদা পূরণ করতে হলে অবশ্যই মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কাজেই অধিক উৎপাদনের জন্য পোনার গুরুত্ব অপরিসীম। মাছের ভালো পোনার যে সমস্ত গুণাবলি থাকা দরকার সেগুলো হলো :

i. পোনা চঞ্চল ও লাফালাফি করবে।

ii. পোনার গায়ের রঙ চকচকে উজ্জ্বল হবে।

iii. পোনা স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটবে।

iv. পোনার পাখনা অক্ষত থাকবে।

v. পোনার শরীরে কোনো দাগ থাকবে না।

আর উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন পোনা উৎপাদনের জন্য প্রধান কাজ হলো প্রত্যেকটি হ্যাচারিতে সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন প্রচুর পরিমাণে জেনেটিক গুণে বিশুদ্ধ ব্রুড মাছ মজুদ এবং পরিচর্যা করা। আর প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণুপোনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা। নদীতে প্রথম প্রজননে উৎপন্ন রেণু পরের দিকে উৎপন্ন রেণু অপেক্ষা অধিকতর ভালো মানের হয়ে থাকে। প্রথম দিকের রেণুপোনায় অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত উৎসের পোনার সাহায্যে মৎস্য চাষ করতে পারলে ভালো ফলন পাওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে। তবে এক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার সাথে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। ইদানীং একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নদীতে রেণু উৎপাদন শুরু হলে নদীর উৎসের পোনার সঙ্গে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা মিশিয়ে অথবা হ্যাচারির পোনাকে নদীর পোনা বলে রেণু ক্রেতাদের প্রতারিত করে থাকে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে নদী উৎসের রেণুপোনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে।

পোনার চাহিদা

জনসংখ্যা বাড়ছে ফলে মাছের চাহিদাও বাড়ছে কিন্তু চাহিদার তুলনায় মাছের উৎপাদন বাড়ছে না। ফলে বাজার মূল্য বেশি হওয়ার মাছ চাষ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। লাভজনক বা পরিকল্পনা

মাফিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে আংশিক আহরণ ও পূনঃমজুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা বছরের এই পোনার চাহিদার তুলনায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনার পরিমাণ খুবই কম। অনুমান করা হয় যে, বর্তমানে উৎপাদিত রেণু থেকে বছরে প্রায় ৮০০-৯০০ কোটি ৮-১০ সেন্টিমিটার আকারে পোনা উৎপাদিত হচ্ছে যদি মৎস্য চাষে সম্ভাবনাময় সকল জলাশয়ে পোনা মজুদ করতে হলে প্রায় ১৭০০-১৮০০ কোটি আঙ্গুলে পোনা (৮-১২ সেন্টিমিটার আকারের) প্রতি বছর উৎপাদন করা প্রয়োজন।

মৎস্য অধিদপ্তরের (২০১৬) পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, রেণু থেকে আঙ্গুলে পোনা (৫-১০ সে. মি. আকারের) বাঁচার হার হলো প্রায় ১০% এবং এটা হওয়ার কারণ হলো যথোপযুক্ত নার্সারি ব্যবস্থাপনা এবং গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছের অভাব। মাছের বয়স, আকার, পরিপক্বতা, ব্রুডমাছের উৎস এবং বংশগত। বর্তমানে অধিকাংশ হ্যাচারিতে নিম্ন মানের পোনা উৎপাদিত হচ্ছে যা মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিষয়টি হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। নিম্নে জলাশয় অনুযায়ী পোনার চাহিদা দেওয়া হলোঃ

জলাশয়	আয়তন (হেক্টর)	মজুদ ঘনত্ব (প্রতি হেক্টর)	পোনার চাহিদা (কোটি)
বার্ষিক পুকুর ও দীঘি	৩,৭২,৪০৫	১০০০০ টি	৩৭২
মৌসুমি ডোবা ও পাগার	১,৩৪,৮৭৬	১৫০০০ টি	২০২
বাঁওড়	৫,৪৮৮	৬০০০ টি	৪
কাপ্তাই হ্রদ	৬৮,৮০০	৪০০ টি	২৮
প্লাবন ভূমি	২৭,০৪,০৮৪	৪০০ টি	১০৮১
হাওর ও বিল	১,১৪,১৬১	৩০০০ টি	৬৮
মোট	৩৩,৯৯,৮১৪	৩৪৮০০	১৭৫৫

পুকুর দীঘিতে মৎস্য চাষ ও মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় দেশে রুই জাতীয় মাছের পোনার চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের সকল পুকুর দীঘির শতকরা ৬০-৮০ ভাগ বর্তমানে মৎস্য চাষের আওতায় আছে। প্রায় অধিকাংশই বাঁওড়েই মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। শতকরা ২০-৩০ ভাগ বিলে ইতিমধ্যে মাছ ছাড়া হয়েছে। কিছু পরিমাণ প্লাবন ভূমিতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বা সমাজভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যেমে পোনা মজুদ করা হচ্ছে।
ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে মাছ চাষ তিন প্রকার :

১। সম্প্রসারিত চাষ।
২। আধা নিবিড় চাষ।
৩। নিবিড় চাষ।

(১) সম্প্রসারিত চাষ : অল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যেমে মাছের চাষাবাদকে সম্প্রসারিত চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব কম হয় এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ কোনো প্রকার সম্পূরক খাদ্যে প্রয়োগ হয় না।

(২) আধা নিবিড় চাষ : কোনো নিয়ন্ত্রণাধীন জলাশয়ে ধারাবাহিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের চাষাবাদকে আধা নিবিড় চাষ বলে। এখানে মজুদ ঘনত্ব একটু বেশি হয় এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু কিছু সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়।

(৩) নিবিড় চাষ : কোনো আবদ্ধ জলাশয়ে সব ধরনের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের চাষাবাদকে নিবিড় চাষ বলে। এক্ষেত্রে মজুদ ঘনত্ব বেশি হয় এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল করে না। সম্পূর্ণ সুষম খাদ্যের উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

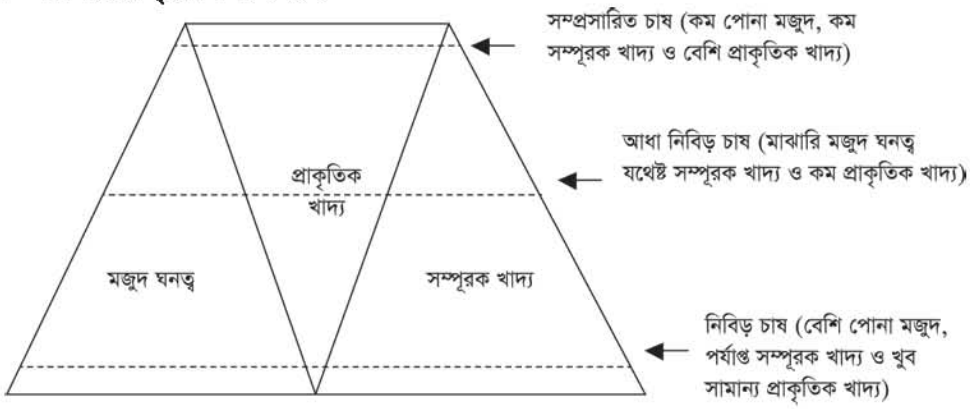

চিত্র : বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি অনুযায়ী মজুদ ঘনত্ব, প্রাকৃতিক খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্যের সম্পর্ক

পূর্ববর্তী ছকে পোনার যে সম্ভাব্য চাহিদা দেখানো হয়েছে তা সম্প্রসারিত বা আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতির জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিক আজকাল যারা মৎস্য চাষে এগিয়ে আসছে, তাদের জন্য নিবিড় চাষ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। নিবিড় চাষ পদ্ধতির জন্য পোনা মজুদের হার সম্প্রসারিত পদ্ধতি বা আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। নিবিড় পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থায় আংশিক ও পুনঃমজুদের জন্য মজুদ মৌসুম ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে অতিরিক্ত পোনা প্রয়োজন এজন্য আধুনিক মৎস্য পোনা ব্যাংক স্থাপন করা হয়। পোনা ব্যাংক হলো এমন একটি স্থান বা জলাশয় যেখানে বেশি ঘনত্বে পোনা মজুদ করে রাখা হয় এবং সেখান থেকে সারা বছর পোনা মাছ আহরণ ও বিক্রি করা হয়। পোনার ব্যাংক হিসেবে পুকুরে সারা বছর পোনা চাষ এবং বিক্রি করে অধিক লাভ করা যায়। পোনা ব্যাংকে মজুদ করা পোনা শীতের পর পর পুকুরে মজুদ করতে পারলে গরমের শুরুতে মাছের বৃদ্ধি শুরু হয় এবং গরম কাল বেশি পাওয়াতে মাছের উৎপাদন খুব ভালো হয়। পোনা ব্যাংক প্রধানত যশোর, নোয়াখালী, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় দেখা যায়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ হ্রাস ও অন্যান্য কাজ তুলনামূলকভাবে কম লাভজনক হওয়ার অনেক চাষি এখন মৎস্য চাষে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। উপরন্তু, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য মৎস্য চাষকে অনেক শিক্ষিত যুবক কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের মানুষ মৎস্য চাষে বর্ধিত হারে আত্মনিয়োগ করবে এবং অধিক পুষ্টি, অধিক অর্থ নিশ্চিত করতে তাদের মেধা, শ্রম ও পুঁজির সম্মিলিত বিনিয়োগ ঘটবে। তাই মৎস্য চাষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বছরের বিভিন্ন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত মানের মাছের পোনার সরবরাহ থাকা একান্তই অপরিহার্য।

প্রশ্নমালা-১

এক কথায় উত্তর দাও :

১। রুই-কাতলা মাছ নদীতে কোন মাসে ডিম দেয়?

২। যমুনা নদী থেকে রুই-কাতলার পোনা ধরা পড়ে এমন একটি ঘাটের নাম লেখ।

৩। ব্রহ্মপুত্র নদের কোথায় রুই-কাতলার প্রাকৃতিক পোনা ধরা পড়ে?

৪। প্রাকৃতিক পোনা কম পাওয়া যাওয়ার একটি কারণ লেখ।

৫। চাষিরা প্রাকৃতিক পোনা মজুদ করতে কেন পছন্দ করে?

৬। প্রাকৃতিক পোনার একটি অসুবিধার কথা লেখ?

৭। পোনা ব্যাংক কাকে বলে?

৮। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে কী পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য প্রয়োজন?

৯। সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব ও সম্পূরক খাদ্য কী পরিমাণ রাখা হয়?

১০। সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি কাকে বলে?

১১। আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতি কাকে বলে?

১২। নিবিড় চাষ পদ্ধতি কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। রুই-কাতলা মাছের প্রাকৃতিক পোনা পাওয়া যায় এমন দুইটি প্রধান নদ-নদীর প্রাপ্তিস্থানের বিবরণ দাও।

২। দেশের বিভিন্ন উৎস হতে রেণু পোনা উৎপাদনের বিবরণ দাও?

৩। বিভিন্ন চাষ পদ্ধতিতে মজুদ ঘনত্ব, প্রাকৃতিক খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্যের সম্পর্ক আলোচনা কর?

৪। হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

৫। ভালো পোনার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ করা হয় এমন পাঁচটি নদী ও পোনা প্রাপ্তির স্থানের নাম লেখ।

২। বর্তমানে দেশে মৎস্য চাষের অবস্থানুযায়ী পোনার প্রাপ্যতা ও ভবিষ্যত চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মৎস্য প্রজনন

প্রজনন হলো একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো জীব বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একই ধরনের বংশধর তৈরি করে থাকে। আর মাছের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে থাকে। মৎস্য প্রজনন বলতে এমন একটি জৈবিক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে মাছ বিলুপ্তি হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একই ধরনের মাছ বা বংশধর তৈরি করে। মাছ যৌন প্রজনন পদ্ধতিতে প্রজনন করে থাকে। সাধারণত সকল মাছই একটি নির্দিষ্ট প্রজনন চক্র অনুসরণ করে। লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য দরকার গুণগত মানের পোনা। আর পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া জানার জন্য প্রজনন জীববিদ্যা ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হবে।

প্রজনন জীববিদ্যা : মৎস্য বিজ্ঞানের যে শাখায় মাছের প্রজনন বয়স, প্রজনন ঋতু, প্রজনন স্থান, প্যারেন্টাল কেয়ার, ফেকান্ডিটি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে প্রজনন জীববিদ্যা বলে। সফল প্রজননের জন্য উপযুক্ত প্রজনন পরিবেশ যেমন- অক্সিজেন, তাপমাত্রা, খাদ্য, স্রোত প্রভৃতির অনুকূল অবস্থা এবং জলজ পরিবেশ শত্রুমুক্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রজনন বয়স : কোনো কোনো মাছ তাড়াতাড়ি প্রজনন পরিপক্ব হয় আবার অনেক মাছ দেরীতে পরিপক্ব হয়। একই প্রজাতির মাছ উষ্ণ মন্ডলীয় এলাকায় অল্প সময়ে আর শীতপ্রধান অঞ্চলে দেরিতে পরিপক্ব হয়। কমনকার্প আমাদের দেশে প্রথম বছরেই প্রজননক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ইউরোপে এরা তিন বা চার বছরে প্রজননক্ষম হয়। একইভাবে চাইনিজ কার্প (গ্রাস কার্প সিলভার কার্প) আমাদের উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলে দুই বা তিন বছরে সাধারণত প্রজননক্ষম হয় অথচ ইউরোপে এদের পরিপক্বতা আসতে পাঁচ থেকে সাত বছর সময় লেগে যায়।

প্রজননের ঋতু : কিছু কিছু মাছ সারা বছর ধরে প্রজনন করে। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অনুকূল তাপমাত্রা পেলেই তারা প্রজনন করে, যেমন-তেলাপিয়া, পক্ষান্তরে অনেক মাছ আছে যারা শুধু বছরের নির্ধারিত ঋতুতে প্রজনন করে। এসব মাছের প্রজনন অঙ্গ নির্দিষ্ট সময় আসার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে এবং একটা পর্যায়ে এসে সুপ্তাবস্থায় থাকে। প্রজনন ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার অপেক্ষায় এ রকম সুপ্ত অবস্থা কয়েক মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। যখন আবহাওয়ার অনুকূল পরিবেশ (যেমন-তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, অক্সিজেন, স্রোত প্রভৃতি) সৃষ্টি হয়, তখন সুপ্ত অবস্থা থেকে প্রজনন ঘটানোর জন্য মাছের দেহাভ্যন্তরে ডিম ও শুক্রাণু যথেষ্ট পরিপক্ব হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সফল প্রজনন ঘটে। মৌসুমি প্রজননকারী মাছের মধ্যে এরকম অনেক মাছ আছে যাদের প্রজনন অঙ্গ বছরের প্রজনন মৌসুম এলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এসে থেমে থাকে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নদীতে ডিম ছাড়ে এমন মাছ পুকুরে রাখলে প্রজননযোগ্য বয়স হলেও বছরের নির্দিষ্ট মৌসুমে এরা ডিম দেওয়ার উপযুক্ত হয়, কিন্তু মুক্ত জলাশয়ের অভাবে এসব মাছের ডিম আস্তে আস্তে শরীরে মিলিয়ে যায়। প্রজননযোগ্য বয়সের মাছে এরকম প্রতি বছর ডিম আসে এবং উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তা আবার শরীরেই শোষিত হয়ে যায়।

প্যারেন্টাল কেয়ার: শত্রুর হাত থেকে ডিম ও বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্য মাছের পিতা-মাতার মধ্যে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তাকে প্যারেন্টাল কেয়ার বলে। প্যারেন্টাল কেয়ার বা বাচ্চার প্রতি যত্ন সদ্যপ্রসূত ডিম বা পোনার বেঁচে থাকার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস যা অনেক মাছের মধ্যেই দেখা যায়। বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর পর যখন এরা খুব নাজুক ও দুর্বল থাকে, তখন প্রজননকারী স্ত্রী-পুরুষ উভয় মাছ একত্রে এসব বাচ্চার পাহারা দেয় এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ মাছই তাদের সদ্যপ্রসূত ডিম ও বাচ্চার যত্ন নেয়। তবে কোনো কোনো প্রজাতিতে প্রত্যক্ষ যত্ন নিতে দেখা যায় আবার কোনো কোনো প্রজাতিতে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু যত্ন নেয়।

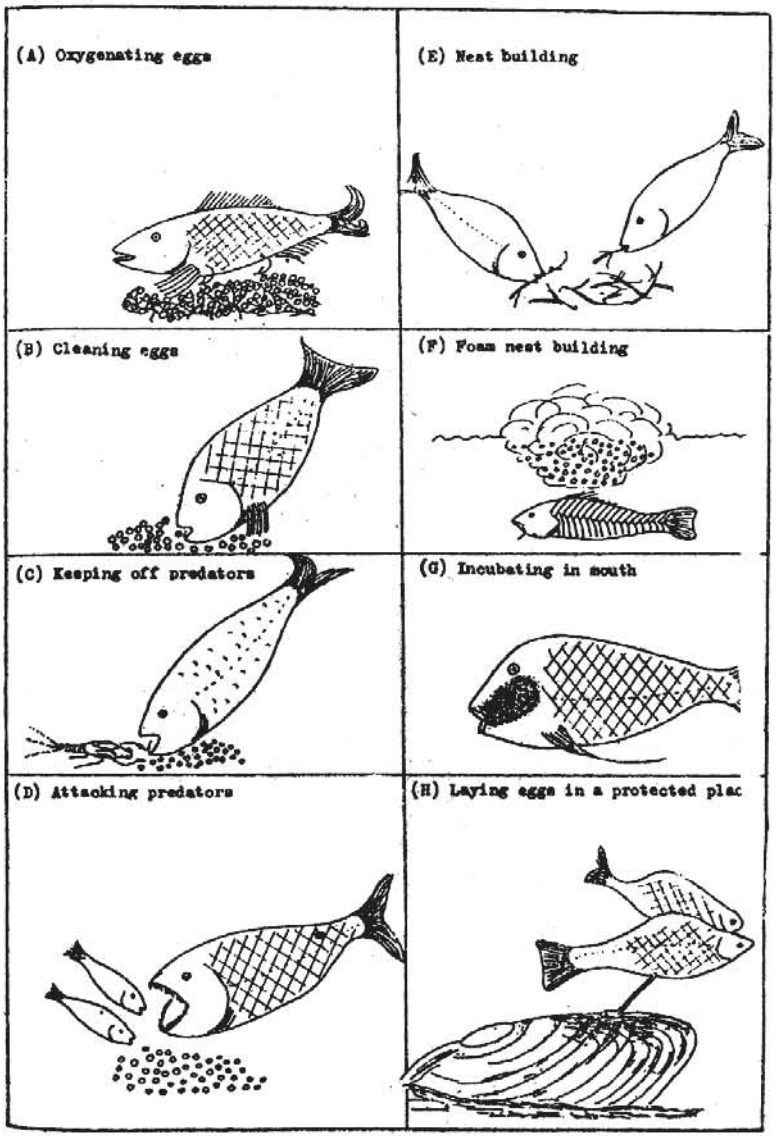

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের প্যারেন্টাল কেয়ার

প্রত্যক্ষ যত্ন : যেসব প্রজাতির মাছের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে বা যে কোনো একজন ডিম, রেণু, পোনা বা বাচ্চার যত্ন নেয় বা পাহারা দেয়, তাকে প্রত্যক্ষ যত্ন বলে (Direct Parental Care)। যেমন- তেলাপিয়া, শোল, টাকি, গজার ইত্যাদি।

পরোক্ষ যত্ন : যে-সব প্রজাতির মাছের প্রজননের সময় নিরাপদ স্থানে প্রজনন করে যেমন বাসা তৈরি করে, ডিম ছাড়ে বা এমন অবস্থায় বা জায়গায় ডিম ছাড়ে যাতে শিকারি বা শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ থাকে এরকম যত্নকে পরোক্ষ যত্ন বলে। যেমন- গোরামি।

ফেকান্ডিটি : কোনো মাছ একবারে যত ডিম পাড়ে, তার সংখ্যাকে ফেকান্ডিটি বলে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ফেকান্ডিটি বিভিন্ন রকম যেমন:

মাছের নাম	ডিমের সংখ্যা
কাতলা	২০০০০-২৪৬০০০ টি
রুই	১০০০০০-৪০০০০০ টি
মৃগেল	৩০০০০-২৫০০০০ টি
সিলভার কার্প	১৬০০০০-৩০০০০০ টি
বিগহেড	১০০০০০-১২৫০০০ টি
গ্রাস কার্প	৪৫০০০-১১৫০০০ টি
সরপুঁটি	২০০০০০-৫০০০০০ টি
পাঙাশ	৬০০০-১০০০০০ টি
১০০ গ্রাম ওজন/পাবদা	২০০০-৫০০০ টি
কমন কার্প	১০০০০০-২০০০০০ টি
ইলিশ	৩০০০০০-২৪০০০০০ টি

প্যারেন্টাল কেয়ারের সাথে মাছের ডিমের সংখ্যার (ফেকান্ডিটির) সম্পর্ক রয়েছে, যেসব মাছ পরোক্ষভাবে তাদের ডিম বা বাচ্চার যত্ন নেয়, তাদের ফেকান্ডিটি বা ডিমের সংখ্যা প্রত্যক্ষ যত্নকারী মাছের তুলনায় বেশি। প্রত্যক্ষ যত্নকারী মাছের ডিমের সংখ্যা, যেসব মাছের কোনো প্যারেন্টাল কেয়ার নেই, তাদের তুলনায় অনেক কম। প্রজননের পর ডিম বা বাচ্চার যত্ন নেয় না এমন মাছের ফেকান্ডিটি বেশি।

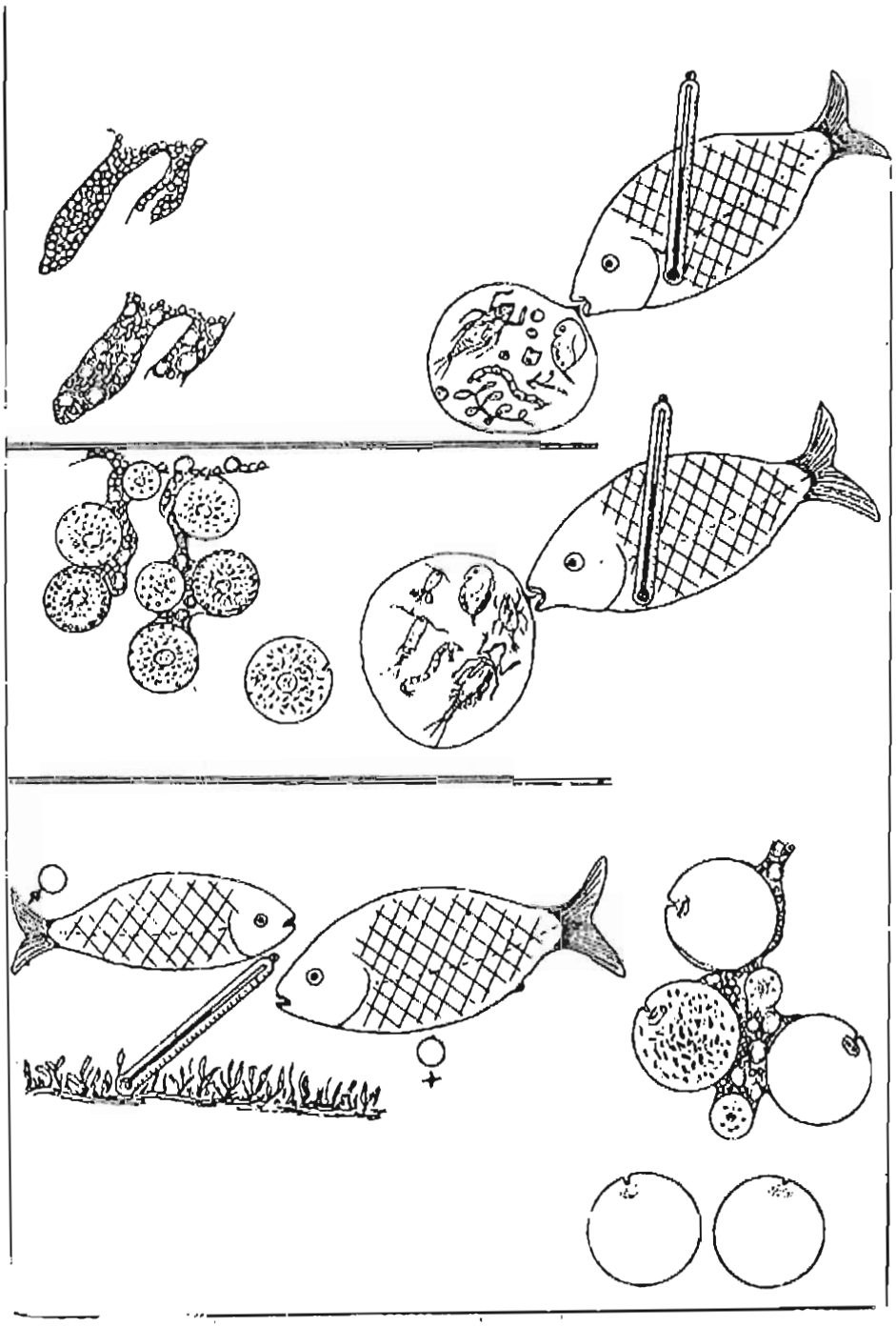

চিত্র : মাছের দেহে ডিমের ক্রমবিকাশ

ডিম ও শুক্রাণুর বিকাশঃ বিভিন্ন প্রকার মাছ বিভিন্ন বয়সে প্রজনন উপযোগী বা পরিপক্ব হয়। পরিপক্ব মাছের দেহে নির্দিষ্ট প্রজনন মৌসুমের প্রাক্কালে ডিম ও শুক্রাণু বিকাশ লাভ করে। মাছের ডিম অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে একটা পর্যায়ে পৌঁছে থেমে থাকে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অনুকূল আবহাওয়ার প্রভাবে পুরুষ মাছের উপস্থিতিতে, এরকম সুপ্ত ডিম পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে প্রজনন ঘটায়। অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ প্রজনন উপযোগী আবহাওয়া না পেলে এবং পুরুষ মাছের অভাবে এরকম সুপ্ত ডিম মাছের দেহে শোষিত হয়ে যায়। ডিমের ন্যায় শুক্রাণুও প্রজনন পরিপক্ব মাছের দেহে তৈরি হয়ে শুক্রাশয়ে জমা হয়। এরকম শুক্রাণু প্রয়োজনীয় প্রজনন পরিবেশের অভাবে মাছের দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সুপ্ত থাকা শুক্রাণু এমনিতে স্থির, তবে পানির সংস্পর্শে এলেই সচল হয়ে পড়ে।

মাছের ভ্রূণের পরিস্ফুটন ও শূকের বৃদ্ধি

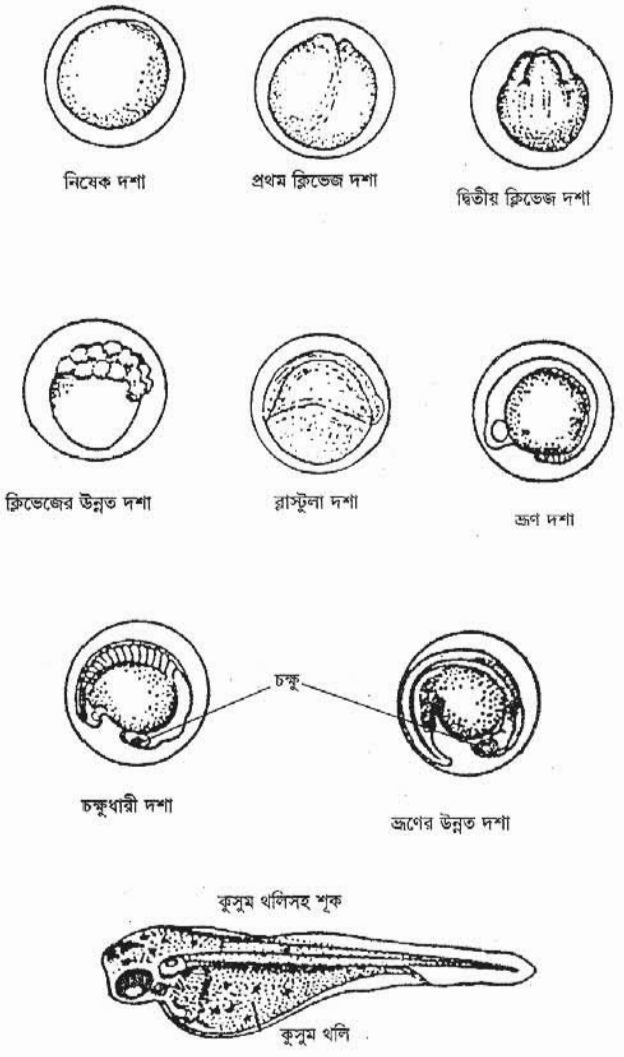

চিত্র : রুই মাছের ডিমের পরিস্ফুটনের বিভিন্ন পর্যায়

নিষিক্ত ডিমের অভ্যন্তরে ভ্রূণের লেজ ও মাথার বিকাশ

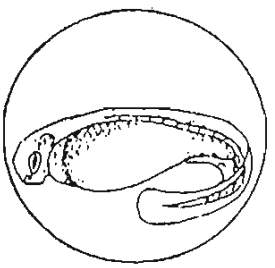

নিষিক্ত ডিম প্রস্ফুটনের জন্য প্রস্তুত

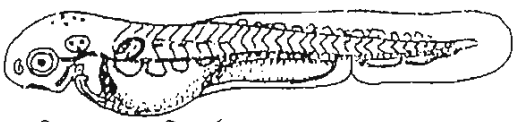

ডিম থেকে সদ্য প্রস্ফুটিত লার্ভা

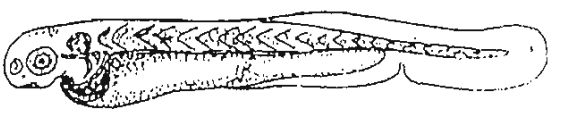

২ দিন বয়সের লার্ভা

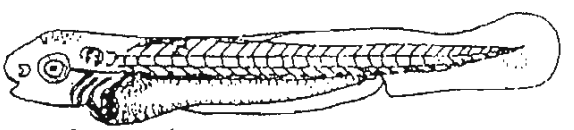

৩ দিন বয়সের লার্ভা

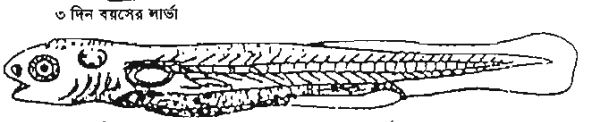

পেটের খাদ্য থলি শুকানোর পর খাবার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত লার্ভা

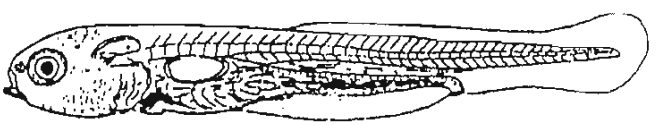

মাছের পোনা

চিত্র : নিষিক্ত ডিম থেকে ভ্রূণ, লার্ভা ও রেণু /পোনায় রূপান্তরের ধাপ।

সচল শুক্রাণু পরিপক্ব ডিমকে নিষিক্ত করার জন্য আধা মিনিট থেকে ১ মিনিট সময়ে পানিতে সাঁতার কাটতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে প্রজনন ঘটার পর পরিপক্ব ডিম পানিতে ছাড়ার সাথে সাথে ডিম ফুটতে থাকে এবং এক মিনিটের মধ্যেই ডিমের মুখ বা ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। তাই ১ মিনিট পরে আর কোনো শুক্রাণু ডিমের মাঝে প্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ প্রজননের সফলতা নির্ভর করেছে শুক্রাণু কর্তৃক দ্রুত ডিমকে খুজে পাওয়ার ওপর শুক্রাণু কর্তৃক ডিমকে খুঁজে পাওয়ার ঘটনাকে নিষিক্তকরণ বলে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এক দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে নিষিক্ত ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাছ চাষের উপযোগী বিধায় অনাদিকাল থেকে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। ফলে মাছ চাষের চেয়ে আহরণই ছিল এদেশের মাছ প্রাপ্তির প্রধান উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মনুষ্য সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদন ও প্রাপ্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে মাছ চাষের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাছ চাষের ক্ষেত্রে মূলত ধনী শ্রেণির লোকেরা জেলেদের নিকট থেকে আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে রুই জাতীয় মাছের পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে মজুদ করত। এ পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন মাছ চাষ হয়ে আসছিল। ষাটের দশকে মাছের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে ১০১টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করা হয়। এসব খামারে প্রাকৃতিক উৎস যথা- হালদা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি,পদ্মা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু বা ডিম পোনা সংগ্রহ করে এ সমস্ত খামারে প্রতিপালন করা হতো এবং ২-৩ ইঞ্চি আকারের বৃদ্ধি করে মাছ চাষির নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হতো। স্বাধীনতা উত্তরকালে রেণু পোনার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু প্রাকৃতিক উৎসের পোনা প্রাপ্তি কমতে থাকে এর ফলে রেণু প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশির দশকের শুরুতে বাণিজ্যিকভাবে সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মাছের পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস বা হরমোন, প্রজনন উপযোগী স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে ইনজেকশন দেবার পরে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছ শুক্রাণু নিক্ষেপ করে ডিমগুলো নিষিক্ত করে। এভাবে হরমোন ইনজেকশন দিয়ে যে প্রজনন করা হয় তাকে প্রণোদিত প্রজনন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাছের প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাছকে প্রজননে বাধ্য করা হয় সেই প্রক্রিয়াকে প্রণোদিত প্রজনন বলে।

প্রণোদিত প্রজননের উদ্দেশ্য :

১। মাছের পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভর করতে হয় না।

২। প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

৩। চাহিদা অনুসারে একক প্রজাতির বা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করা যায়।

৪। সুস্থ ও সবল পোনা উৎপাদন করা যায়।

৫। বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রজনন মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

৬। বিরল প্রজাতির বা প্রায় অবিলুপ্ত প্রজাতির মাছের প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে মাছের বিলুপ্তি রোধ করা যায়।

৭। উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়।

প্রণোদিত প্রজননের পটভূমি :

মাছ চাষের ইতিহাস এদেশে দীর্ঘদিনের হলেও মাছের কৃত্রিম প্রজননের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। আমাদের দেশে যদিও এ যাবত স্বাদু পানির ২৫০ প্রজাতির মাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিধায় রুই জাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন জনপ্রিয়তা পেয়ে আসছে। ১৯৬৫ সালে স্বাদু পানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র চাঁদপুরে ডঃ মোঃ ইউসুফ আলী (তৎকালীন উপ-পরিচালক পরবর্তীতে সচিব) সর্বপ্রথম এদেশে রুই জাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেন। দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কৃত্রিম প্রজনন প্রাথমিক সফলতা লাভ করলেও বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করতে পারেনি। জাঙ্গালীয়া মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার কুমিল্লায় জনাব হাসান মাহমুদ ও জনাব ওবায়দুল হক (তৎকালীন খামার ব্যবস্থাপক পরবর্তীতে যথাক্রমে উপ-পরিচালক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ রেণু উৎপাদনে তখনও সফল হননি। অন্যান্য মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার যেমন যশোর, বরিশাল, মাসকান্দা খামারে উদ্যোগ নিয়ে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হলেও বাণিজ্যিক উৎপাদনে সফলতা লাভে বিলম্ব হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাদু পানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে বিদেশ থেকে বেশ কিছু সিলভার কার্প মাছের পোনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, এদেশে চাষাবাদের লক্ষ্যে। এ মাছগুলো ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে পরিপক্বতা লাভ করে এবং তখন থেকে কৃত্রিম প্রজনন প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হলেও কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ (তৎকালীন সিনিয়র রিসার্চ অফিসার পরবর্তীতে মহাপরিচালক) এবং জনাব হারুনুর রশিদ ও জনাব তারিকুল আলম সাইদুন্নবী (তৎকালীন এআরও বর্তমানে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা) স্বাদু পানি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রে সিলভার কার্প মাছের প্রথম সফলভাবে কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হন। বর্তমানের সারা বাংলাদেশে যেসব সিলভার কার্প পাওয়া যাচ্ছে তার বেশির ভাগই উক্ত প্রজননকৃত মাছ থেকে প্রাপ্ত।

১৯৭৮-৭৯ সালে চীন সরকারের সাথে ১২০ জন বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের জন্য চুক্তি করা হয়। ঐ চুক্তির মধ্যে ১২০ জন কর্মকর্তাকে ৩টি ব্যাচে কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সে সময় স্বাদু পানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র চাঁদপুরে জনাব এ. কে. আতাউর রহমান (উপ-পরিচালক পরবর্তীতে মহাপরিচালক) চীন থেকে বাণিজ্যিক হ্যাচারির ১টি নকশা সংগ্রহ করেন। উক্ত নকশার আলোকে স্বাদু পানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে একটি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়। এ হ্যাচারিটির মডেল প্রণয়ন করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রক্ষিত কুমার রায়। হ্যাচারিটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ নাসির আহমেদ (তৎকালীন ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা পরবর্তীতে মহাপরিচালক) এবং জনাব সুখেশ চন্দ্র ধর (তৎকালীন গবেষণা কর্মকর্তা পরবর্তীতে উপ-পরিচালক)। উক্ত হ্যাচারিতে ১৯৮০ সালে প্রথম এ দুইজন কর্মকর্তা অন্যান্য সহকর্মীর সহায়তায় বাণিজ্যিকভাবে রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র রায়পুর, লক্ষ্মীপুরে ডেরেল ডেপার্ট (বিদেশি বিশেষজ্ঞ) ও জনাব এস.এন. চৌধুরী (তৎকালীন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরবর্তীতে পিএসও) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হ্যাচারি পরিচালনায় সফল হন।

১৯৮২ সালে ঝিনাইদহ জেলার বওলহর বাঁওড়ে মিঃ ফ্রানসিস রাজ ও জনাব সুখেশ চন্দ্র ধর রুই জাতীয় মাছের রেণু পোনা উৎপাদনে সফল হন। এই ৩টি হ্যাচারির সফলতা সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি উদ্যোক্তাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে সারা দেশে সরকার মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বা হ্যাচারি স্থাপন করেন এবং সফলতা অর্জন করেন। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ও উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। ফলে বর্তমানে প্রায় সরকারি ও বেসরকারি ৯০২টি হ্যাচারি স্থাপিত হয়েছে।

প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব :

১. প্রজনন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। প্রতিটি জীবের মতো মাছও বংশ রক্ষা করার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে প্রজনন করে থাকে।

২. মাছ চাষ করতে হলে পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পোনা মজুদ করতে হয়। আমাদের দেশের রুই, কাতলা জাতীয় মাছ কেবলমাত্র স্রোতস্বিনী নদীতে প্রজনন করে থাকে। এসব মাছ চাষ করতে হলে নদী থেকে পোনা সংগ্রহ করতে হয় বিভিন্ন কারণে কার্প জাতীয় এসব মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হচ্ছে, ফলে প্রাকৃতিকভাবে পোনার উৎপাদন অনেক কমে গেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পোনা পেতে হলে রুই, কাতলা জাতীয় মাছকে তাই প্রণোদিত প্রজনন করতে হয়।

৩. নদী থেকে সংগৃহীত পোনা অনিবার্য কারণেই মিশ্র প্রজাতির হয়ে থাকে। অনেক সময় কোনো কোনো অবাঞ্ছিত বিশেষ করে রাক্ষুসে মাছের পোনাও এই সাথে ধরা পড়ে যেগুলো মাছ চাষে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সেজন্য কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির পোনা পেতে হলে অবশ্যই প্রণোদিত প্রজননের প্রয়োজন রয়েছে।

৪. রুই-কাতলা মাছ যত বড়ই হোক না কেন, তারা বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। প্রজননক্ষম মাছ পুকুরে মজুদ রেখে প্রজনন মৌসুমে যে কোনো সময়ে প্রয়োজন-মাফিক পোনা পাওয়ার জন্য প্রণোদিত প্রজনন প্রয়োজন।

৫. নদী থেকে সংগৃহীত পোনা সর্বদাই মিশ্র আকারের হয়ে থাকে। মাছ চাষে অধিক সুফল পেতে হলে কোনো নির্দিষ্ট পুকুরে একই আকারের পোনা ছাড়া উচিত। একই বয়সের ও একই আকারের পোনা পাওয়ার জন্য প্রণোদিত প্রজনন দরকার।

৬. শিং, মাগুর, কই, পাবদা ইত্যাদি অত্যন্ত সুস্বাদু মাছ চাষ এখন লাভজনক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এসব মাছের পোনা প্রকৃতিতে খুব কমই পাওয়া যায়। কাজেই এ জাতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাছ চাষে প্রসার ঘটাতে হলে অবশ্যই প্রণোদিত প্রজনন প্রয়োজন।

৭. মনুষ্য সৃষ্ট ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বৈরী পরিবেশের জন্য অনেক মাছ বিলুপ্ত হওয়ার পথে যেমনঃ মহাশোল মাছ। মাছের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রণোদিত প্রজনন প্রয়োজন।

প্রজনন প্রভাবক:

মাছের প্রণোদিত প্রজনন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাকে প্রজনন প্রভাবক বলে।

প্রজনন প্রভাবক বা নিয়ামকসমূহ :

মাছের প্রণোদিত প্রজননের সফলতার জন্য বিভিন্ন প্রভাবক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রভাবক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। মৎস্য প্রজননের প্রধান প্রধান প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ :

১। ডিমের পরিপক্বতা

২। তাপমাত্রা

৩। পানির প্রবাহ

৪। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ

৫। পানিতে দ্রবীভূত লৌহ/আয়রন

৬। পানির অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ।

১। ডিমের পরিপক্বতা :

প্রণোদিত প্রজননে ডিমের পরিপক্বতা একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ব্রুড মাছ যথেষ্ট যত্ন সহকারে পালন না করা হলে ডিম যথাযথভাবে পরিপক্ব হয় না। কম বয়সী মাছ, পুষ্টিহীনতা এবং অল্প জায়গায় বেশি মাছ পালন করলে ডিম অপরিপক্ব হয়। ডিম সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব না হলে ডিমের পরিস্ফুটনের হার হ্রাস পায়। হরমোন ইনজেকশন দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের সময় হরমোনের মাত্রা অধিক হলে অনেক অপরিপক্ব ডিম বিমুক্ত হয়, সেগুলো ফোটে না।

২। তাপমাত্রা:

প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা একটি অতি সংবেদনশীল ফ্যাক্টর। তাপমাত্রার সাথে মাছের প্রজনন আচরণ ও ডিম ফুটনের সম্পর্ক রয়েছে। রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প ও বিগহেড মাছের জন্য ২২°-২৭° সে.। পানির তাপমাত্রা ১৬° সে. নীচে এবং ৩১° উপরে হলে মাছের দেহে হরমোন ক্ষরণ ঠিকমতো হয় না ফলে সঠিক সময়ে ডিম হতে রেণু বের হয় না এবং ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। পানির প্রবাহ :

হ্যাচারিতে প্রজননের সময় ডিম ফুটানোর ক্ষেত্রে পানির প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বৃত্তাকার হ্যাচারিতে সঠিকভাবে ডিম ফুটানোর জন্য অবিরাম পানির প্রবাহ বজায় রাখতে হয়, নতুবা ডিম তলদেশে জমা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ব্রুড মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর এদের শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায় ফলে অক্সিজেনের চাহিদা ও বেড়ে যায়। এ সময় প্রজনন চৌবাচ্চায় পানির প্রবাহ প্রতি মিনিটে ৩০ থেকে ৫০ লিটার রাখা ভালো।

৪। পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন :

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনও ডিম ফুটানোর একটি অন্যতম প্রভাবক। হ্যাচারিতে মৎস্য প্রজননের উদ্দেশ্যে যে পানি রাখা হয়, সে পানিতে পর্যাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। যেহেতু একটি পাত্র বা হাঁপাতে একসাথে অনেক ডিম রাখা হয় তাই ঐ পানিতে অধিক অক্সিজেনের দরকার হয়। তাছাড়া অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে অনেক ডিম মারা যায় এবং মৃত ডিমগুলো পঁচনের ফলে ঐ পানিতে অক্সিজেন আরো কমে যায়। প্রবাহিত পানিতে ৭-৮.৫ পিপিএম দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে সর্বনিম্ন মাত্রা ৫ পিপিএম-এর নিচে হওয়া উচিত নয়।

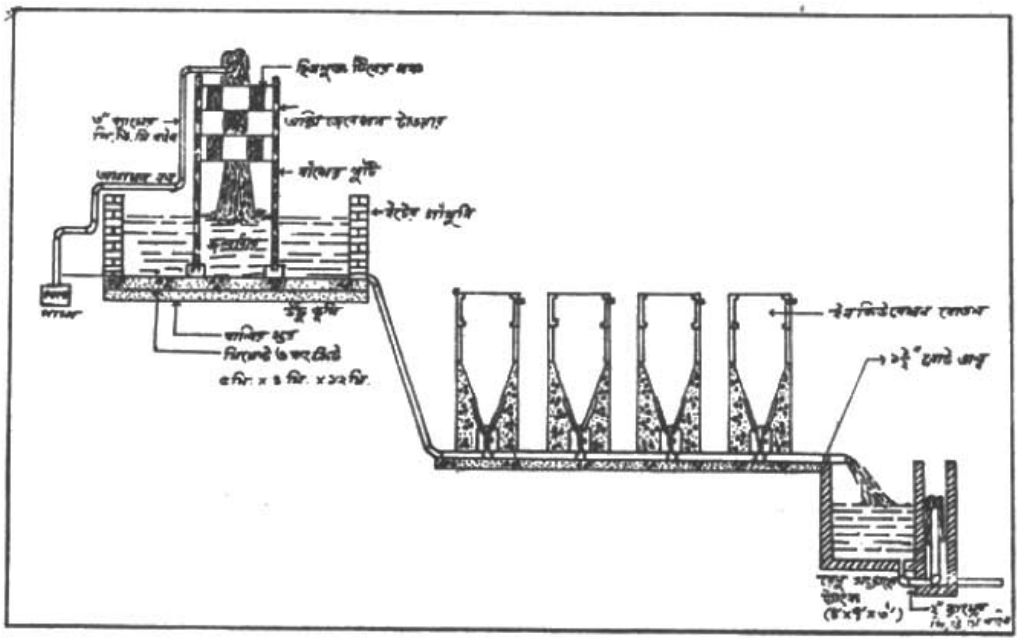

চিত্র : হ্যাচারিতে পানি এরেশনের পদ্ধতি

৫। পানির দ্রবীভূত আয়রন বা লৌহ :

প্রজননের জন্য হ্যাচারির পানি লৌহমুক্ত হওয়া আবশ্যক কারণ পানির মধ্যে বিদ্যমান লৌহ জারিত হয়ে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি করে। এছাড়া নিষিক্ত ডিমের উপরিভাগে লৌহের আস্তরণ সৃষ্টি হয় ফলে ডিমের মৃত্যুহার বেড়ে যায়। লৌহসমৃদ্ধ পানিপ্রবাহের ফলে ডিম থেকে ফুটে বের হওয়া বাচ্চার ফুলকায় লৌহের আস্তরণ পড়ে, ফলে তাদের শ্বাসকার্য ব্যাহত হয় এবং মৃত্যু হার বেড়ে যায়। হ্যাচারির পানির জন্য লৌহের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হচ্ছে ২ মি.লি. গ্রাম/লিটার। ২ থেকে ৪ মি.লি.গ্রাম/লিটার মাত্রায় লৌহ বা আয়রন থাকলে ঐ পানি প্রজনন কাজে ব্যবহারের আগে এরেশন করে নিতে হবে। পাম্প থেকে পানি ট্যাঙ্কে ঢোকানোর আগেই এরেশন করে নিতে হয়। এরেশনের প্রক্রিয়া হলো চার-পাঁচ ধাপ লোহার জালির তৈরি ট্রের উপর দিয়ে সবেগে পাম্পের পানিকে প্রবাহিত করা।

৬। পানির অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ :

হ্যাচারিতে মৎস্য প্রজননের উদ্দেশ্য ডিম ফুটানোর জন্য যে পাত্রে ডিম রাখা হয় ঐ পাত্রের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

ছকের সাহায্যে ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ ও গ্রহণযোগ্য মাত্রা দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	গুণাগুণ	প্রজননের জন্য গ্রহণযোগ্য মাত্রা
০১	অক্সিজেন	৭-৯.৫ পি পি এম
০২	কার্বন ডাই-অক্সাইড	১০ মিলিগ্রাম/লিটার
০৩	পিএইচ	৭-৮.৫
০৪	লৌহ	১.০ মিলিগ্রাম/লিটার
০৫	অ্যালুমিনিয়াম	০.১ মিলিগ্রাম/লিটার
০৬	ক্ষারতা (ক্যালসিয়াম কার্বনেট)	২০ মিলিগ্রাম/লিটার
০৭	তাপমাত্রা	২৮-৩০° সেন্টিগ্রেড

প্রাকৃতিক প্রজননে পরিবেশ এবং হরমোনের প্রভাব :

স্বাভাবিক পরিবেশে পরিপক্ব মাছের ডিম ও শুক্র মাছের জননাঙ্গ ততক্ষণ পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক পরিবেশ দ্বারা প্রণোদিত না হয়। উপযুক্ত পরিবেশ মাছের মস্তিষ্কের হাইপোথেলামাসকে প্রভাবান্বিত করে এবং গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন নিঃসরণ করে যা পিটুইটারি গ্রন্থির গোনাডাল কোষকে সক্রিয় করে রক্তপ্রবাহেও গোনাডোট্রপিন হরমোন নিঃসরণ করে এবং শুক্রাশয় ডিম্বাশয়ের যাবতীয় গাঠনিক ও কার্যক্রমকে পরিবর্তন করে থাকে। ফলে ডিম্বাশয় থেকে ডিমের বিচ্যুতি ঘটে এবং টেস্টিকুলার কোষ থেকে শুক্র বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটায় কিন্তু যখন নদী বা উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়ে থাকে যখন ডিম্ব বা শুক্রের পরিবর্তন বন্ধ হয়ে থাকে এবং এরা বিশ্রাম অবস্থায় থাকে ও ধীরে ধীরে শরীরে শোষিত হয়ে যায়। এরকম প্রতিকূল পরিবেশে মাছ পিটুইটারি গ্রন্থি হতে নিজস্ব গোনাডো-ট্রপিন হরমোন নিঃসরণ করতে পারে না, তখন বাহির থেকে অন্য কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে গোনাডোট্রপিন হরমোনের নির্যাস তৈরি করে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রজনন উপযোগী পরিপক্ব মাছকে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়, ফলে মাছের শরীরে জৈবিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় মাছ ডিম ও শুক্র ছেড়ে দিয়ে প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

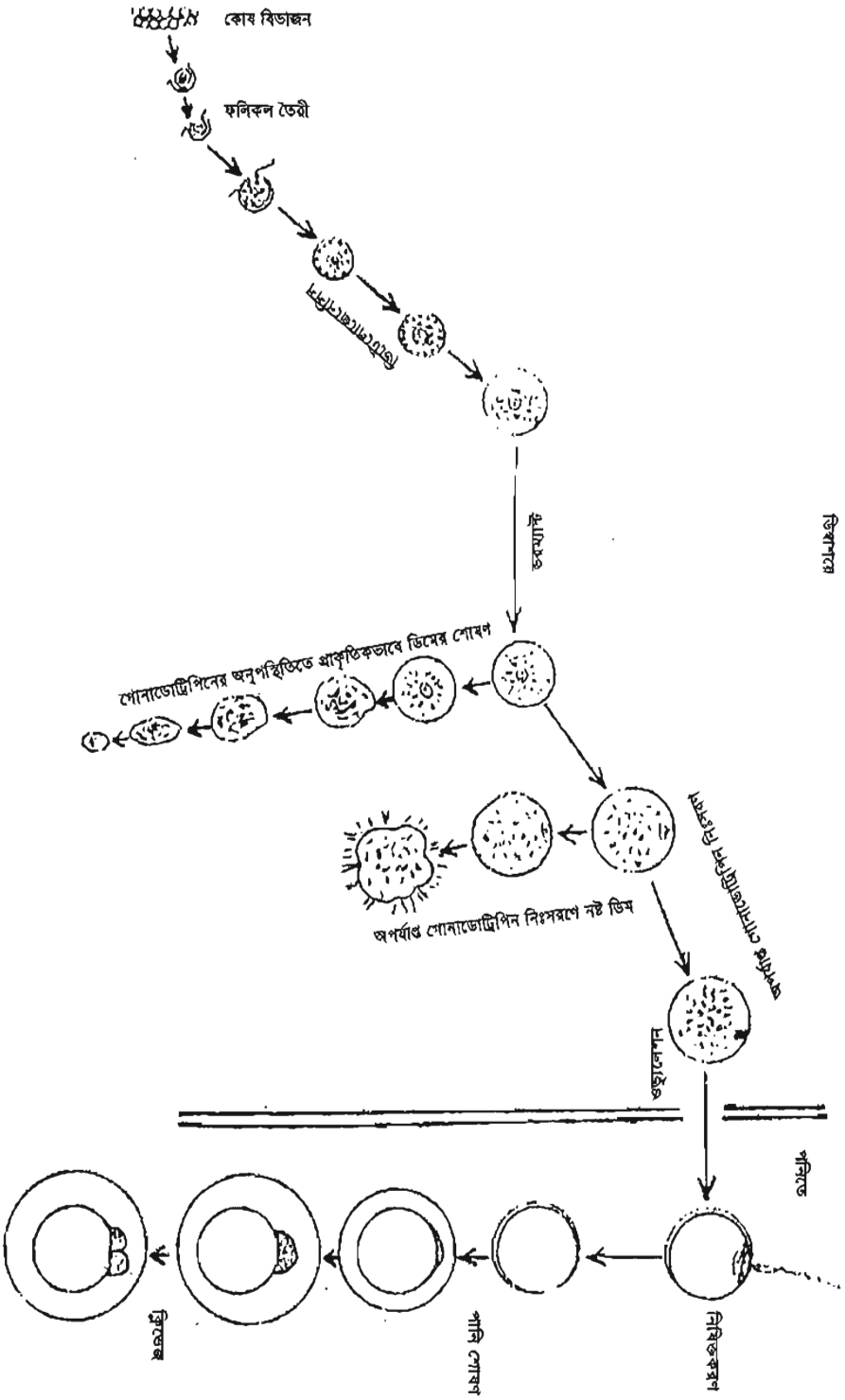

চিত্র নং- প্রজনন যোগ্য মাছের ডিমের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ধাপ

প্রণোদক :

যে উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিপক্ব ব্রুড মাছে ডিম এবং শুক্র প্রাপ্তি ঘটানো হয় তাকে প্রণোদক বলে। আমাদের দেশে সাধারণত প্রণোদক হিসেবে মাছের পিটুইটারি গ্রন্থির (পিজি) নির্যাস এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হিউম্যান করিওনিক গোনাডোট্রপিন হরমোন (এইচসিজি) অথবা বিভিন্ন কৃত্রিম হরমোন (যেমন সুমাচ, অভাপ্রিম ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়।

১। পিটুইটারি গ্লান্ড বা পিজি :

পিজি সাধারণত মাছের মাথার খুলির নিচে একটা গর্তে থাকে। এই গ্রন্থি দেখতে অনেকটা গোলাকার এবং এটা সাধারণত হালকা গোলাপি রঙের হয়ে থাকে। পরিপক্ব মাছ থেকে পিজি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। এতে পিজির কার্যকারিতা বেশি থাকে। সংগৃহীত পিজি কাচের ছোট বোতলের মধ্যে এসিটোন বা অ্যালকোহলে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে এই সংরক্ষিত পিজি মাছের প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেশি রুই জাতীয় মাছের প্রজনন কাজে পিজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলোর মধ্যে গ্রোথ হরমোন এবং গোনাডোট্রপিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য হ্যাচারিতে মৎস্য প্রজননের জন্য পিজি উত্তেজক প্রভাবক বা ইনডিউসিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রোথ হরমোন দেহের সার্বিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এবং গোনাডোট্রপিন হরমোন গোনাড বা যৌন অঙ্গের বৃদ্ধি ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২। এইচসিজি :

হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (Human Chorionic Gonadotropin) হরমোনকে সংক্ষেপে এইচসিজি (HCG) বলা হয়। এইচসিজি একপ্রকার গ্লাইকোপ্রোটিন যা ৪০ থেকে ১২০ দিনের গর্ভবতী নারীদের প্রস্রাব সেন্ট্রিফিউজ করে এইচ সিজি প্রস্তুত করা হয়। চাইনিজ কার্পের প্রজননে সাধারণত এইচসিজি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। দেশি রুই জাতীয় মাছের প্রজনন কাজেও এই হরমোন অনেক সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রণোদকের প্রয়োজনীয়তা :

প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো বদ্ধ জলাশয়ে বা হ্যাচারির পরিবেশ ও ব্রুড মাছের ডিম ও শুক্র তৈরি, এদের বৃদ্ধি ঘটে এবং পরিপক্বতা আসে। কিন্তু বিশ্রামের পর পরিবেশ পরিবর্তনজনিত এবং সংশ্লিষ্ট হরমোনের সমন্বিত প্রভাব প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় অপ্রতুল বিধায়, ব্রুড মাছের ডিম ছাড়ার মতো চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তরণ ঘটে না। মাছকে ডিম ছাড়ার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সময়মতো প্রয়োজন হয় যথার্থ প্রণোদকের।

প্রণোদক নির্বাচন :

আমাদের দেশে যে সমস্ত মাছকে প্রণোদিত প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে, তন্মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিজি এর নির্যাস ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া গেছে। অনেক মাছের প্রজননের ক্ষেত্রে এইচসিজি-এর সাথে পিজি-এর নির্যাস সংমিশ্রণে অধিক কার্যকর বলে প্রমাণিত। পিজি নির্যাস ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সর্বনিম্ন। এসব কারণে মাছের প্রজননের জন্য প্রজাতি ভেদে প্রণোদক নির্বাচনে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া

১. ওভাপ্রিম
২. ওভাক্লিন
৩. ওভাম্যাক

৪. ডমপিরিডন

৫. প্রেগনিল

৬. প্রেফেসি ইত্যাদি প্রণোদক ও ব্যবহার করা হয়।

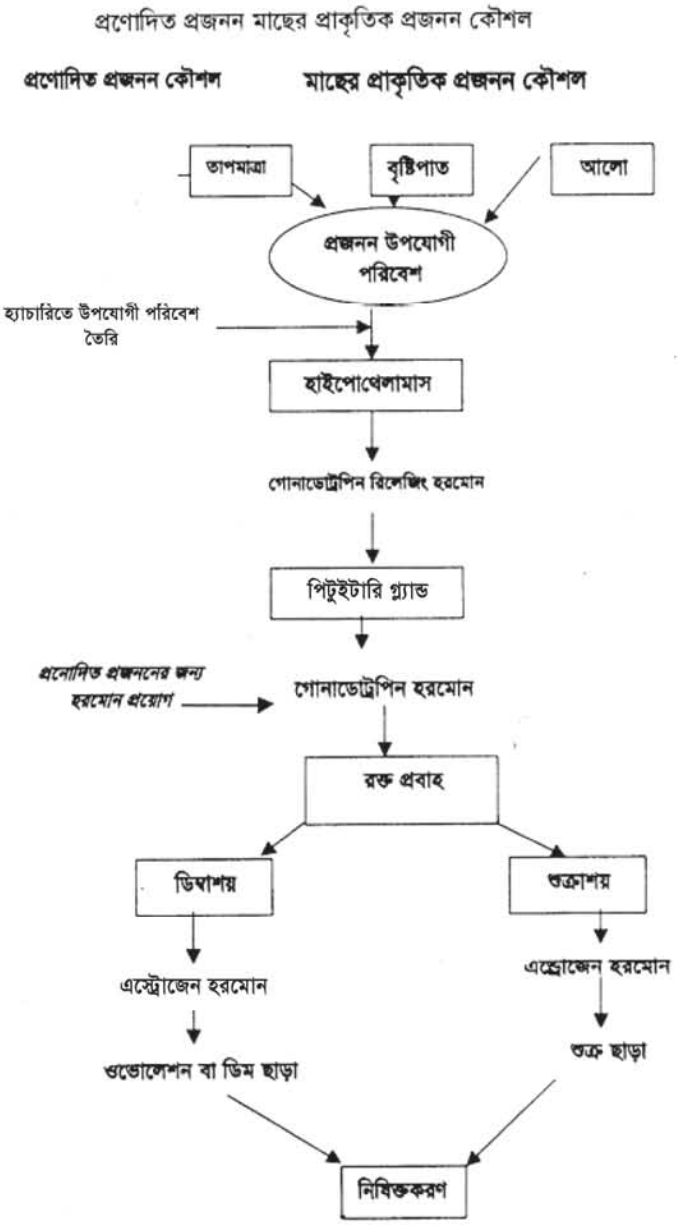

চিত্র : মাছের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রজনন কৌশল

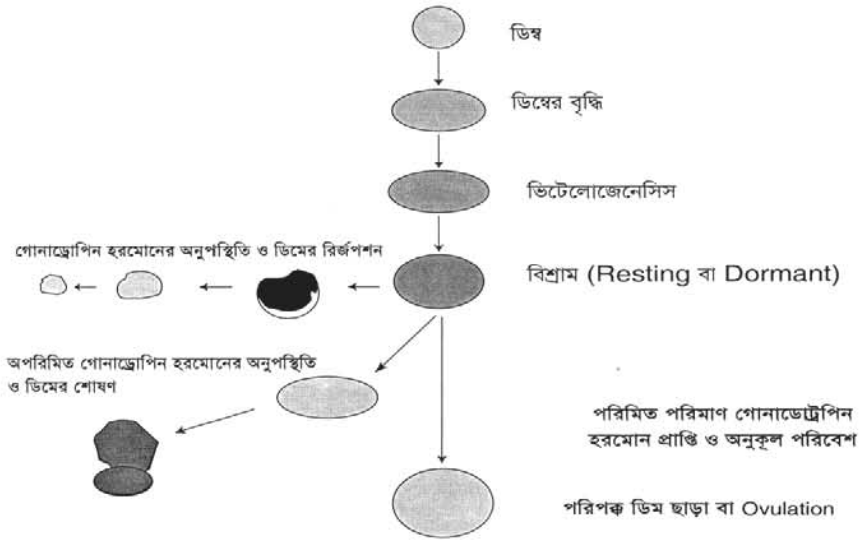

চিত্র : ডিমের বৃদ্ধি এবং ডিম ছাড়া (Development of Egg and Ovulation)

প্রণোদকের মাত্রা :

প্রণোদিত প্রজননে প্রজাতি ভেদে প্রণোদকের মাত্রায় ভিন্নতা রয়েছে। আবার একই প্রজাতির মাছের বয়স, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, গোনাডের পরিপক্বতা, সর্বোপরি প্রজনন ঋতুর পর্যায় এবং পরিবেশগত নিয়ামকের অবস্থার উপর প্রণোদকের মাত্রা নির্ভরশীল। সঠিক মাত্রায় প্রণোদক ব্যবহার খুবই জরুরি এবং তাতেই আশানুরূপ গুণাগুণ সম্পন্ন ডিম পাওয়া সম্ভব, যা কীনা পরবর্তীতে উচ্চহারে নিষিক্তকরণ, ডিম স্ফুটন, পোনা বেঁচে থাকার হার এবং শক্ত সামর্থ্য নীরোগ স্বাস্থ্যবান পোনা পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে। এটা সত্য যে, মাত্রাতিরিক্ত প্রণোদক ব্যবহারে অন্যান্য প্রাণীর মতো মাছেরও গর্ভপাত হতে পারে। একই মাছে একটি নির্দিষ্ট প্রণোদক পরপর একই মাত্রা ব্যবহার করলে পরবর্তীতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। সেজন্য পরবর্তীতে প্রজননের জন্য প্রণোদকের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে শরীর বৃত্তিক সকল কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট মাছের প্রজনন প্রতিক্রিয়া ঐ নির্দিষ্ট প্রণোদকের প্রতি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে পোনার সকল গুণাগুণে দেখা দেয় অবনতি। বর্তমানে অধিকাংশ হ্যাচারিতে মাত্রাতিরিক্ত প্রণোদক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হ্যাচারি অপারেটরদের ভুল ধারণা জন্মেছে যে, পরিবেশের বৈরিতা, গোনাডের অপরিপক্বতা ইত্যকার সকল অপূর্ণতা শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রণোদিত প্রজননের সময় মাত্রাতিরিক্ত প্রণোদক ব্যবহারের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। পরিশেষে বলা যেতে পারে ব্রুড মাছের প্রজননের জন্য যথাযথ উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা কাঙ্ক্ষিত নীরোগ স্বাস্থ্যবান পোনা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। দেশের সার্বিক মৎস্য চাষ নির্ভর করে সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন পোনার উপর তাই ব্রুড স্টকের উন্নয়নের অন্যান্য সকল নিয়ামক বা ব্যবস্থার পাশাপাশি মাছের শারীরবৃত্তিক জৈবিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া কৃত্রিম প্রজননের জন্য সঠিক প্রণোদক বা হরমোন প্রয়োগ করতে হবে এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রণোদক ব্যবহারের প্রবণতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তবেই হ্যাচারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন পোনা উৎপাদন করে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্নমালা-২

এক কথায় উত্তর দাও :

১। মাছের সফল প্রজননের জন্য কী কী আবশ্যক?

২। শত্রু থেকে ডিম ও বাচ্চাকে রক্ষায় মাছের অভ্যাসকে কী বলে?

৩। কমন কার্প মাছ আমাদের দেশে কোন বয়সে প্রজনন করে?

৪। বছরে একাধিক বার প্রজনন করে এমন একটি মাছের নাম লেখ।

৫। কাতলা মাছ কোন বয়সে প্রজনন করে?

৬। মাছের প্রজনন অঙ্গ পরিপক্ব হবার পরেও সুপ্তাবস্থায় থাকে কেন?

৭। প্যারেন্টাল কেয়ার কয় ধরনের হতে পারে?

৮। ফেকান্ডিটি কাকে বলে?

৯। কোন ধরনের মাছের ফেকান্ডিটি সবচেয়ে বেশী?

১০। মাছের দেহে ডিম শোষিত হয় কেন?

১১। মাছের শুক্রাণু কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে/বেঁচে থাকতে পারে?

১২। প্রণোদিত প্রজনন কাকে বলে?

১৩। প্রণোদিত প্রজননের উদ্দেশ্য কী?

১৪। প্রণোদিত প্রজননের গুরুত্ব লেখ?

১৫। প্রজনন প্রভাবক কাকে বলে?

১৬। প্রজনন প্রভাবকগুলো কী কী?

১৭। হ্যাচারিতে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ কী কী?

১৮। প্রণোদক কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রজনন জীববিদ্যা বলতে কী বোঝ?

২। মাছের প্রজননের বয়স একই মাছে বিভিন্ন হয় কেন?

৩। মিঠাপানির মাছের প্রজনন বয়স ও প্রজননের ঋতু সম্পর্কে আলোচনা কর?

৪। ফেকান্ডটির সাথে প্যারেন্টাল কেয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর?

৫। প্রণোদকের প্রয়োজনীয়তা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রণোদিত প্রজননের প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলোর নাম উল্লেখ কর এবং এগুলোর প্রভাব বর্ণনা কর?

২। ডিম ও শুক্রাণুর বিকাশ কীভাবে হয় বর্ণনা কর অথবা নিষিক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

অনেক মাছ বিশেষ করে রুই জাতীয় মাছ ও বিদেশি (Exotic Carp) কার্প মাছগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় পুকুরে প্রজনন করে না। ফলে তাদের রেণু পুকুরে পাওয়া সম্ভব নয়। এসব মাছের প্রজনন সাধারণত প্রাকৃতিক উৎসে ঘটে থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় নদীতে যে প্রজনন হয় তাতে অনেক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন : বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনার মিশ্রণ, রাক্ষুসে মাছের পোনার মিশ্রণ, রোগ জীবাণুর উপস্থিতি, যথাসময়ে একই জাতের, একই আকারের এবং একই বয়সের পোনা না পাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট নানা কারণে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বিনষ্ট হওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে পোনার উৎপাদন কমে গেছে। পরিবেশের এসব প্রতিকূলতা রক্ষার জন্য মৎস্য হ্যাচারি স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

হ্যাচারিঃ

যে প্রক্রিয়ায় পরিপক্ব পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রণোদিত করে ডিম ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং সে ডিম ফুটিয়ে রেণু উৎপাদন করা হয়, তাকে প্রণোদিত প্রজনন বলা হয়। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অবকাঠামো ব্যবহার করা হয় তাকে হ্যাচারি হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ হ্যাচারি হলো একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বা যেখানে মাছের প্রণোদিত প্রজননের সকল অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে মাছকে প্রজননে বাধ্য করা হয়।

হ্যাচারির প্রকারভেদঃ

পোনা উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে হ্যাচারি সাধারণতঃ তিন ধরনের। যথা–

i) ছোট বা মিনি হ্যাচারি

ii) মাঝারি হ্যাচারি

iii) বড় হ্যাচারি

i) **ছোট হ্যাচারি :** এ ধরনের হ্যাচারি সাধারণত পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে একজন টেকনিশিয়ান এবং দুইজন শ্রমিক হলেই যথেষ্ট।

ii) **মাঝারি হ্যাচারি :** এ ধরনের হ্যাচারি সাধারণত কোম্পানি, সমবায় এবং হ্যাচারিতে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে তিনজন টেকনিশিয়ান এবং তিন-চার জন শ্রমিক হলেই যথেষ্ট।

iii) **বড় হ্যাচারি :** এ ধরনের হ্যাচারি সাধারণত লিঃ কোম্পানি, সমবায় এবং হ্যাচারি নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ধরনের হ্যাচারি পরিচালনার জন্য তিন-ছয় জন টেকনিশিয়ান এবং ছয়-দশ জন শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

হ্যাচারির প্রয়োজনীয়তা :

পরিবেশগত বিপর্যায়ের কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেণু পোনা উৎপাদন ও প্রাপ্তি কমে যাওয়ায় ক্রমবর্ধমান রেণু পোনার চাহিদা পূরণের জন্য হ্যাচারি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উল্লেখ্য, অধিক পরিমাণ উন্নত জাতের একই প্রজাতির একই বয়সের রেণু পোনা পাওয়ার জন্য হ্যাচারির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিরল প্রজাতির বা প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে মাছের বিলুপ্তি রোধ করা যায়।

হ্যাচারির জন্য স্থান নির্বাচন :

হ্যাচারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যাচারির সফলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে স্থান নির্বাচনের উপর। হ্যাচারির স্থান নির্বাচনের জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

ক. বাজারজাতকরণ সুবিধা :

উৎপাদিত রেণু ও মাছ সঠিক সময়ে বাজারজাত করতে না পারলে হ্যাচারি অলাভজনক হয়ে পড়ে। তাই হ্যাচারির স্থান নির্বাচনের সময় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যেন ঐ স্থানে বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে একটি জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাষযোগ্য পুকুর, দীঘি ও জলাশয়ের পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ মাছ চাষে আগ্রহী কিনা জেনে নেওয়া।

খ. মাটির প্রকৃতি :

স্থান নির্বাচনের সময় মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করা অতীব জরুরি। উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন মাটি না হলে পোনা উৎপাদন ও ব্রুড মাছ পালনের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ মাটির উপর নির্ভরশীল। উর্বর মাটির পুকুরে মাছের উৎপাদন অধিক হয়। বালিযুক্ত মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা থাকে না, ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখা যায় না। লাল মাটিতে পুকুর তৈরি করলে পানি ঘোলা থাকে। মাছ চাষের জন্য দো-আঁশ মাটি উত্তম। মাটির পি. এইচ ৬.৫ থেকে ৭.৫ থাকা উচিত।

গ. সাংবাৎসরিক পানির উৎস :

হ্যাচারি পরিচালনায় পানি সরবরাহ অতীব জরুরি বিষয়। হ্যাচারির পানি অবশ্যই আয়রনমুক্ত হতে হবে। হ্যাচারির জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব এলাকায় পুকুরসহ সকল গভীর ও অগভীর নলকূপে সারা বছর পানি থাকে, সেসব স্থানই হ্যাচারির জন্য উত্তম। হ্যাচারিতে ব্যবহার্য পানিতে নিম্নের গুণাবলি থাকা বাঞ্ছনীয়।

অক্সিজেন	৪.০ মি.গ্রাম/লিটার এর উর্ধ্বে
তাপমাত্রা	২৪°-৩০° সেলসিয়াস
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
অ্যামোনিয়া	০.৫ মি.গ্রাম/লিটার
কার্বন ডাই-অক্সাইড	১০ মি.গ্রাম/লিটার
এলকালিনিটি	৭৫ মি.গ্রাম/লিটার এর বেশি
হার্ডনেস	৬০ মি.গ্রাম/লিটার এর বেশি
ক্লোরাইড	৬ মি.গ্রাম/লিটার এর বেশি
লৌহ	২ মি.গ্রাম/লিটার

ঘ) হ্যাচারি নির্মাণ ও পুকুর তৈরির খরচ :

হ্যাচারির স্থান নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যেন ঐ স্থানে জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং পুকুর খনন ব্যয়ও কম থাকে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক নিম্নভূমি নির্বাচন করা যেতে পারে। হ্যাচারির স্থান নির্বাচন করার সময় অবশ্যই দেখতে হবে যেন হ্যাচারি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সহজেই কাছাকাছি পাওয়া যায় এবং নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সহজলভ্যতা থাকে।

ঙ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :

মৎস্য প্রজনন হ্যাচারির জন্য বিদ্যুতের সরবরাহ থাকা আবশ্যক। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য পাম্প চালানো, রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমনঃ সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, বৈদ্যুতিক করাত, ইলেকট্রিক ব্যালেন্স চালানোর জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকলে মাছ চুরি রোধ করা যায়।

চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা :

হ্যাচারি উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় ও স্থানান্তর এবং হ্যাচারিতে মাছ ও মাছের খাবার সরবরাহ করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ খারাপ বা দুর্গম রাস্তার কারণে অনেক ক্রেতা হ্যাচারিতে পোনা কিনতে আসতে চাইবে না। তাই হ্যাচারির স্থান নির্বাচনের সময় যোগাযোগের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা দরকার।

ছ) বন্যা ও দূষণমুক্ত এলাকা :

হ্যাচারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে লাভবান হতে হলে হ্যাচারির ব্রুড মাছ, রেণু ও পোনার জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং বন্যামুক্ত এলাকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জ) সার ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা :

হ্যাচারির প্রাণ হলো ব্রুড মাছ। আর সেই ব্রুড ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা বজায় রাখতে হলে নিয়মিতভাবে হ্যাচারির পুকুরগুলোতে সার প্রয়োগ করার দরকার হয়। অপরপক্ষে

প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি নিয়মিত সম্পূরক খাদ্যও প্রদান করতে হয়। তাই সার, মাছের খাবার প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং হ্যাচারি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজেই পাওয়া যায় এমন জায়গায় হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত।

হ্যাচারির বিভিন্ন অংশ :

প্রজননযোগ্য মাছকে লালন-পালন করে উপযুক্ত পরিপক্ব করে তোলা, পরিপক্ব মাছকে ইনজেকশন দেওয়া, ডিম সংগ্রহ, ফোটানো এবং রেণু লালন-পালন করা হ্যাচারির প্রধান কাজ। এজন্য একটি হ্যাচারিতে দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা :

১। পুকুর অংশ
২। হ্যাচারি অংশ

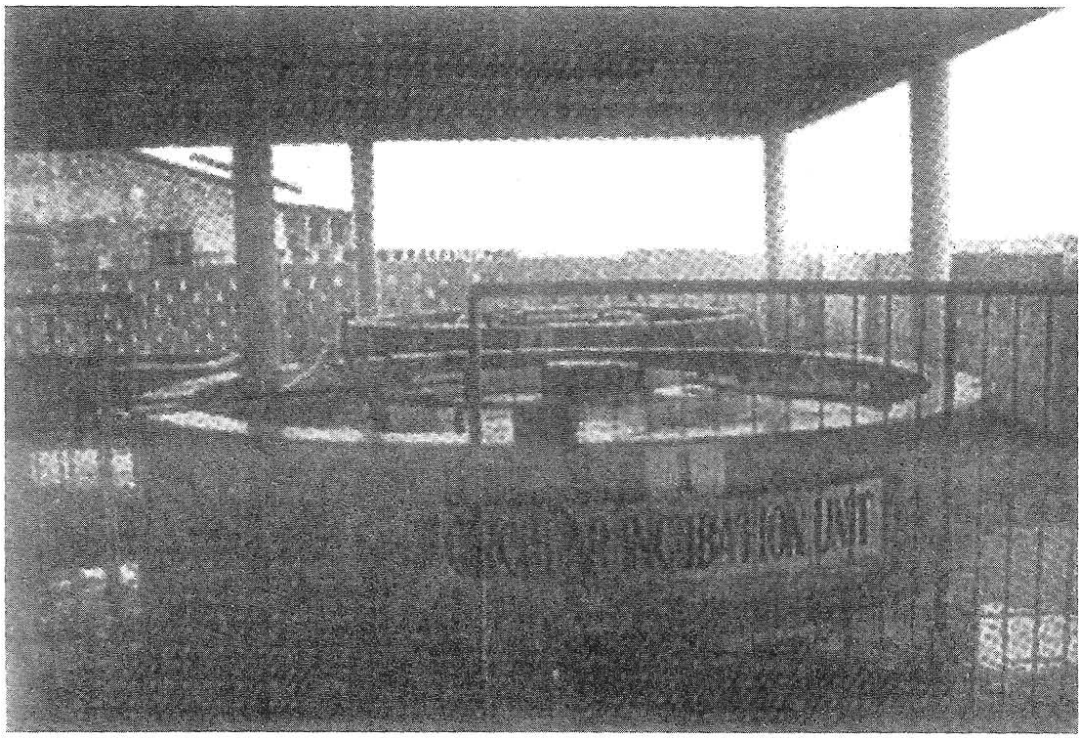

চিত্র : মৎস্য হ্যাচারির অংশবিশেষ

১। পুকুর অংশ :

সফলতার সাথে হ্যাচারি পরিচালনার জন্য এক জায়গায় একত্রে কয়েকটি ছোট-বড় পুকুর থাকা প্রয়োজন। এসব পুকুরে প্রজননযোগ্য মাছকে লালন-পালন ও পোনা প্রতিপালন করা হয়। হ্যাচারির সুবিধার জন্য যে ধরনের পুকুর থাকা দরকার সেগুলো হচ্ছে:

ক) ব্রুড মাছ পালন পুকুর (Brood Pond)
খ) প্রজননোত্তর মাছের পালন পুকুর (Spent Fish Pond)
গ) লালন পুকুর (Rearing Pond)
ঘ) আঁতুড় পুকুর (Nursury Pond)

ক. ব্রুড মাছ পালন পুকুর (Brood Pond) :

একটি বড় আকারের মৎস্য হ্যাচারিতে বিভিন্ন প্রজাতির ব্রুড মাছ লালন-পালনের জন্য বিভিন্ন আকারের পুকুর থাকা একান্ত প্রয়োজন। সারাবছর কমপক্ষে ২ মিটার পানি থাকে এমন পুকুরে প্রজননক্ষম মাছ প্রতিপালন করা উচিত। প্রজননক্ষম মাছের পুকুরের আয়তন ৩৩ শতাংশ থেকে ১ একরের মধ্যে হলে ভালো হয়।

খ. প্রজননোত্তর মাছের পালন পুকুর (Spent Fish Pond) :

প্রজনন শুরু করার পর প্রজনন সম্পন্ন করেছে এমন মাছকে পৃথকভাবে পালন করার জন্য আলাদা পুকুর রাখা হয়। হ্যাচারিতে এরকম একটি পুকুর থাকলেই চলে। এ ধরনের পুকুর ও ব্রুড পালন পুকুরের আকার ও গভীরতা একই হওয়া দরকার। কারণ সদ্য প্রজননকৃত মাছগুলো খুবই দুর্বল ও নাজুক থাকার কারণে তাদের নিবিড় তদারকি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

গ. লালন পুকুর (Rearing Pond) :

এলাকায় উন্নত জাতের মাছের পোনা সরবরাহের উৎস হিসেবে প্রতিটি হ্যাচারি কাজ করে। সে কারণে হ্যাচারিতে কয়েকটি লালন পুকুর রাখা হয়। লালন পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে আঙ্গুলী পোনা তৈরি করা হয় এবং আগ্রহী পুকুর মালিকদের কাছে বিক্রি করা হয়। লালন পুকুর ১.০ মিটার থেকে ১.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার।

ঘ. আঁতুড় পুকুর (Nursury Pond) :

আঁতুড় পুকুর হচ্ছে ছোট আকারের অগভীর পুকুর যেখানে রেণু পোনা লালন করা হয়। অনেক সময় হ্যাচারিতে উৎপন্ন রেণু সময়মতো বিক্রি করা সম্ভব হয় না। এমন অবস্থায় উৎপাদিত রেণুপোনা হ্যাচারির আঁতুড় পুকুরে মজুদ করা হয়। সেখানে ১৫-২০ দিন পালনের পর ধানী আকারের পোনা লালন পুকুরে স্থানান্তর করা হয়, অথবা ধানী হিসেবে অন্য কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হয়।

হ্যাচারির পুকুর অংশের প্রতিটি পুকুর পরস্পর পাইপ বা ড্রেন দ্বারা যুক্ত থাকলে ভালো হয়। তাতে পুকুরে পানি সরবাহ ও নিষ্কাশনে খুবই সুবিধা হয় এবং পুকুরে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি দূর করা যায়।

২। হ্যাচারি অংশ :

প্রণোদিত প্রজনন স্থান বা হ্যাচারির অভ্যন্তরীণ অংশ ছাদ বা চালের নিচে পাকা করে তৈরি করা হয়। একটি আধুনিক হ্যাচারিতে নিম্নবর্ণিত অংশগুলো বিদ্যমান :

ক. ওভারহেড ট্যাংক

খ. ব্রুড মাছের চৌবাচ্চা

গ. রেণু পোনার চৌবাচ্চা

ঘ. প্রজনন ট্যাংক

ঙ. হ্যাচিং জার

চ. ইনকুবেশন ট্যাংক

ছ. গভীর ও অগভীর নলকূপ

জ. হ্যাচারি ঘর

ঝ. অফিস ঘর ও ল্যাবরেটরি

ঞ. গুদাম ঘর

ট. পাম্প ঘর

ঠ. যানবাহন

ক) ওভারহেড ট্যাংক :

একটি মৎস্য হ্যাচারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। হ্যাচারিতে পানি সরবরাহের পূর্বে পানিকে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে উঁচু জলাধার নির্মাণ করা হয়, তাকে ওভারহেড ট্যাংক বা উচ্চ জলাধার বলা হয়। এ জলাধরকে সার্কুলার ট্যাংক থেকে অর্থাৎ ভূমি থেকে কমপক্ষে তিন মিটার উঁচুতে স্থাপন করলে হ্যাচারিতে পানি সরবরাহ সহজতর হয়। হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করা উচিত। সাধারণত দেখা যায় ১০০ কেজি রেণু উৎপাদনক্ষম হ্যাচারির জন্য ৫৪০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উচ্চ জলাধার নির্মাণ করা হলে ৬-৮ ঘণ্টা ব্যবধানে পানি উত্তোলন করার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ রেণু উৎপাদনের একটি ধাপে ১০-১২ বার পানি উত্তোলন করলেই চলে। এতে হ্যাচারিতে পানি সরবরাহের ঝুঁকি কমে যায়। পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি এবং লৌহমুক্ত করার জন্য ট্যাংকের উপরে পানির প্রবেশপথে ছিদ্রযুক্ত স্টিল তাক বা টিনের প্লাটফর্ম নির্মাণ করা হয়ে থাকে। পানির অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধির জন্য এয়ার ব্লোয়ার চালানো যেতে পারে।

খ) ব্রুড মাছের চৌবাচ্চা :

পুকুর থেকে নির্বাচনের পর এ চৌবাচ্চায় নির্বাচিত মাছকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়া হয় এবং হ্যাচারির পানির সাথে এদের অভ্যস্ত করে নেওয়া হয়। এখানে মাছকে ৪-৭ ঘণ্টা পর্যন্ত বিশ্রাম দেওয়া হয়। যদি চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে ডিম নিষিক্ত করা হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় ইনজেকশন দিয়ে মাছকে ব্রুড মাছের চৌবাচ্চায় হাপা স্থাপন করে পরিচর্যা করা হয়। পোনা পরিবহনের জন্য প্রস্তুতকরণ, রেণু পরিচর্যাসহ অন্যান্য কাজেও ব্রুড মাছের চৌবাচ্চা ব্যবহৃত হয়।

গ) রেণু পোনার চৌবাচ্চা :

এ ধরনের চৌবাচ্চা ব্রুড মাছের চৌবাচ্চার মতোই শুধু আকারে একটু ছোট হয়। হ্যাচিং বোতল ও সার্কুলার ট্যাংক থেকে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে এসব চৌবাচ্চায় হাপার মধ্যে ঐ সব রেণুপোনা বা বাচ্চা রাখা হয়। এখানেও অনবরত পানির প্রবাহ বজায় রাখা হয়। রেণুপোনা রাখা ছাড়াও হ্যাচারিতে উৎপন্ন ধানী পোনা ও আঙ্গুলী পোনা বিক্রির জন্য পাকা করা বা কন্ডিশনিং করার জন্য এসব চৌবাচ্চা ব্যবহার করা হয়।

ঘ) প্রজনন ট্যাংক :

ইহা সিমেন্টের তৈরি গোলাকার চৌবাচ্চা যার ব্যাস ২.৫ থেকে ৩ মিটার এবং উচ্চতা ১ মিটার হতে পারে। প্রজনন ট্যাংকে ব্রুড মাছ ইনজেকশন দিয়ে রাখা এবং সেখানে পানির কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টির মাধ্যমে মাছকে কোর্টশিপ (Courtship)-এর মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি করতে সহজাতভাবে ডিম দেওয়ার পরিবেশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। কার্প জাতীয় মাছের এবং সরপুঁটির প্রজননের জন্য প্রজনন ট্যাংক বেশি উপযোগী। এ ট্যাংকে পানির প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রয়োজনে উপর হতে ঝর্ণার সাহায্যে পানি দেয়া যেতে পারে। এটা অনেক সময় পোনা কন্ডিশনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

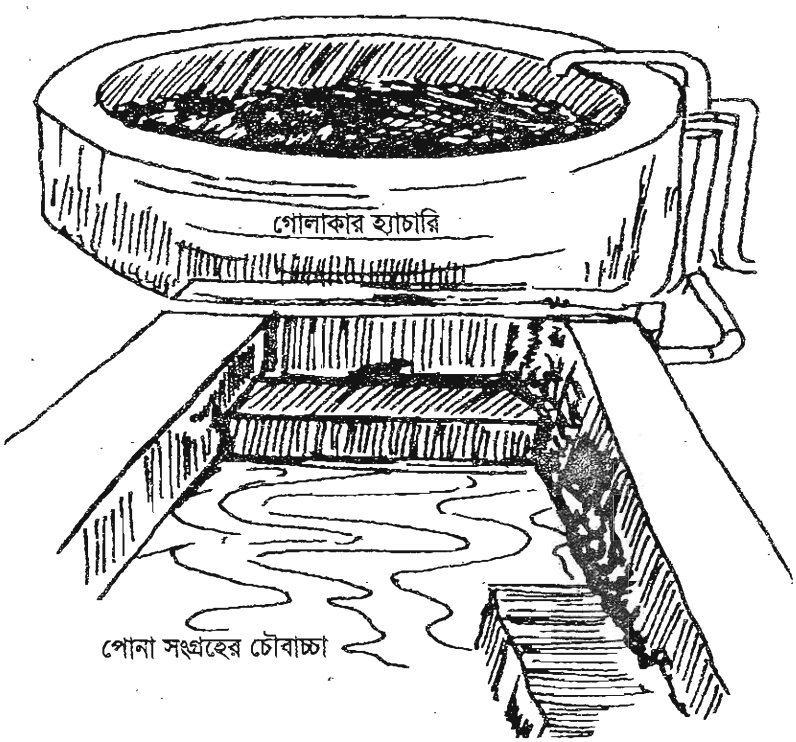

চিত্র : গোলাকার চৌবাচ্চার বাহ্যিক দৃশ্য

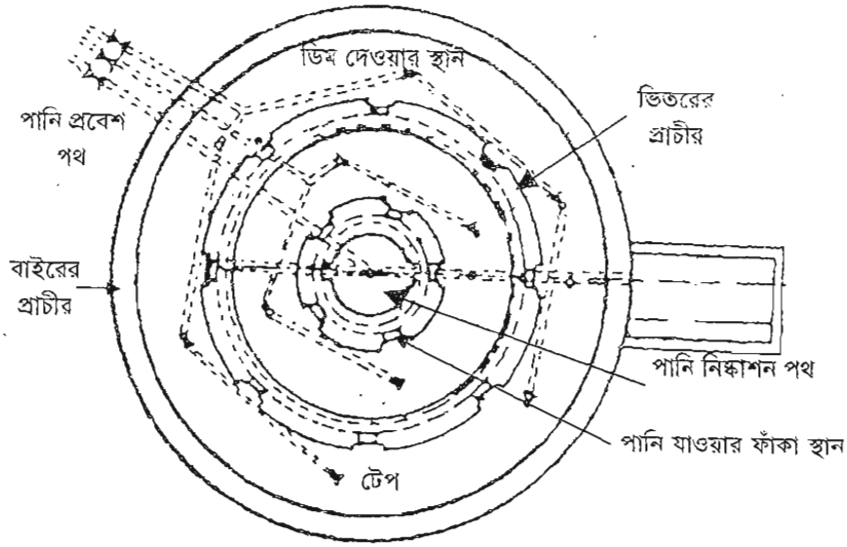

চিত্র : গোলাকার চৌবাচ্চার অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ঙ) হ্যাচিং জার :

হ্যাচিং জার একটি ফানেল আকৃতির সিমেন্ট, স্টিল বা ফাইবার গ্লাসের দ্বারা তৈরি পাত্র বিশেষ। হ্যাচারিতে যে পাত্রে নিষিক্ত ডিম রেখে ফুটিয়ে রেণু পোনায় পরিণত হওয়ার পরও ৩-৪ দিন পর্যন্ত রাখা হয়, সে পাত্রকে হ্যাচিং জার বলা হয়। ২৫০-৩০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হ্যাচিং জারে ৩০০-৫০০ গ্রাম রেণু উৎপাদন করা যায়। এ ক্ষেত্রে পানির প্রবাহ মাত্রা ১৫-২০ লিটার প্রতি মিনিটে হওয়া বাঞ্ছনীয়। হ্যাচিং জারে পানি ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে রেণু উৎপাদন কম-বেশি হয়। হ্যাচিং জারের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত রেণু উৎপাদন করা উচিত নয়। এতে রেণুর গুণগতমান কমে যাওয়াসহ হঠাৎ করে সমস্ত রেণু মারা যেতে পারে।

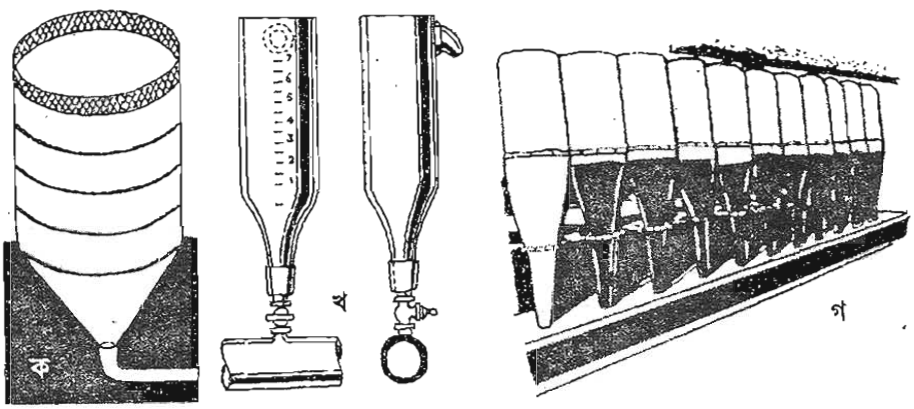

চিত্র : মাছের ডিম ফোটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের বোতল: (ক) ক্লে বোতল; (খ) গ্লাস বোতল এবং (গ) জুগার বোতল।

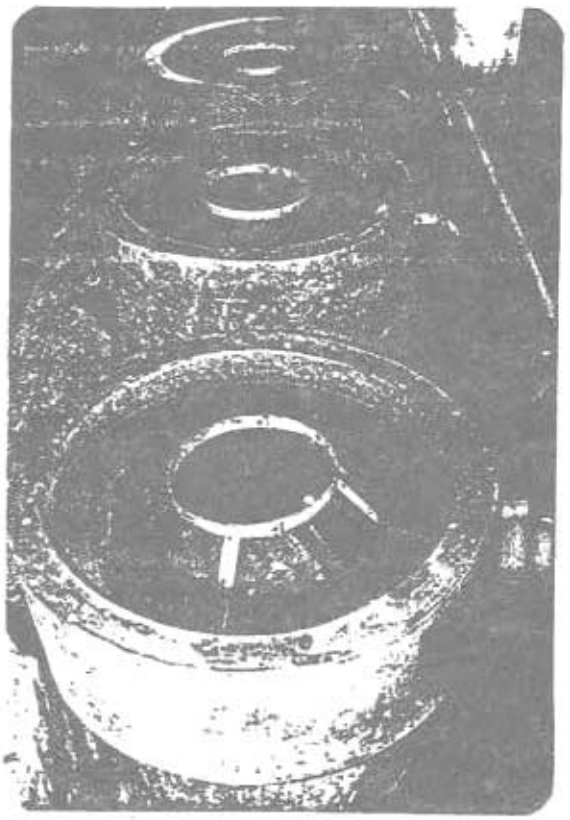

চিত্র : হ্যাচিং বোতল

ছ) গভীর ও অগভীর নলকূপ :

একটি মৎস্য হ্যাচারি পরিচালনার জন্য পানি সরবরাহ অতীব জরুরি বিষয়। স্বচ্ছ, পর্যাপ্ত অক্সিজেনযুক্ত এবং আয়রনমুক্ত পানি হ্যাচারির জন্য প্রয়োজন। হ্যাচারির পানিতে ০.০৩ নিযুতাংশের বেশি লৌহ থাকলে রেণু প্রাপ্তির হার কম হয়।

হ্যাচারি পরিচালনায় নিম্নলিখিত গুণাগুণ সম্পন্ন পানির প্রয়োজন হয় :

অক্সিজেন	৫.০ মি.গ্রাম/লিটার এর উপরে
তাপমাত্রা	২৫°-২৯° সেলসিয়াস
পি.এইচ	৭.৫-৮.৫
অ্যামোনিয়া	০.৫ মি.গ্রাম/লিটার এর নিচে
কার্বন ডাই-অক্সাইড	১৫ মি.গ্রাম/লিটার এর নিচে

জ) হ্যাচারি ঘর :

হ্যাচারির মূল অবকাঠামোকে রোদ, বৃষ্টি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য হ্যাচারির উপর যে ছাদ বা চাল নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাকে হ্যাচারি ঘর বলে। হ্যাচারির ঘর সাধারণত

পাকা, আধাপাকা বা কাঁচা হয়ে থাকে। হ্যাচারি ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন হ্যাচারিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস চলাচল করতে পারে। কিন্তু সরাসরি সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না।

ঝ) অফিস ঘর ও ল্যাবরেটরি :

একটি হ্যাচারির জন্য ছোট একটি অফিস ঘর থাকা প্রয়োজন। এই ঘরটিকেই ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এখানে প্রজননের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বিভিন্ন বই-পুস্তক, হিসাব-নিকাশের খাতাপত্র প্রভৃতি সংরক্ষণ করা হয়।

ঞ) গুদাম ঘর :

হ্যাচারির জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল, বড় ধরনের যন্ত্রপাতি, জাল, হাঁড়ি, ব্যারেল ইত্যাদি রাখার জন্য একটি গুদাম ঘর থাকে। এরকম গুদামে হ্যাচারির পুকুরে সারা বছর ব্যবহারের জন্য চুন, সার, খৈল, মাছের খাদ্য প্রভৃতি মজুদ করে রাখা হয়।

ট) পাম্প ঘর :

হ্যাচারির পাম্প সুষ্ঠুভাবে চালানো, রক্ষাণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য একটি পাম্প ঘরের প্রয়োজন হয়।

ঠ) যানবাহন : হ্যাচারির জন্য যানবাহন থাকা আবশ্যক। বড় ধরনের হ্যাচারির জন্য ট্রাক ও হ্যাচারির মাঝারি পিকআপ গাড়ি থাকলে ভালো হয়। ছোট হ্যাচারির জন্য অগত্যা রিক্সাভ্যান থাকলেও কাজ চলতে পারে। এসব যানবাহন হ্যাচারি থেকে রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ অন্যান্য স্থানে আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

মাছের প্রজনন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা :

সুষ্ঠুভাবে হ্যাচারি পরিচালনার জন্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম ও সেগুলোর ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো :

পুকুর অংশের জন্য :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	বেড় জাল	ব্রুড মাছ ধরার জন্য
০২	গুজরি জাল	পোনা ধরার জন্য
০৩	চট জাল	ধানী পোনা ধরার জন্য
০৪	হররা	পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূর করার জন্য
০৫	সেক্কি ডিস্ক	পানির স্বচ্ছতা পরিমাণের জন্য
০৬	পি এইচ মিটার	পানির পি এইচ মাপার জন্য
০৭	ডিও মিটার	পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন নির্ণয়ের জন্য
০৮	অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি	পোনা কাটাই করার জন্য
০৯	ব্যারেল	পোনা বহনের জন্য
১০	ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্প	পুকুর শুকানোর জন্য

হ্যাচারির জন্য :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	স্কুপনেট	চৌবাচ্চা থেকে মাছ ধরার জন্য
০২	হ্যাক'স ব্লেড	পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহের জন্য (মাছের মাথা কাটার জন্য)
০৩	করাতসহ ড্রিল মেশিন	মাছের মাথা কাটার জন্য
০৪	মাছের মাথা বসাবার জন্য কাঠের ফ্রেম	মাথা কাটার জন্য
০৫	ছুরি	মাথা কাটার জন্য
০৬	কাঁচি	পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহের জন্য
০৭	চিমটা	ঐ
০৮	নিডল	ঐ
০৯	স্কালপেল	ঐ
১০	রবারের ছিপিযুক্ত কাঁচের ভায়াল	ঐ

হরমোন দ্রবণ তৈরির সময় :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	পেট্রিডিস	পিটুইটারি গ্রন্থি গণনার জন্য
০২	হামান দিস্তা	পিটুইটারি গ্রন্থি গুঁড়া করার জন্য
০৩	সেন্ট্রি ফিউজ	দ্রবণ থিতানোর জন্য
০৪	সূক্ষ্ম ব্যালেন্স	পিটুইটারি গ্রন্থি ওজন নেওয়ার জন্য
০৫	সিরিঞ্জ	দ্রবণ ইঞ্জেক্ট করার জন্য
০৬	টিস্যু হোমাজিনাইজার	পিটুইটারি গ্রন্থি গোলানোর জন্য

ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	স্প্রিং ব্যালেন্স	ব্রুড মাছের ওজন নেওয়ার জন্য
০২	স্পঞ্জের প্যাড	ইঞ্জেকশনের সময় মাছ রাখার জন্য
০৩	চিকন সুইসহ সিরিঞ্জ	ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্য
০৪	থার্মোমিটার	পানির তাপমাত্রা নেওয়ার জন্য
০৫	গামছা বা তোয়ালে	মাছ মোছার জন্য/মাছের মাথার উপর দিয়ে মাছকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য ।

মাছ ডিম দেওয়ার জন্য :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	প্লাস্টিকের গামলা	ডিম সংগ্রহের জন্য
০২	প্লাস্টিকের বালতি	ডিম স্থানান্তরের জন্য
০৩	প্লাস্টিকের মগ	পানি তোলার জন্য

রেণু ও পোনা বিক্রয়ের সময় :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	কাচের বিকার	রেণু মাপার জন্য
০২	কাপড়ের হাপা	রেণু রাখার জন্য
০৩	বেতের তৈরি দাঁড়িপাল্লা	চারা পোনা ওজন করার জন্য
০৪	অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার	রেণু ও পোনা প্যাকিং-এর সময়
০৫	পলিথিন ভর্তি ব্যাগ, চটের ব্যাগ ও সুতলি	প্যাকিং-এর জন্য
০৬	ক্যালকুলেটর	হিসাব করার জন্য

ল্যাবরেটরির জন্য :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
০১	রেফ্রিজারেটর	গ্লান্ড সংরক্ষণের জন্য
০২	মাইক্রোস্কোপ	প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য
০৩	ম্যাগনিফাইং গ্লাস	প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য
০৪	ডিস্টিলড ওয়াটার	গ্লান্ডের দ্রবণ তৈরি করার জন্য
০৫	অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল	গ্লান্ড সংরক্ষণের জন্য
০৬	ফিল্টার পেপার	গ্লান্ড মোছার জন্য
০৭	মেজারিং ফ্লাক্স	রাসায়নিক দ্রব্য মাপার জন্য
০৮	ওয়াটার টেস্টিং কিটবক্স	পানি পরীক্ষার জন্য

প্রশ্নমালা-৩

এক কথায় উত্তর দাও :

১। হ্যাচারি কাকে বলে?

২। ইনকুবেশন ট্যাংক কী?

৩। হ্যাচারি স্থাপনের স্থান নির্বাচনে বিবেচনা করা হয় এমন দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যর নাম লেখ।

৪। পিজি বলতে কী বুঝায়?

৫। হ্যাচারির স্থানে পুকুর স্থাপনের সময় বেলে মাটির স্তর পেলে কী অসুবিধা হয়?

৬। হ্যাচারির পানির উৎস কী কী হতে পারে?

৭। নিম্নভূমিতে পুকুর নির্মাণে কী অসুবিধা দেখা যায়?

৮। হ্যাচারিতে বিদ্যুতের দুইটি ব্যবহার লেখ।

৯। হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

১০। মৎস্য প্রজনন হ্যাচারিতে প্রধানত কয়টি অংশ থাকে?

১১। হ্যাচারি পরিচালনার সুবিধার জন্য কয় প্রকার পুকুর থাকা প্রয়োজন?

১২। ব্রুড মাছের পুকুর কতটুকু হলে ভালো হয়?

১৩। লালন পুকুর কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

১৪। হ্যাচারির আঁতুড় পুকুরে কতদিন রেণু পোনা পালন করা হয়?

১৫। হ্যাচারির প্রতিটি পুকুর পাইপ দ্বারা সংযুক্ত থাকলে কী সুবিধা পাওয়া যায়?

১৬। পানির ট্যাংকের উচ্চতা কতটুকু হওয়া উচিত?

১৭। পানির ট্যাংকের আয়তন কত বড় হতে পারে?

১৮। ব্রুড মাছের আকার কত বড় হওয়া দরকার?

১৯। পানির লৌহ ডিমের কী ক্ষতি করে?

২০। ব্রিডিং ট্যাংকের ব্যাস কতটুকু রাখা হয়?

২১। একটি হ্যাচিং বোতলে কতটুকু ডিম ফোটানো হয়?

২২। ডিম ছাড়া মাছের পালন পুকুর বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মৎস্য হ্যাচারি বলতে কী বুঝায়?

২। হ্যাচারি স্থান নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?

৩। ব্রুড মাছ পালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪। মৎস্য প্রজননের হ্যাচারি অংশের অবকাঠামোগুলো কী কী?

৫। সার্কুলার ট্যাংক সম্পর্কে বিবরণ দাও।

৬। প্রজননের পর মাছের ডিম ফুটানোর জন্য হ্যাচিং বোতলের ভূমিকা লেখ।

৭। একটি হ্যাচারিতে ল্যাবরেটরির কাজ কী?

৮। হ্যাচারিতে মাছের মাথা থেকে পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার লেখ।

৯। মাছকে ইনজেকশন দেয়ার জন্য কী কী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হতে পারে?

১০। রেণু বিক্রয়ের জন্য কী কী সরঞ্জাম দরকার হয় বর্ণনা দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। হ্যাচারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

২। মৎস্য প্রজনন হ্যাচারির বিভিন্ন অংশের বিবরণ দাও।

৩। হ্যাচারির পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মাছের প্রণোদিত প্রজননে প্রয়োজনীয় উপকরণ

একটি হ্যাচারিতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে স্বল্পমূল্যের প্লাস্টিকের মগ, বালতি, পাইপ ইত্যাদি থেকে শুরু করে বেশি দামি যন্ত্র যেমন মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদক, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কীটনাশক, জৈব-অজৈব সার এবং মাছের খাবার। হ্যাচারি সফল পরিচালনার জন্য এ সব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। হ্যাচারি পরিচালনার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের উত্তেজক পদার্থ যার উপর মাছের ডিম ছাড়ার হার নির্ভর করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার উত্তেজক পদার্থের নাম, প্রাপ্তিস্থান, প্রকৃতি ও উৎস দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	পিজি/হরমোন প্রদানকারী ওষুধের নাম	কীভাবে পাওয়া যায়	প্রকৃতি	উৎস
১	পিটুইটারি গ্লান্ড	মাছের মগজের নিচে	দানাদার	দেশে সংগৃহীত ও আমদানিকৃত
২	পিটুইটারি গ্লান্ড	মাছের মগজের নিচে	পাউডার	আমদানিকৃত
৩	হিউম্যান কারিওনিক গোনাডোট্রোপিন যেমন সুমাছ (ভারত), কোরোলন (হল্যান্ড)	গর্ভবর্তী নারীদের প্রস্রাব থেকে	তরল	আমদানিকৃত
৪	ওভাপ্রিম	রাসায়নিক তৈরি	তরল	আমদানিকৃত
৫	এলআরএইচএ (LRHA)	ঐ	ঐ	ঐ
৬	ওভাক্লিন	ঐ	ঐ	ঐ
৭	ওভাম্যাক	ঐ	ঐ	ঐ
৮	ডমপিরিডন	ঐ	ঐ	ঐ
৯	প্রগনিল	ঐ	ঐ	ঐ
১০	প্রফেসি	ঐ	ঐ	ঐ

মাছ চাষে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণসমূহের নাম, প্রয়োগের উদ্দেশ্য, প্রয়োগ মাত্রা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি : মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই আমরা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকি। একই উপকরণ অল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে মাছ চাষে সফলতা বয়ে আনতে পারে। আবার সেই উপকরণই বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে মাছ মারাও যেতে পারে। তাই যে কোনো উপকরণ প্রয়োগের সময় অবশ্যই প্রয়োগের উদ্দেশ্য জেনে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। অতীব প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের নাম, প্রয়োগের উদ্দেশ্য, প্রয়োগের মাত্রা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো :

১. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের উপকরণসমূহ :

ক. রোটেনন পাউডার :

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ।

প্রয়োগমাত্রা : ৩০-৩৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতি : পরিমাণমতো রোটেনন পাউডার একটি সুবিধাজনক পাত্রে নিয়ে আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে পানি যোগ করে পেস্টের মতো কাঁই তৈরি করতে হবে। অতঃপর উক্ত কাঁই সমান তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ গুলে তরল করে এবং এক ভাগ ছোট ছোট বল তৈরি করে সমস্ত রোটেনন পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

খ. ব্লিচিং পাউডার :

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ।

প্রয়োগের মাত্রা : ১ কেজি/শতাংশ/ফুট পানি।

প্রয়োগের পদ্ধতি : পরিমান মতো ব্লিচিং পাউডার পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

গ. চিংড়ি দূরীকরণ :

উপকরণের নাম : সিমবুশ

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : গুঁড়া চিংড়ি দূরীকরণে।

প্রয়োগের মাত্রা : ৩ মিলি/শতাংশ/ফুট পানি।

প্রয়োগের পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় সিমবুশ একটি সুবিধাজনক পাত্রে নিয়ে পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৩. জলজ আগাছা দমন :

উপকরণের নাম : সিমজিন

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : নিমজ্জিত জলজ আগাছা ধংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– নাজাজ, ঝাঁঝি ইত্যাদি।

প্রয়োগের মাত্রা : ৩ মি গ্রাম/লিঃ

প্রয়োগের পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় ওষুধ পানিতে গুলে নিয়ে সারা পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪. পুষ্টি উপাদান মুক্ত করে ঘোলাত্ব দূরীকরণ এবং পানি বিশোধন উপকরণ :

ক. উপকরণের নাম : পোড়া চুন

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : মাটি থেকে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান পানিতে মুক্ত করতে এবং ঘোলাত্ব দূর করতে সহায়তা করে। মাছের জন্য ক্ষতিকর এমন সব রোগ বিস্তারের উৎস রোগজীবাণু এবং রোগজীবাণু বহনকারী পরজীবী ধ্বংস করে।

প্রয়োগ মাত্রা : ১ কেজি/শতাংশ/৫ ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন সুবিধাজনক পাত্রে কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরে ঠাণ্ডা হলে পানি যোগে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে পাড় ও বকচরসহ সমস্ত পুকুর সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে গরম অবস্থায় চুন প্রয়োগ না করাই ভালো।

খ. উপকরণের নাম : ফিটকিরি

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : পানির ঘোলাত্ব দূরীকরণে ফিটকিরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রয়োগ মাত্রা : ১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ

প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফিটকিরি পানির সাথে গুলিয়ে সারা পুকুর ছিটিয়ে দিতে হবে।

গ. ব্লিচিং পাউডার :

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : পানি বিশোধন চুনের পরিবর্তে ঘোলাত্ব দূর করতে এবং ক্ষতিকার রোগজীবাণু ধ্বংস করতেও ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ মাত্রা : ৫০০ গ্রাম/শতাংশ/৫ ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্লিচিং পাউডার সুবিধাজনক পাত্রে কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরে ঠাণ্ডা হলে পানি যোগে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে পাড় ও বকচরসহ সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে গরম অবস্থায় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ না করাই ভালো।

৫. পানি বিশোধন উপকরণ :

উপকরণের নাম : জিওলাইট

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে ও আধুনিক উপায়ে পুকুর প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ফলে মাছ রোগমুক্ত পরিবেশ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

প্রয়োগর মাত্রা : পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে ২০ কেজি/একর এবং পরবর্তীতে ১০ কেজি/একর ৩০-৪০ দিন পর পর প্রয়োগ করলে ভালো ফল লাভ করা যায়।

প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় জিওলাইট সুবিধাজনক পাত্রে কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরে ঠাণ্ডা হলে পানি যোগে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে পাড়ে ও বকচরসহ সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে গরম অবস্থায় জিওলাইট প্রয়োগ না করাই ভালো।

৬) পোনা শোধন উপকরণ :

উপকরণের নাম : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : পোনা শোধন বা পোনাকে জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ মাত্রা : একটি হাফড্রাম বা বড় পাতিল ১০ লিটার পানি নিয়ে তার মধ্যে ১ চামচ বা ৫ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর উক্ত দ্রবণে পরিবহনকৃত মাছ ছোট একটি জালে নিয়ে ৩০ সেকেন্ড উক্ত দ্রবণে গোসল করিয়ে পরে পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়।

৭) শেওলা ও পরজীবী নিয়ন্ত্রক উপকরণ :

১। উপকরণের নাম : কপার সালফেট বা তুঁতে

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : পুকুরে যদি অত্যধিক পরিমাণে ফাইটোপ্লাঙ্কটন জন্মে বা পানির মধ্যে/উপর শেওলার স্তর পড়ে তাহলে এটা ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ মাত্রা : ১০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি।

প্রয়োগের পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় পরিমাণ তুঁতে ছোট ছোট পোঁটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ৪-৬ ফুট নিচে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখলে বাতাসে পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁতে পানিতে মিশে শেওলা দূর করবে।

৮) জলজ পোকামাকড় দূর করার উপকরণ :

ক. উপকরণের নাম : সুমিথিয়ন বা সমগোত্রীয়/অর্থাৎ অর্গানোফসফেট জাতীয় বিষ

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : জলজ পোকামাকড় দমন বিশেষ করে হাঁসপোকা দমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি: রেণু পোনা ছাড়ার ১২ ঘণ্টা পূর্বে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সুমিথিয়ন পানিতে গুলে নিয়ে বকচরসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

খ. উপকরণের নাম : ডিপ্‌টারেক্স

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : যেহেতু সুমিথিয়ন ব্যবহার করলে শুধুমাত্র হাঁসপোকা মারা যায় কিন্তু রেণু পোনার শত্রু ক্লাডোসেরা ও কপিপোডা মারা যায় না। তাই ডিপটারেক্স ব্যবহার করলে হাঁসপোকা, ক্লাডোসেরা ও কপিপোডা মারা যায়। কিন্তু রেণু পোনার প্রিয় খাদ্য রোটিফার বেঁচে থাকে। তাই নার্সারি পুকুরে সুমিথিয়ন ব্যবহার না করে ডিপটারেক্স ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো।

প্রয়োগ মাত্রা : ১০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতি : রেণু পোনা ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ডিপটারেক্স পানিতে গুলে নিয়ে বকচরসহ সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৯) কতিপয় রোগ দমন :

ক. উপকরণের নাম : ক্লোরাম ফেনিকল।

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : ক্ষতরোগ নিরাময়ের জন্য।

প্রয়োগ মাত্রা : ব্রুডফিশের জন্য ইনজেকশন হিসেবে ২৫ মিলিগ্রাম/কেজি মাছ/সপ্তাহ ছোট মাছের জন্য ২০০ মিলি গ্রাম/কেজি খাদ্যের সঙ্গে।

প্রয়োগের পদ্ধতি : বড় মাছের ক্ষেত্রে প্রতিকেজি মাছের জন্য ২৫ মি. গ্রাম হারে উক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সপ্তাহে ১ দিন মোট তিন সপ্তাহে ৩টি ইনজেকশন মাংসপেশিতে দিলে মাছ দ্রুত ভালো হয়ে যায়। আবার মাছ যদি ছোট হয় তাহলে প্রতি কেজি খাদ্যের সঙ্গে ২০০ মি. গ্রাম উপরোক্ত অ্যান্টিবায়েটিক পাউডার মিশিয়ে মাছকে খাওয়াতে হবে।

খ. উপকরণের নাম : অক্সিটেট্রাসাইক্লিন

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : ক্ষতরোগের জন্য।

প্রয়োগ মাত্রা : ব্রুডফিশের জন্য ইনজেকশন হিসেবে ১০ মি. গ্রাম/কেজি মাছ/ সপ্তাহ, ছোট মাছের জন্য ১০০ মিঃ গ্রাম কেজি খাদ্যের সঙ্গে।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বড় মাছের ক্ষেত্রে উক্ত অ্যান্টিবায়েটিক সপ্তাহে ১ দিন মোট ৩ সপ্তাহে ৩টি ইনজেকশন মাংস পেশিতে দিলে মাছ দ্রুত ভালো হয়ে যায়।

গ. উপকরণের নাম : কপার সালফেট বা তুঁতে

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : ক্ষতরোগের জন্য ।

মাত্রা প্রয়োগ পদ্ধতি : ১ মি. গ্রাম/ লিঃ/ সপ্তাহ এভাবে সপ্তাহে ১ বার মোট তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ।

প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত মাছকে ১ লিটার পানি ১ মি. গ্রাম তুঁতে যোগ করে দ্রবণ তৈরি করে, উক্ত দ্রবণে ১ ঘণ্টা রেখে এভাবে সপ্তাহে একবার, মোট ৩ বার মাছকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে ।

ঘ. উপকরণের নাম : ম্যালাকাইট গ্রিন ।

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : ছত্রাকজনিত রোগের জন্য ।

প্রয়োগ মাত্রা : ২ মি. গ্রাম/ লি./ সপ্তাহ এভাবে সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ।

প্রয়োগ পদ্ধতি : ১ লিটার পানিতে ২ মি.লি. গ্রাম ম্যালাকাইট গ্রিন যোগ করে দ্রবণ তৈরি করে উক্ত দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তহে ১ বার, মোট ৩ বার (২ ঘণ্টা) বা সহ্য করার মতো সময় রেখে পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে ।

ঙ. উপকরণের নাম : ডিপ্‌টারেক্স বা সমগোত্রীয় ।

প্রয়োগের উদ্দেশ্য : আরগুলোসিস বা মাছের উঁকুনজনিত রোগের জন্য ।

প্রয়োগ মাত্রা : ১০ গ্রাম/ শতাংশ/ ফুট পানির জন্য ।

প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় ডিপটারেক্স সুবিধাজনক পাত্রে পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে সপ্তাহে ১ বার করে, পর পর ৩ সপ্তাহ ছিটিয়ে দিতে হবে ।

চ. উপকরণের নাম : সুমিথিয়ন বা সমগোত্রীয় ।
প্রয়োগের উদ্দেশ্য : আরগুলোসিস বা মাছের উঁকুনজনিত রোগের জন্য ।
প্রয়োগ মাত্রা : ৩ মি. লি. / শতাংশ/ ফুট পানির জন্য ।
প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় মাত্রায় সুমিথিয়ন সুবিধাজনক পাত্রে পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে সপ্তাহে ১ বার করে পর পর ৩ সপ্তাহ ছিটিয়ে দিতে হবে ।

প্রশ্নমালা-৪

এক কথায় উত্তর দাও

১। রাক্ষুসে মাছ দমনের জন্য রোটননের মাত্রা লিখ?

২। ঘোলাত্ব দূরীকরণের উপায় কী?

৩। শেওলা ও পরজীবী নিয়ন্ত্রণে কি ব্যবহার করা হয়?

৪। পোনা কীভাবে শোধন করা হয়?

৫। রোগ দমনের জন্য কী কী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রণোদিত প্রজননে কী কী হরমোন ব্যবহৃত হয়?

২। প্রণোদিত প্রজননে কী কী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়?

৩। হ্যাচারি জীবাণুমুক্ত করার জন্য কী কী রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়?

৪। পানি কীভাবে শোধন করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিভিন্ন প্রকার উত্তেজক পদার্থের নাম, প্রাপ্তিস্থান, প্রকৃতি ও উৎসের বর্ণনা দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রণোদিত প্রজননের জন্য ব্রুড মাছ লালন-পালন

ব্রুড মাছ বলতে প্রজনন উপযোগী বয়োপ্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে বুঝায়। প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নত মাছের পোনা উৎপাদনে ব্রুড মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে ষাটের দশকে কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন শুরু হয়। তবে আশির দশকে এটা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক উৎসের প্রজনন ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উপরই এদেশের মৎস্য চাষ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে উন্নত পোনার অভাব যথেষ্ট লক্ষণীয়। বর্তমানে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা থেকে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। কারণ হিসেবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা, প্রজননে ছোট আকৃতির ব্রুডের ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রজাতির সংকরায়ণই প্রধানতঃ দায়ী। এ সমস্যা নিরসনে অন্তঃপ্রজননমুক্ত উন্নত ব্রুড নির্বাচন ও সঠিক ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন।

প্রণোদিত প্রজননে ব্রুড মাছের গুরুত্ব :

প্রণোদিত প্রজননে সফলতার প্রধান সোপান হচ্ছে ব্রুড মাছ। ব্রুড মাছকে হ্যাচারির প্রাণ বলা হয়ে থাকে কারণ প্রণোদিত প্রজননের সফলতার পুরোটাই নির্ভর করে মাছের প্রজনন পরিচর্যা ও রক্ষণবেক্ষণের উপর। তাছাড়া যত্নের উপর প্রজননকারী মাছের পরিপক্বতা, ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি এবং প্রণোদিত প্রজননে সাড়া দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, মাছের ডিম ছাড়ার হার, নিষেকের হার, ডিম ফোটার হার এবং পোনার বেঁচে থাকার হারও প্রজননকারী মাছের যত্ন ও পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। তবে স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা উচিত। সুস্থ, সবল, বড় আকারের দ্রুতবর্ধনশীল মাছ ব্রুড হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত ৩টি ধাপে ভাগ করা যায় :

১। মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১। মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা :

ক) পুকুর নির্বাচন :

ব্রুড মাছের পুকুরের আয়তন ০.৫০ একর থেকে ১ একর হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুকুরে পানির গভীরতা ১.৫-২ মিঃ (৫-৭ ফুট) থাকতে হবে। পুকুরে পানি সরবরাহ ও নির্গমনের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। পুকুরের তলদেশের মাটি এঁটেল বা দোঁআশ এবং কাঁদার পরিমাণ ১০-১৫ সে.মি. হওয়া উচিত। পুকুর এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকে। জাল টানার সুবিধার জন্য আয়তকার পুকুর অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে বেশি হওয়া ভালো।

খ) পাড় মেরামত ও তলদেশের কাদা তোলা :

পুকুরে অতিরিক্ত কাদা নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়।

ii) পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস পায়।

iii) পানি দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে।

iv) স্ত্রী মাছের ডিম্বকোষ বৃদ্ধিতে ক্ষতি সাধন করে।

v) পুরুষ মাছের শুক্রাণু সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে।

vi) মাছ আহরণে সমস্যা হয়।

পুকুরে পাড় ভাঙা থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) পাড় ভাঙা থাকলে, মাছ বের হয়ে যেতে পারে।

ii) বিষাক্ত পানি ঢুকে মাছ মারা যেতে পারে।

iii) বাহির থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে ঢুকতে পারে

iv) মৎস্যভুক প্রাণী সহজে ঢুকতে পারে ইত্যাদি।

গ) জলজ আগাছা দূর করা :

জলজ আগাছা নিম্নোক্ত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) জলজ আগাছা পুকুরে থাকলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না, ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য কম তৈরি হয়।

ii) ক্ষতিকর প্রাণী যেমন: সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে পারে।

iii) জলজ আগাছা পুকুরের পুষ্টিকর দ্রব্য শোষণ করে নেয়।

iv) জলজ আগাছা ব্রুড মাছের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই সব ধরনের জলজ আগাছা দূর করতে হবে।

ঘ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা :

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি হয় :

i) চাষকৃত মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে।

ii) চাষকৃত মাছের জায়গা দখল করে নেয়।

iii) প্রজনন করে মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে ফেলে।

iv) মাছকে আহত করতে পারে।

দমন পদ্ধতি : রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ তিন ভাবে দমন করা যায়–

i) বার বার জাল টেনে : বারবার জাল টেনে জলাশয়ের ৮৫-৯০% রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করা সম্ভব।

ii) রোটেনন প্রয়োগ করে : প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করতে হয়।

iii) পুকুর শুকিয়ে : ইহা রাক্ষুসে অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে পুকুর রোগ জীবাণুমুক্ত হয়, উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই কাজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে করলে খরচ কম হয়।

ঙ) চুন প্রয়োগ :

চুন প্রয়োগে নিম্নলিখিত উপকার হয় :

i) চুন মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করে।

ii) মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর করে।

iii) জৈব পদার্থের পচন তরান্বিত করে।

iv) মাটি হতে ক্ষতিকর গ্যাস দূর করে দেয়।

v) মাটির পিএইচ ওঠা-নামাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

vi) রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে।

পুকুর শুকানোর পরপরই প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রৌদ্রোজ্জ্বল সময়ে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের পরপরই পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে।

চ) সার প্রয়োগ :

পুকুর প্রস্তুতকালে :

সারের নাম	মাত্রা/শতাংশ
ইউরিয়া	২৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	১২০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৮০০ গ্রাম
গোবর	৬০০০-৯০০০ গ্রাম

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর রাসায়নিক সার ও গোবর উপরোক্ত মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। এর ৪-৫ দিন পর হররা বা জাল টেনে তলদেশের মাটি নড়াচড়া করে ভেজানো খৈল পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

ছ) প্রকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। এক্ষেত্রে পানির রং হালকা সবুজ অথবা বাদামি হতে পারে। পানিতে ফাইটোপ্লাংক্টন বেশি থাকলে পানির রং হালকা সবুজ হয় এবং পানিতে জুপ্লাংক্টন বেশি থাকলে পানির রং বাদামি হয়। তিনভাবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায় :

(i) গামছা-গ্লাস পদ্ধতি

(ii) সেকিডিস্ক পদ্ধতি

(ii) হাত পদ্ধতি

জ) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা : পুকুরে রোটেননের সাহায্যে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা হলে এর বিষাক্ততা সাধারণত ৭ দিন পর্যন্ত থাকে। এর পরও সাবধনতা অবলম্বনের জন্য মাছ ছাড়ার আগে কিছু পরিমাণ মাছ ঐ পানিতে ২৪ ঘণ্টা রেখে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যায়।

ঝ) হররা বা জাল টানা : পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত বা ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার জন্য হররা বা জাল টানতে হয়।

২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা :

ক) প্রজাতি নির্বাচন :

কৃত্রিম প্রজননের সফলতা বহুলাংশে ব্রুড মাছের সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত হ্যাচারিতে বাণিজ্যিকভাবে কার্প জাতীয় মাছ যেমন- কাতলা, রুই, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও এবং থাই স্বরপুঁটি মাছের প্রজনন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন হ্যাচারিতে পাঙাশ মাছের প্রজনন করানো হয়ে থাকে। এলাকা ভিত্তিক রেণুর চাহিদার উপর ভিত্তি করে ব্রুডের প্রজাতি নির্বাচন করা উচিত।

খ) ব্রুড মাছ সংগ্রহ :

(i) প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ :

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত ব্রুড অন্তঃপ্রজনন মুক্ত, স্বাস্থ্যবান, দ্রুত বর্ধনশীল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। সংগৃহীত প্রাকৃতিক উৎসের মজুদ থেকে সঠিকভাবে ব্রুড বাছাই ও প্রতিপালনের পর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে পোনা পাওয়া যায় সেগুলো দ্রুত বর্ধনশীল উন্নত মানের পোনা। প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণুপোনা সংগ্রহ করেও ব্রুড তৈরি করা যায়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত রেণুপোনা অসংখ্য পৃথক পিতা-মাতা থেকে উৎপাদিত বিধায় উন্নত গুণগত মান বজায় থাকে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন সময়ে রেণুপোনা সংগ্রহ করে সেখান থেকে স্বাস্থ্যবান দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে উন্নত ব্রুড স্টক তৈরি করা যায়। ব্রুড স্টক তৈরি করার জন্য পোনাগুলোকে আলাদাভাবে প্রতিপালন করে তার মধ্যে থেকেই দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্বাস্থ্যবান পোনাকে বাছাই করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই একই ব্রুড স্টককে ৪-৫ বছরের

বেশি প্রজননে ব্যবহার করা উচিত নয়। শুরু থেকেই এ সকল কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে সতর্কতার সাথে আন্তরিকভাবে সম্পাদন করা উচিত।

(ii) পুকুর থেকে সংগ্রহ :

অন্তঃপ্রজননমুক্ত উন্নত ব্রুড হতে হ্যাচারিতে উৎপাদিত নিজস্ব পোনা থেকে বিক্রয়ের পূর্বে স্বাস্থ্যবান এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড স্টক তৈরির জন্য রাখা উচিত। সংগৃহীত পোনা যেন ভাই-বোন বা নিকট আত্মীয় না হয় এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে যারা দ্রুত বর্ধনশীল হবে তাদেরকে পর্যায়ক্রমিকভাবে এক বছর বয়সের মাছ থেকে উন্নত মাছগুলোকে ব্রুড স্টক তৈরিতে ব্যবহৃত করা হয়। বয়স্ক, রোগগ্রস্থ, স্বাস্থ্যহীন ব্রুড স্টককে প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এদের থেকে উৎপাদিত মাছের পোনা গুণগত বৈশিষ্ট্য খুবই নিম্নমানের হবে এবং পরবর্তীতে ব্যাপক কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় হবে।

(iii) ব্রুড প্রতিস্থাপন :

ব্রুড মাছ ব্যবহারের ফলে প্রতি বছরই কিছু না কিছু ব্রুড নষ্ট হয়। এগুলো পূরণের জন্য ২/১টি পুকুরে প্রাকৃতিক উৎসের কিংবা অন্য কোনো দূরবর্তী স্থান থেকে সংগৃহীত মান সম্মত পোনা প্রতিপালনের সংস্থান রাখতে হবে। এই পোনা থেকে দ্রুতবর্ধনশীল ও স্বাস্থ্যবান মাছগুলো পরিত্যক্ত ব্রুড মাছের বদলে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। বিদেশি প্রজাতির মাছগুলো দীর্ঘদিন আগে এদেশে আনা হয়েছে। এগুলোর অন্তঃপ্রজনন ঘটার ফলে গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা সরকারের সহায়তায় বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশ থেকে নতুন ব্রুড মাছ আনার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি।

(iv) ব্রুড ব্যাংক থেকে :

ব্রুড ব্যাংক হলো এমন একটি স্থান যেখানে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ বা উন্নত জাতের পোনা উৎপাদনের জন্য বিপুল সংখ্যক মাছকে প্রাকৃতিক উৎস হতে, বিদেশ থেকে আমদানি করে অথবা পুকুরে বা হ্যাচারিতে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। যেখান থেকে হ্যাচারি মালিকগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী পোনা সংগ্রহ করতে পারে সেই স্থানকে ব্রুড ব্যাংক বলে।

গ) টেকসইকরণ:

মাছকে প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে টেকসইকরণ বলে। ব্রুড মাছ পরিবহনের সময় মাছ তার পেটের ভিতরের খাদ্য মলত্যাগ বা বমি করে পানি যেন দূষিত করতে না পারে সেজন্য পরিবহনের আগে মাছকে জাল টেনে হাপা বা হাউজে রেখে, পানির ঝাঁপটা দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত মাছকে অভুক্ত রেখে টেকসইকরণ করতে হয়।

ঘ) ব্রুড মাছ পরিবহন

ব্রুড মাছ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিবহন করা উচিত। পরিবহনের সময় মাছ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। ব্রুড মাছ পরিবহনের আগে টেকসইকরণ জরুরি। এক্ষেত্রে জাল টেনে পানির ঝাঁপটা দিয়ে এবং ব্রুড মাছকে ৪৮ ঘণ্টা অভুক্ত রেখে টেকসইকরণ করা যেতে পারে। পরিবহনের

পূর্বে মাছ বাছাইয়ের কাজটি সকালবেলা সেরে ফেলা ভালো কারণ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মাছ বাছাইয়ের সময় বেশিক্ষণ উচ্চ তাপমাত্রায় পানিতে থাকার ফলে মাছের দেহে চাপ পড়ে। এতে করে প্রজননে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

দুই ধরনের পদ্ধতিতে ব্রুড মাছ পরিবহন করা হয় যেমন :

১। উন্মুক্ত বা খোলা পদ্ধতি

২। বদ্ধ পদ্ধতি

চিত্রঃ দুই মুখ খোলা হাতজাল ও কাপড়ের ব্যাগে করে ব্রুড মাছ নেওয়া হচ্ছে

১। উন্মুক্ত পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে পাত্রের উপরের দিক বা মুখ খোলা থাকে। এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতেও পারে আবার নাও পারে। প্রয়োজনে সময় সময় পানি বদল করে

দেওয়া যায়। পুকুর হতে হ্যাচারি দূরবর্তী স্থানে হলে পরিবহন ট্যাংকের মাধ্যমে ব্রুড মাছ পরিবহন করা উচিত। সাধারণত ট্রলি বা খোলা জীপের ওপর ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে ব্রুড মাছ পরিবহন অত্যন্ত নিরাপদ। মাছ পরিবহনের সময় পরিবহন ট্যাংকের ভিতরে পলিথিন ব্যাগ ঢুকিয়ে তার মধ্যে মাছ পরিবহন করা উচিত। তাছাড়াও কোনো কোনো স্থানে মোটা কাপড় বা ত্রিপলের তৈরি বিভিন্ন আকারের উন্মুক্ত পাত্র বিশেষ ধরনের ধাতব নির্মিত ফ্রেমে আটকিয়ে রেখে ব্রুড মাছ পরিবহন করা হয়। এ সময় ব্যাটারিচালিত এরেটর-এর সাহায্যে পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ব্রুড মাছ পরিবহনের সুবিধা হলো মাছ কম আহত হয় এবং পানি তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা থাকে। সাধারণত এ ধরনের পাত্রের আকার এক মিটার ব্যাস এবং ১.২৫ মিটার গভীর হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পদ্ধতিতে ব্রুড মাছ পরিবহন করা হয়।

২। বদ্ধ পদ্ধতি : সাধারণত স্বল্প দূরত্বের ব্রুড মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে ব্রুড মাছ স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে পরিমিত পরিমাণ পানি নিয়ে ৫-৬ কেজি ব্রুড মাছ রাখা হয়। মাছের মাথা পলিথিন ব্যাগের নিচের দিকে রাখতে হবে। তারপর মাছসহ পলিথিন ব্যাগে ভেজা বস্তার ভিতর ঢুকিয়ে অতি দ্রুত পরিবহনের কাজ সমাধা করতে হবে। তাছাড়া দূরবর্তী স্থানে ব্রুড মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের পাত্রের নকশা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ধরনের একটি পাত্রে একত্রে ৬০ কেজি ব্রুড মাছ পরিবহন করা যায়। পাত্রে প্রতি কেজি মাছ পরিবহনের জন্য ৪-৫ লিটার পানি থাকতে হবে। সাধারণত মাছগুলোকে মোটা পলিথিন ব্যাগে করে পরিবহন করা হয়। ব্যাগ যাতে ফেটে না যায় সেজন্য কাঠের বা মোটা কাগজের তৈরি বাক্সে ব্যাগটি রাখা হয়। পরিবহনকালে প্রয়োজনে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে।

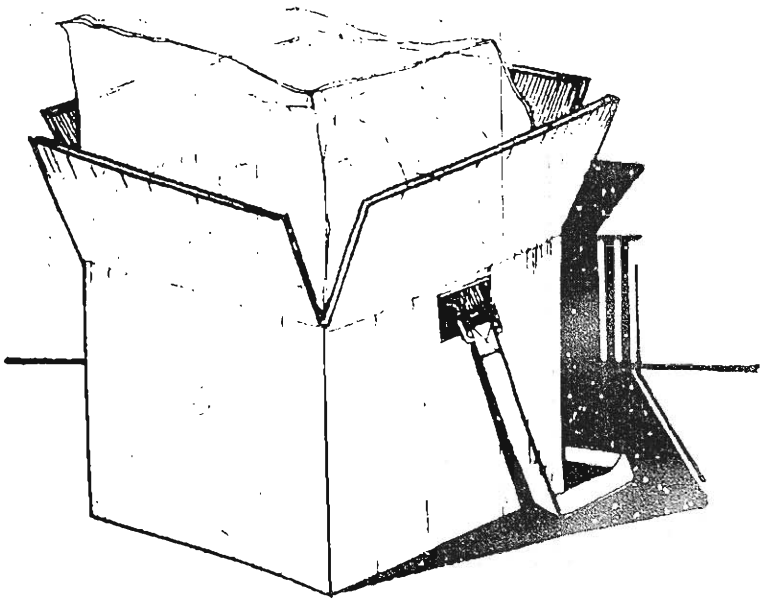

চিত্র : ব্রুড মাছ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত মোটা কাগজের তৈরি বাক্স

ব্রুড মাছ পরিবহনকালে ব্যবহৃত অবচেতনকারী ওষুধসমূহ :

ব্রুড মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে মাছকে অবচেতন করা আবশ্যক। সাম্প্রতিককালে ব্রুড মাছ পরিবহনের সময় মাছকে অবচেতন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত সুবিধার কারণে এ সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় :

১। মাছের ওপর সামগ্রিক চাপ হ্রাস পায়।

২। অক্সিজেন গ্রহণের হার হ্রাস পায় এবং একইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থে নিঃসরণ হ্রাস পায়।

৩। মাছের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত হয় ফলে দৈহিক ক্ষত কম হয়।

৪। ব্রুড মাছ সুস্থ ও সবল থাকে।

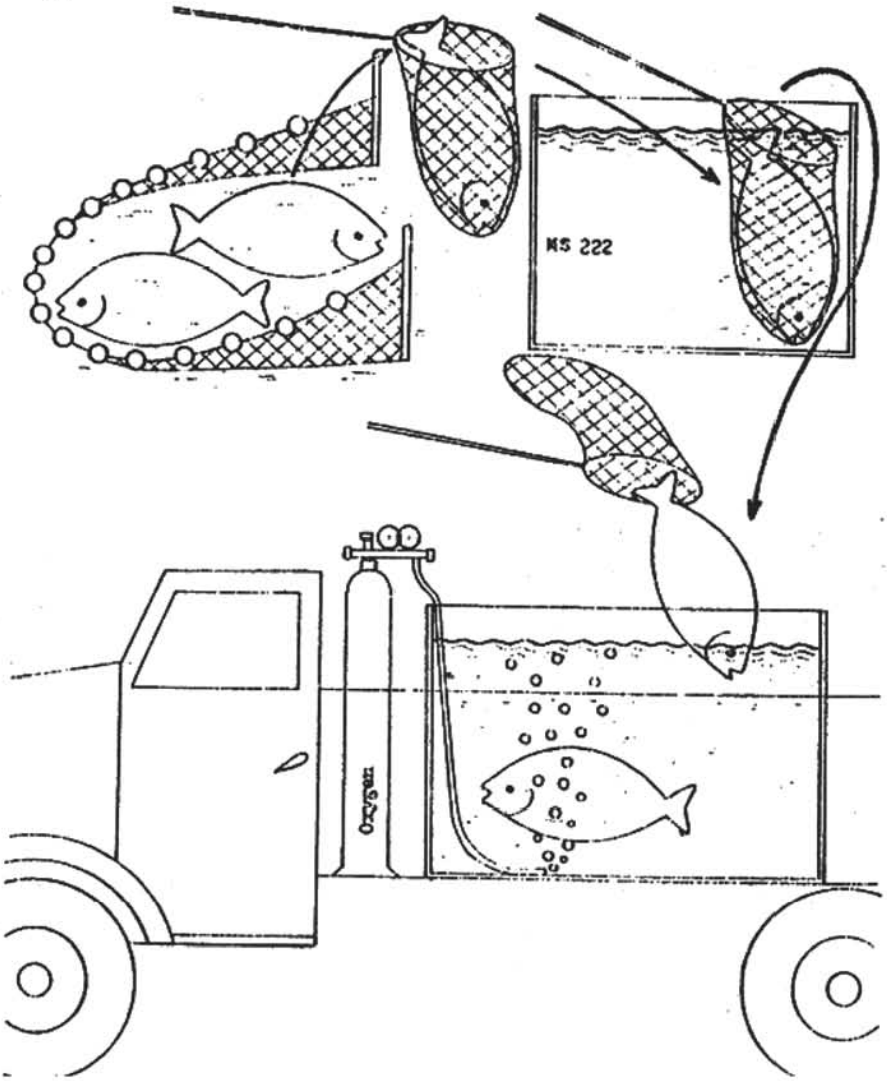

চিত্র : অবচেতনকারী ওষুধ ব্যবহারের কৌশল

রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে কম খরচে মাছকে পরিবহন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে পরিবহনের সময় পানির তাপমাত্রা ৫-১° সে. এর মধ্যে রাখা। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নয় কারণ পরিবহনকালে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তবে যদি পরিবহন মাধ্যম হিসাবে ঠাণ্ডা পানির সরবরাহ পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে রাসায়নিক অবচেতনকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত।

নিম্নলিখিত ওষুধসমূহ মাছকে অবচেতন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ওষুধের নাম	সুপারিশকৃত মাত্রা
১। নাভাইকেইন	৫০ মি.গ্রাম/কেজি মাছ
২। এমাবারবিটল সোডিয়াম	৮৫ মি. গ্রাম/কেজি মাছ
৩। বারবিটল সোডিয়াম	৫০ মি. গ্রাম/কেজি মাছ
৪। টারসিয়ারি এমাইল অ্যালকোহোল	২ মি. গ্রাম/৪.৫ লিটার
৫। মিথাইল প্যারাফাইনাল	১-২ মি.লি./লিটার
৬। ইউরেথন	১০০ মি. গ্রাম/লিটার
৭। থাই ওই উরাসিল	১০ মি. গ্রাম/লিটার
৮। হাইড্রোক্সি কুইনালডিন	১ মি.গ্রাম/লিটার
৯। এম. এস. ২২২	১ঃ২০০০০ পানি
১০। কুইনালডিন	১ঃ ৪০০০০ পানি

উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে কুইনালডিন এবং এমএস ২২২ মাছকে অবচেতন করার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কুইনালডিন বিষাক্ত হওয়ার ব্যবহারের সময় সতকর্তা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণত বৃহৎ আয়তনের পানিতে মাছকে অবচেতন করার কাজে কুইনালডিন ব্যবহৃত হয়। এম এস ২২২ দ্বারা ব্রুড মাছ অবচেতন করার সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমে ব্রুড মাছকে ১ঃ ২০০০০ মাত্রার এম এস ২২২ দ্রবণে রাখা হয়। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ যখন সম্পূর্ণভাবে অবচেতন হয় তখন উক্ত দ্রবণে পানি যোগ করে দ্রবণের ঘনত্ব কমানো হয়। কমন কার্প এবং বিগহেড কার্পের ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত ঘনত্ব হ্রাসের মাত্রা ২ গুণ (১ঃ ৪০০০০) গ্রাস কার্প মাছের ক্ষেত্রে ২-২.৫ গুণ (১ঃ৫০০০০) এবং সিলভার কার্প মাছের ক্ষেত্রে ৫ গুণ (১ঃ ১০০০০০)।

ঙ) শোধন :

পুকুরে ব্রুড মাছ ছাড়ার আগে মাছকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য শোধন করে নেওয়া হয়। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা লবণ দিয়ে ব্রুড মাছকে শোধন করতে হয়।

গ. ব্রুড মজুদ :

ব্রুড মাছ মজুদের হার ও ঘনত্ব কৃত্রিম প্রজননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করলে মাছের ডিমের পরিপক্বতা বিলম্বে আসে এবং প্রজননকাল ক্ষণস্থায়ী হয়। এতে মৌসুম শুরুতে রেণু উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পরবর্তীতে রেণুর মূল্য কমে যাওয়ায় হ্যাচারি মালিকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। মজুদ যোগ্য ব্রুডের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল:

i) প্রজাতির প্রকার

ii) মাটির গুণাগুণ

iii) পানির গুণাগুণ

iv) পানিতে উৎপাদনক্ষম প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

মজুদ হার প্রতি শতকে ৮.০ কেজি হতে ১২.০ কেজি। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রজননকারী ব্রুড মাছ পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে :

i) সব প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ একত্রে মজুদ করা।

ii) দুই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ একত্রে মজুদ করা।

iii) একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ একত্রে মজুদ করা।

iv) একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ ভিন্ন পুকুরে মজুদ করা।

কার্পিও মাছের মতো যে সব মাছ পুকুরে ডিম দেয় সে সব মাছ স্ত্রী ও পুরুষকে একত্রে এক পুকুরে রাখলে প্রজননের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে কার্পিও মাছের সাথে অন্য প্রজাতির মাছ না রাখাই ভালো।

যেহেতু সব প্রজাতির মাছের পুষ্টি চাহিদা এক রকম নয় সেজন্য প্রজাতি ভিত্তিক যত্ন নেয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পুকুরের ব্যবস্থা করা উচিত। সম্ভব হলে একই প্রজাতির স্ত্রী পুরুষ মাছকে আলাদা করে রাখা উচিত। এতে করে স্ত্রী-পুরুষের আলাদা যত্ন নেয়া সম্ভব। হ্যাচারির সাফল্য নির্ভর করে পরিপক্ব স্ত্রী ব্রুড মাছের উপর। তাই পুরুষের চেয়ে স্ত্রী ব্রুড মাছের যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

যদি পুকুরের অভাব হয় তাহলে একাধিক প্রজাতির মাছ নিম্নের মিশ্রণে একসাথে রাখা যেতে পারে–

i) রুই ও সিলভার কার্প

ii) গ্রাস কার্প ও কাতলা

iii) গ্রাস কার্প ও বিগহেড কার্প

iv) রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস।

যদি পুকুরের খুব বেশি অভাব থাকে তবে সব প্রজাতির মাছ নিয়ে এক পুকুরে রাখা যেতে পারে।

সিলভার কার্প	২৪%
বিগহেড কার্প	১২%
কাতলা	১২%
মৃগেল	১২%
রুই	২০%
গ্রাস কার্প	২০%
	মোট- ১০০%

যদিও একই পুকুরে সকল প্রজাতির মাছ মজুদ করা হয়। তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত :

১. একই পুকুরে সিলভার কার্প, রুই অথবা কার্পিও এক সাথে মজুদ করা যেতে পারে কিন্তু রুই এবং কার্পিও এর সাথে একত্রে সিলভার কার্প মজুদ করা উচিত নয়।

২. একই পুকুরে গ্রাস কার্প, কাতলা অথবা বিগহেড কার্পের এক সাথে মজুদ করা যেতে পারে কিন্তু কাতলা এবং বিগহেড কার্পের সাথে একত্রে গ্রাস কার্প মজুদ করা উচিত নয়।

৩. যেহেতু বিগহেড কার্প, কাতলা এবং সিলভার কার্পের খাদ্যাভ্যাস একই রকম সেহেতু এদের কখনো একই পুকুরে একত্রে মজুদ করা উচিত নয়।

৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

ক) মাছের মৃত্যুহার দেখা : মাছ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার পর থেকে পর দিন পর্যন্ত পুকুর পাড়ের চারপাশে ঘুরে দেখতে হবে কোনো মাছ মরে পানির উপরে ভেসে উঠেছে কি না। যদি কোনো মাছ মারা যায় সে ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ মাছ পুনরায় পুকুরে ছাড়তে হবে।

খ) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ও সার প্রয়োগ : পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত ভাবে সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১০০ গ্রাম টি.এস.পি ও ৩-৪ কেজি গোবর গুলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। সপ্তাহে অন্তত এক বার প্রাকৃতিক খাদ্যের মাত্রা হাত, গামছা-গ্লাস বা সেকিডিস্ক, যে কোনো একটা পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে হবে।

গ) সম্পূরক খাদ্যে প্রয়োগ : পুকুর বা জলাশয়ের মাটি ও পানির স্বাভাবিক উর্বরতায় পুকুরে যে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয় তা দিয়ে মাছের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। সেজন্য মাছের পুষ্টি চাহিদা পুরোপুরি মেটানোর জন্য বাইরে থেকে খাদ্যে সরবরাহ করা হয় পুকুরের বাইরে থেকে মাছকে দেয়া এসব খাদ্য দ্রব্যকে সম্পূরক খাদ্য বলা হয়।

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব :

i) মাছ পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

ii) মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

iii) ব্রুড মাছের গোনাডের দ্রুত পরিপক্বতা আসে।

iv) ব্রুড মাছের প্রজননকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

v) মাছের ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

vi) পোনা মৃত্যুহার সর্বনিম্ন হয়।

ব্রুড মাছের খাদ্যে নিম্নের ছক অনুযায়ী প্রোটিন সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়

মাছ (%)	প্রোটিন (%)	চর্বি (%)	শর্করা (%)
রুই জাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি)	২০-২৫	৮-১০	২৫-৩৫
ক্যাট ফিশ জাতীয় মাছ (মাগুর, পাঙাস)	২৫-৩০	৮-১০	২৫-৩৫

ব্রুড মাছের ওপর পুষ্টি চাহিদার প্রভাব :

ব্রুড মাছের গোনাডের পরিপক্বতা সরবারহকৃত খাদ্যে বিদ্যমান প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ ও মানের উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টির অভাব হলে নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

i) ব্রুড মাছ দেরিতে পরিপক্বতা লাভ করে।

ii) মাছের ডিমের সংখ্যা হ্রাস পায়।

iii) ডিমের আকার ছোট হয়।

iv) ডিমের গুণাগুণ নষ্ট হয় যেমনঃ রাসায়নিক উপাদান, লার্ভার বাঁচার হার, পরিস্ফুটন ক্ষমতা ইত্যাদি।

ব্রুড মাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানঃ

ব্রুড মাছের খাদ্যে পুষ্টি উপাদন প্রোটিন, চর্বি, শর্করা ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ কিছু পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন যেগুলো মাছের গোনাডের পরিপক্বতা, ডিম পরিস্ফুটনের হার ও ডিমের বঞ্চিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। নিম্নে ব্রুড মাছের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ পুষ্টি উপাদানের নাম ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো।

i) অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড মাছের শুক্রাণুর গুণাগুণ বৃদ্ধি করে এবং ডিমের ভেসে থাকার হার বাড়ায়।

ii) ফসফরাস মাছের প্রজনন সফলতা বাড়িয়ে দেয়।

iii) ভিটামিন-ই ডিমের পরিস্ফুটন ও লার্ভার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি করে।

সম্পূরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

যেহেতু ব্রুড মাছের প্রোটিন চাহিদা একই প্রজাতির মাছের সর্বানুকাল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সমান, সেহেতু মাছের মজুদ পুকুরে ব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্যেই ব্রুড মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে ব্রুড মাছের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফিশ মিল থাকতে হবে। কারণ ফিশ মিলে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান মাছের প্রজনন সফলতায় সাহায্য করে। নিম্নে ব্রুড মাছের জন্য ৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ একটি খাদ্যসূত্র দেয়া হলো :

খাদ্য উপাদান	শতকরা উপস্থিতি পরিমাণ
ফিশ মিল	২০
সরিষার খৈল	১৫
তিলের খৈল	১৫
চালের কুঁড়া	২৫
গমের ভুসি	২০
চিটাগুড়	৫

গমের ভুসি চালের কুঁড়া খৈল খাদ্যবল তৈরি

যেহেতু বিশেষ বিশেষ পুষ্টি উপাদান ব্রুড মাছের গোনাডের পরিপক্বতা, ডিমের পরিস্ফুটন, হার এবং লাভার বেঁচে থাকার হারকে ত্বরান্বিত করে সেহেতু এসব উপাদান উক্ত খাদ্যের সাথে মিশালেই চলবে। যেমন- প্রতি কেজি খাবারে ভিটামিন-এ ১০০০০-২০০০০ I.U এবং ৩৪ মি. গ্রাম ভিটামিন-ই মিশাতে হবে।

চিত্র : ট্রে-তে খাদ্যবল প্রয়োগ

ব্রুড মাছের বিশেষ খাদ্য পরিচর্যা :

নিম্নে ব্রুড মাছের বিশেষ খাদ্য পরিচর্যার বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. গ্রাস কার্প :

গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, ভুট্টো ও তিলের খৈলের সমানুপাতের মিশ্রণ খাদ্য হিসেবে দিতে হবে। খাদ্য দিনে দুইবার দেহের ওজনের ৩-৫% হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর সাথে প্রতিদিন দেহের ওজনের ১০০ ভাগ ঘাস ব্যবহার করতে হবে।

২. বিগহেড ও সিলভার কার্প :

পুকুরে প্রতি দশ দিন অন্তর ১.৫-২.০ টন/হেক্টর হারে জৈব সার দিতে হবে। যদি কোনো কারণে ডিম্বাশয় ভালোভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহলে শিমের খৈল, বাদামের খৈল, গমের ভুসি বা চালের কুঁড়ার সমানুপাতের মিশ্রণ খাদ্য হিসাবে প্রতিদিন দেহের ওজনের ৩-৫% হারে দিতে হবে।

৩. কাতলা :

পুকুরে কাতলাকে এককভাবে রাখতে হবে। গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি প্রয়োগ করে জুপ্লঙ্কটনের ঘনত্ব ৩০-৫০ মি. লি/১০০ লিটার বাড়াতে হবে। সয়াবিন বা ফিশমিল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করতে হবে। এতে প্রোটিনের পরিমাণ কমপক্ষে ২৫% থাকবে। খাদ্যে সরিষার খৈল না থাকাই ভালো, প্রতিদিন মাছের দেহের ওজনের ৩-৫% খাদ্য দিতে হবে।

৪. মৃগেল, রুই ও কার্পিও :

সমান হারে সয়াবিন মিল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি এবং সরিষার খৈল একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করতে হবে অথবা গমের ভুসি, সরিষার খৈল দানাদার গমের ভুসি এবং ফিশমিল ৪ঃ ৪ঃ ১ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে মাছের দেহের ওজনের ৩-৫% হারে প্রতিদিন দুইবার করে প্রয়োগ করতে হবে। সরিষার খৈল সারা রাত ভিজিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

গ) পানির গুণাগুণ রক্ষা করা :

ব্রুড মাছের পরিপক্বতা পুকুরের পানির ও মাটির গুনাগুনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই পুকুরের পানি মাঝে মধ্যে আংশিক পরিবর্তন অর্থাৎ (১৫-২৫%) করে দিলে ভালো হয়। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে মাছের পরিপক্বতা দ্রুত আসে। পুকুরের পানি পরিবর্তন একদিকে যেমন পানির আপেক্ষিক পরিবাহিতা কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে পানিতে মুক্ত আয়ন যেমন Na^{+},K^{-}, Ca^{++}ও cl^{-} এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ফলে গোনাডের পানি/আয়ন সরবরাহ বৃদ্ধি পায় যার ফলে গোনাডের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

ব্রুড মাছের পুকুরে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং তাদের সর্বানুকুল মাত্রা নিম্নে দেওয়া হলো :

ভৌত গুণাগুণ	মাত্রা
১। পানির রং	হালকা সবুজ বা বাদামি
২। স্বচ্ছতা	২৫-৩০ সেন্টিমিটার
৩। আলো	প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা
৪। তাপমাত্রা	২৫°-২৯° সেলসিয়াস

রাসায়নিক গুণাগুণ	মাত্রা
১। দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫ PPM –এর উপরে
২। কার্বন ডাই-অক্সাইড	১৫ PPM এর কম
৩। P^H (পিএইচ)	৬.৫-৮.৫
৪। অ্যামোনিয়া	০.৫ PPM এর কম

ঘ. হররা টানা : সপ্তাহে একবার জাল বা হররা টেনে পুকুরের তলদেশের জমাকৃত বিষাক্ত গ্যাসসমূহ দূর করে ব্রুড মাছের সর্বানুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে যথাসময়ে পরিপক্বতা আনয়নের মাধ্যমে সুস্থ-সবল ব্রুড মাছ তথা উন্নত মানের রেণু উৎপাদনে সহায়তা করা।

ঙ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা :

ব্রুড মাছ রোগাক্রান্ত হলে তার ডিমের পরিপক্বতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে তাই মাছ যেন রোগাক্রান্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। সাধারণত ব্রুড মাছ আরগুলাস নামক এক ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায় যাকে মাছের উঁকুন বলে এবং তা রুই জাতীয় মাছের বেলায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আরগুলাস দ্বারা মাছ আক্রান্ত হলে যথাশীঘ্র সম্ভব এর প্রতিকার করা বাঞ্ছনীয়। এই রোগ প্রতিকারের জন্য ০.৫ পি. পি. এম হারে ডিপটারেক্স বা ০.১ পি পি এম সুমিথিয়ন তিন দিন অন্তর সপ্তাহে দু'বার ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া হ্যাচারিতে মাছ পরিবহন ও স্থানান্তরের সময় বিভিন্নভাবে মাছের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়াজনিত আক্রমণে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে মজুদের পূর্বে ভালোভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে প্রয়োজনে মজুদের আগে ব্রুড মাছকে শোধন করা যেতে পারে। আর ক্ষতের পরিমাণ বেশি মাছগুলোকে ১৫ মি.গ্রাম/কেজি হারে টেরামাইসিন ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে।

ব্রুড ব্যবস্থাপনা সকল ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করা হ্যাচারি পরিচালনার পূর্বশর্ত। কোনো কারণে ব্রুড ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি হলে হ্যাচারি পরিচালনা সম্পূর্ণ অলাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা প্রয়োজন তা অনেক হ্যাচারিতেই না করে আশপাশের মাছ চাষের পুকুর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এনে প্রজনন ঘটানো হয়। এ অবস্থায় মাছের আকার, স্বাস্থ্য, পরিপক্বতা, বয়স, বংশগতি, উৎপত্তির ইতিহাস কিছুই বিবেচনা করা হয় না। কেবল পেটে ডিম আছে কিনা কিংবা পুরুষগুলোর মিল্ট আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়েই প্রজনন ঘটানোর জন্য সংগ্রহ করা হয়।

এছাড়া হ্যাচারির পুকুরে যে সব ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই ২/৪ জোড়া ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা থেকেই তৈরি ব্রুড। পরবর্তীতে ও বার বার প্রজননকৃত একই ব্রুডের বংশধরদের ব্রুড পরিণত করা হয়। ফলে অন্তঃপ্রজননের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ২-৩ বংশগতিতেই (Generation) দেখা যায়।

বড় আকারের ব্রুড মাছের ডিমের পরিমাণ ছোট আকারের মাছের তুলনায় কম। তাই হ্যাচারি ব্যবস্থাপকেরা তাদের ব্রুড মাছ ছোট করে রাখতে আগ্রহী। তাছাড়া মাছের প্রজনন ঘটানোও সহজ এবং ডিম পাড়ার হারও বেশি। তাই বাণিজ্যিক সফলতার উদ্দেশ্যে গুণগতমান গৌণ হয়ে পড়ে।

হ্যাচারিতে ব্রুড ব্যবস্থাপনার ছক

হ্যাচারিতে ব্রুড ব্যবস্থাপনা ছক নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো–

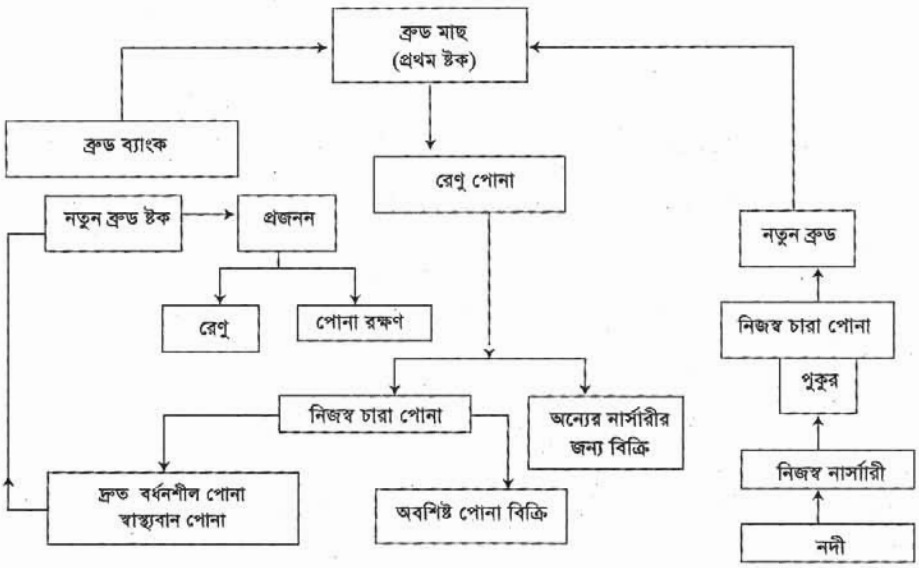

চিত্র : হ্যাচারিতে ব্রুড ব্যবস্থাপনা ছক

প্রজননের জন্য ব্রুড মাছ নির্বাচনের কৌশল :

ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর কৃত্রিম প্রজননের সফলতা নির্ভর করে। প্রজনন কার্যক্রম শুরুর আগে মাছ প্রজনন উপযোগী হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার দরকার। আমাদের দেশে যেসব প্রজাতির মাছ প্রজননের জন্য হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের প্রজননকাল সাধারণত মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক সময় ক্যাথেটারের সাহায্যে ডিম্বাশয় থেকে ডিম সংগ্রহ করে। পরিপক্ব স্ত্রী মাছ শনাক্ত করা গেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে পুরুষ ও স্ত্রী ব্রুড মাছ শনাক্ত করা হয়। প্রজনন মৌসুমে প্রজননে প্রস্তুত মাছের লক্ষণাদি প্রায় সব প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে একই ধরনের হয়। লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
১। বক্ষপাখনা তুলনামূলক ছোট এবং পাখনার সর্ব বাহিরের রশ্মি খুব মোটা নয়।	১। বক্ষ পাখনা তুলনামূলক লম্বা এবং সর্ব বাহিরের রশ্মি মোটা ও বড়।
২। বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক মসৃণ ও পিচ্ছিল হবে।	২। বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক খসখসে হবে।
৩। পেট স্ফীত ও নরম হবে।	৩। পেট চিকন হবে।
৪। পায়ু ফোলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল।	৪। পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের হবে।
৫। তলপেটে সামান্য চাপ দিলে ডিম বের হবে।	৫। তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দুধের মতো তরল (মিল্ট) বেরিয়ে আসে।

চিত্র : পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ কাতলা মাছ

প্রজাতি নির্বাচন : কৃত্রিম প্রজননের সফলতা বহুলাংশে ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। যেমন: নদী অথবা সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য খামার থেকে। সাধারণত কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে ২-৪ বছর বয়সের ১-৫ কেজি ওজনের স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্রুড মাছ ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক সময় প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহকৃত ব্রুড মাছের সঠিক বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এসব মাছ অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রী মাছ ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা উচিত এবং এক্ষেত্রে সুস্থ্য-সবল ও বড় আকারের দ্রুত বর্ধনশীল মাছকেই ব্রুড মাছ হিসাবে নির্বাচন করা উচিত।

সাধারণত হ্যাচারিতে বাণিজ্যিকভাবে কার্প জাতীয় মাছ যেমন:- রুই, কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও এবং থাই সরপুঁটি মাছের প্রজনন করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো হ্যাচারিতে ক্যাটফিশ

জাতীয় মাছ যেমনঃ শিং দেশি মাগুর, অক্সিজেন মাগুর এবং পাঙ্গাশ মাছের প্রজনন করানো হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন প্রজাতির ব্রুড মাছের প্রজাতি নির্বাচনের তথ্যাদি প্রদত্ত হলোঃ

কাতলা : কাতলা মাছ ৪৫-৫৫ সে.মি. লম্বা হলে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। তিন থেকে চার বছর বয়সের স্ত্রী মাছ এবং ২-৩ বছর বয়সের পুরুষ মাছ নির্বাচন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতি কেজি ওজনের কাতলা মাছ থেকে ২০০০০০-২৪৬০০০ টি ডিম পাওয়া যায়।

রুই : সাধারণত ১-৩ কেজি ওজনের রুই মাছ প্রজননক্ষম হয়। চাষের পুকুরে রুই মাছ ২ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরি হয়ে যায় এসময় পুরুষ ও স্ত্রী মাছের দৈর্ঘ্য থাকে যথাক্রমে ৪৬-৬৫ সে. মি. এবং ৫০-৭০ সে. মি. এর মধ্যে প্রতিকেজি দেহ ওজনের রুই মাছ ১০০০০০-৪০০০০০ টি ডিম দেয়।

মৃগেল : মৃগেল মাছ ১-৩ কেজি ওজনে প্রজননক্ষম হয়। মৃগেল ২ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। প্রতি কেজি দেহ ওজনের মৃগেল ৩০০০০-২৫০০০০ টি ডিম দেয়।

সিলভার কার্প : সিলভার কার্প ২-৩ বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয় এসময় এদের ওজন ২-৫ কেজি হয়ে থাকে। এরা প্রতি কেজি দেহ ওজনে ১৬০০০০-৩০০০০০ টি ডিম দেয়।

বিগহেড কার্পঃ সাধারণত বিগহেড কার্প ২-৩ বছরে প্রজননক্ষম হয়। এ সময় এদের ওজন হয়ে থাকে ৩-৭ কেজি। এর প্রতি কেজি দেহ ওজনে আনুমানিক ১২৬০০০ টি ডিম দেয়।

গ্রাস কার্পঃ গ্রাস কার্প ২-৩ বছরে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এসময় এদের ওজন থাকে ১.৫-৪.০ কেজি। এরা প্রতি কেজি দেহ ওজনে ৪৪০০০-১১৫০০০ টি ডিম উৎপাদন করে।

কার্পিও : কার্পিও মাছ ১ বছর বয়সেই প্রজননক্ষম হয়ে থাকে। সাধারণত এরা প্রতি কেজি দেহ ওজনে ১০০০০০ থেকে ২০০০০০ টি ডিম দেয়।

থাই সরপুঁটি : এরা সাধারণত ১ বছর বয়সেই প্রজননক্ষম হয়ে থাকে। প্রতি কেজি দেহ ওজনে এরা ২০০০০০-৩০০০০০ টি ডিম দেয়।

দেশি মাগুর : দেশি মাগুর ১ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এরা প্রতি ১০০ গ্রাম দেহ ওজনে ৩০০০-৫০০০টি ডিম উৎপাদন করে।

পাঙ্গাস : সাধারণত পাঙ্গাস মাছ ৩ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এরা প্রতি কেজি দেহ ওজনে ৬০০০০-১০০০০০ টি ডিম দেয়।

প্রশ্নমালা-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্রুড মাছ বলতে কী বুঝায়?
২। ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন কী?
৩। ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৪। ব্রুড মাছের পুকুরের আয়তন কতটুকু হলে ভালো হয়?
৫। ব্রুড মাছের পুকুরে অতিরিক্ত কাদা থাকলে মাছের কী ক্ষতি হয়?
৬। ব্রুড মাছ কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায়?
৭। ব্রুডের মজুদ ঘনত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?
৮। ব্রুড মাছের ঘনত্ব কত হওয়া উচিত?
৯। সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?
১০। ব্রুড মাছের পুষ্টির অভাবে কী লক্ষণ দেখা যায়?
১১। ব্রুড মাছের খাদ্যে কী পরিমাণ ভিটামিন দিতে হয়?
১২। গ্রাস কার্পের বৃদ্ধির জন্য বাড়তি কী খাদ্য দেওয়া হয়?
১৩। ব্রুড মাছের সম্পূরক খাদ্যে আমিষের ভাগ কত হওয়া উচিত?
১৪। ব্রুড মাছের পুকুরে তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?
১৫। হ্যাচারি মালিকরা ছোট ব্রুড মাছ থেকে পোনা উৎপাদনে আগ্রহী কেন?
১৬। ব্রুড মাছে কোনো রোগ বেশি হয়?
১৭। মাছের উকুনের নাম কি?
১৮। আরগুলাস দমনের জন্য কী ওষুধ ব্যবহৃত হয়?
১৯। আহত মাছকে ইনজেকশন দেয়ার জন্য কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়।
২০। ব্রুড মাছ অবচেতনের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের ২টি নাম লেখ।
২১। ব্রুড মাছের পুকুরে পানির স্বচ্ছতা কী হওয়া উচিত?
২২। কতভাবে ব্রুড মাছ পরিবহন করা যায়?
২৩। ব্রুড মাছের পুকুরে প্রতিদিন কত ঘণ্টা রোদ হলে ভালো হয়?
২৪। ব্রুড মাছের পুকুরে কী কী সার দিতে হয়?
২৫। টেকসইকরণ কি?
২৬। ব্রুড ব্যাংক কাকে বলে?
২৭। ব্রুড পালনের পুকুরের পানি কোন কোন গুণাগুণ লক্ষ্য রাখা জরুরি?
২৮। স্বল্প দূরত্বে ব্রুড পরিবহনে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়?
২৯। ব্রুড মাছ প্রতিস্থাপনের দরকার হয় কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পুরুষ ও স্ত্রী মাছ নির্বাচনের কৌশল লেখ।

২। ব্রুড মাছের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা কী কী?

৩। ব্রুড মাছের মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা কি কি?

৪। ব্রুড মাছের মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কী কী?

৫। ব্রুড মাছের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ কী অনুপাতে রাখা হয়?

৬। সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব লেখ।

৭। একই পুকুরের বিভিন্ন প্রজাতির ব্রুড মাছের মজুদের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত?

৮। ব্রুড মাছের পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ কী কী?

৯। ব্রুড মাছের বিশেষ পুষ্টি উপাদানের নাম ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

১০। ব্রুড মাছের পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো লেখ।

১১। বর্তমানে হ্যাচারি পোনার সমস্যা কী?

১২। ব্রুড পরিবহনে চেতনা নাশক কেন ব্যবহার করা হয়?

বড় প্রশ্ন

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২। ব্রুড মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বর্ণনা কর।

৩। ব্রুড মাছের সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বর্ণনা দাও।

৪। ব্রুড পালন পুকুরের পানি গুণাগুণ রক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।

৫। ব্রুড মাছের পরিবহন কৌশল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাষযোগ্য মাছের পরিপক্বতা ও প্রজনন আচরণ

চাষকৃত মাছের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস

কাতলা *(Catla catla)*

ভারতীয় উপমহাদেশ ও মিয়ানমার কাতলা মাছের বাসভূমি, মিঠা পানির নদী ও বড় জলাশয়ে এই মাছের বাসস্থান। এই মাছ সাধারণের অত্যন্ত প্রিয়।

এদের খাদ্য নিম্নরূপ :

খাদ্যের নাম	তরুণ মাছ	বয়স্ক মাছ
ক্রাস্টেসিয়া	৮০%	৬৪%
শেওলা	১০%	৩০%
রটিফার	৬%	২%
কীটপতঙ্গ	৩%	১%
অন্যান্য	১%	৩%

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কাতলা মাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশে কাতলা মাছের বৃদ্ধি হার নিচে দেওয়া হলো :

সময়	ওজন (গ্রাম)	দৈঘ্য বৃদ্ধি (মি.মি.)
প্রথম বছর	৩৫৪	২৯৫
দ্বিতীয় বছর	২,১৯৩	৫১৪
তৃতীয় বছর	৬,৫০১	৭১৬
চতুর্থ বছর	১০,২৮২	৮২৩
পঞ্চম বছর	১৪,৬৬৫	৯১৭

তবে সার্বিকভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, চাষের পুকুরে একটি কাতলা মাছ কত বড় হবে, তা নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার উপর। কম ঘনত্বে ভালো খাদ্য খেলে ৬ মাসে একটি কাতলা প্রায় ৩ কেজির মতো

ওজনের হতে পারে। কাতলা মাছ কত বড় হলে প্রজনন করে তা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের অভিমত প্রদান করেছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

বিজ্ঞানীর নাম ও সাল	কাতলার দৈর্ঘ্য
Chacho and Kuriyan, 1948,1950 →	559 m.m
Alikuni,1957 →	557 m.m
Menon Elat 1959 →	550 m.m
Natarajan and Jingran, 1963 →	442mm

বাংলাদেশে কাতলার প্রজননকাল মে-আগস্ট মাস প্রতি কেজি দেহ ওজনের কাতলা মাছের ডিম উৎপাদন সক্ষমতা ২০,০০০-২,৪৬,০০ পর্যন্ত। কাতলা নদীতে ডিম দেয়, বদ্ধ পানিতে প্রজনন করে না। পানি সিক্ত ডিমের ঘন ফল প্রায় ০.০৮ মি.মি. এবং কুসুম থলি শোষণের পর একটি পোনার ওজন হয় ০.০০২৫ গ্রাম।

রুই *(Labeo rohita)*:

মিঠা পানির নদীতে এরা বাস করে, ভারতীয় উপমহাদেশসহ মিয়ানমার পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। এই মাছ জলাশয়ের তলদেশে ও মধ্যে স্তরের খাদ্য গ্রহণ করে। চাষের পুকুরে রুই মাছ দ্বিতীয় বছরে পরিপক্বতা অর্জন করে বা প্রজননের জন্য তৈরি হয়। কখনো এরা ১ বছরেই প্রজননের জন্য তৈরি হয়ে যায়। বাংলাদেশে ৩-৪ বছরে রুই মাছ প্রজনন উপযোগী হয়। তবে চাষের মাছের ক্ষেত্রে বর্তমানে এসময় কমে যাচ্ছে। জুন-জুলাইয়ের দিকে রুই মাছ প্রজননের জন্য তৈরি হয়।

পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের আগে প্রজননের জন্য তৈরি হয় এবং বড় আকারের মাছ ছোট আকারের মাছের চেয়ে আগে প্রজননের জন্যে পরিপক্ব হয়। কিছু পুরুষ মাছ যখন ৪৬.২ দীর্ঘ হয় তখন প্রথম প্রজননের জন্য তৈরি হয়, তবে ৬৫.০ সে.মি. দৈর্ঘ্যের মাছ শতকরা ১০০ ভাগ প্রজননের জন্যে প্রস্তুত হয়। রুই মাছ প্রতিকেজি দেহ ওজনের জন্য ডিম তৈরি করে ১,০৯০০০-৪,১৩০০০টি। প্রাকৃতিক জলাশয়ে রুই মাছ বিভিন্ন বয়সে নিম্নলিখিত দৈর্ঘ্যে পৌছে।

বয়স	দৈর্ঘ্য (মি.মি.)
১	৩১০
২	৫০০
৩	৬৫০
৪	৭৪০
৫	৮০০
৬	৮৫০
৭	৮৯০

৮	৯২০
৯	৯৪০
১০	৯৬০

চাষের পুকুরে মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার উপর। ঘনত্ব কম থাকলে মাছ বেশি বড় হয়।

পানিসিক্ত রুই মাছের একটি ডিমের ঘনফল দাঁড়ায় ০.০৭৪ মি.মি. এবং কুসুম থলি শোষণের পর একটি পোনার ওজন দাঁড়ায় ০.০০২১ গ্রাম।

মৃগেল *(Cirrhinus mrigella)*:

মৃগেল মাছের বিস্তৃতি রুই-কাতলা মাছের মতোই এবং এরা মিঠা পানির নদীর অধিবাসী। মৃগেল পানির তলদেশের খাদ্যে এবং পচা জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে খায়, প্রাকৃতিক জলাশয়ের মৃগেলের বিভিন্ন বয়সে নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে :

বয়স (বছর)	দৈর্ঘ্য (মি.মি.)	ওজন (গ্রাম)
১	২৯০	২৪৫
২	৫১১	১৫১২
৩	৬৭০	৩৬১২
৪	৭৯৭	৬৩২৪
৫	৮৫৮	৮০৩০
৬	৮৮৮	৮৯৬০
৭	৯১১	৯৭১২

চাষের পুকুর ব্যবস্থাপনার উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। এক বছর বয়সে মৃগেল প্রজননের জন্য তৈরি হতে পারে। প্রতিকেজি দেহ ওজনের মৃগেল মাছের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০-২,৫১,০০০টি- প্রজনন শুরু হয় আগস্ট মাসে।

পানিসিক্ত ডিমের ঘনফল থাকে ০.১১ মি.মি. এবং কুসুম থলি শোষণের পরপর একটি পোনার ওজন থাকে ০.০০২৫ গ্রাম।

চাইনিজ কার্পসমূহ :

গ্রাস কার্প (Ctenopharyngodon idella):

গ্রাস কার্প চীনের সমতল ভূমির নদীতে বাস করে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এ মাছ আমদানি করা হয়েছে। গ্রাস কার্প অন্যান্য সিপ্রিনিড জাতীয় মাছের মতো, দাঁতবিহীন। তবে এর গলবিলে (pharynx) দুই

সারি দাঁত আছে যার দ্বারা ঘাসজাতীয় খাদ্য চিবিয়ে খেতে পারে, গ্রাস কার্পের পরিপাকতন্ত্র খুব দক্ষ নয়। এরা যে খাদ্য গ্রহণ করে তার ৫০% এরা হজম করে। গ্রাসকার্পের পোনা প্রোটোজোয়া, রটিফার, নপ্লি ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এরা তলবাসী শেওলা খায়। এরা যত বড় হতে থাকে তত উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যের দিকে ঝুঁকতে থাকে। বয়স্ক মাছ walffia, lemmna, Spinodela, Hydrilla, Najas, Ceratophykkum ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ খায়। তাছাড়া বয়স্ক মাছ ও পোনা মাছ কুঁড়া, খৈল, রেশম পোকা, রান্নাঘরের আবর্জনা, মানুষের মল ও গোবর খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

নিচে এসব খাদ্যের পরিবর্তন হার দেখানো হলো :

খাদ্য	পরিবর্তন হার
কুঁড়া	৪-৬:১
খৈল	৩-৪.৫:১
রেশম পোকা	১.১:১
আখের পাতা	৪০:১
হাঁসের মল	৪৩:১

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে প্রাকৃতিক জলাশয়ে চীনে গ্রাস কার্পের বৃদ্ধি নিম্নের হারে হয়ে থাকে :

বয়স	দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	ওজন
১	১৫-৩০	২২৫-৬৫০ গ্রাম
২	৬০	১.৮-২.৩ কেজি
৪	-	৪.৫ কেজি

নদীতে গ্রাস কার্প ২০ কেজি পর্যন্ত বড় হতে দেখা গেছে। ২-৩ বছরে এ মাছ প্রজননের জন্য তৈরি হয়। মালয়েশিয়ার ১ বছরেই এর প্রজনন করে, এমন সময় এদের ওজন থাকে ১.৫ কেজি। প্রতি কেজি মাছের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা হলো ৪৪,০০০-১,১৫,০০০ টি। পানিসিক্ত ডিমের ঘনফল হলো ০.০৫৫ মি. লি. এবং কুসুম থলি শোষণের পর পোনার ওজন হয় ০.০০২২ গ্রাম। এরা নদীতে ডিম দেয়। বর্ষা আরম্ভ হলে (জুন-জুলাই) এদের প্রজনন শুরু হয়।

সিলভার কার্প : (*Hypophtalmichthys molitrix*) সিলভার কার্প চীনের ইয়াংসি নদীসহ মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের নদীগুলোতে বাস করে। আমুর নদীতে ও এদের দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে এই মাছের আমদানি হয়েছে। এ মাছের পোনা প্ল্যাঙ্কটন রটিফার নপ্লিয়াই শূক খেয়ে থাকে। বয়স্ক

মাছ প্রধানত উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন গ্রহণ করে। এরা উদ্ভিদজাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। এদের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য দেহের দৈর্ঘ্যের ১৫ গুণ লম্বা।

প্রাকৃতিক জলাশয়ে সিলভার কার্পের বৃদ্ধি হার কেমন তা জানা নেই। তবে চাষের পুকুরে এদের বৃদ্ধি খুব ভালো এবং তা নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার উপর। সিলভার কার্প দৈর্ঘ্যের জন্য দ্বিতীয় বছরে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হার দেখায়। অন্যদিকে ওজনের জন্য দেখায় তৃতীয় বছরে। নিচে চাষের পুকুরে মাছে বৃদ্ধিহার দেখানো হলো :

বয়স	দৈর্ঘ্য	ওজন
২	৫০.০	১,৮০৩
৩	৫৭.৬	৪,৬৫০
৪	৬০.৩	৫,৩৪০
৫	৬৩.০	৬,৪০০

চীনে ২-৩ বছরে সিলভার কার্প প্রজননের জন্য তৈরি হয়। তখন এদের দেহের ওজন থাকে ২-৫ কেজি। প্রতি কেজি দেহ ওজনে এরা ডিম উৎপাদন করে ১,৬১,০০০-১৯৪,০০০টি এদের পানিসিক্ত ডিমের ঘনফল ০.০৭ মি.লি. এবং কুসুম থলি শোষণের পরপর পোনার জন্য ওজন হয় ০.০০৩ গ্রাম। সিলভার কার্পের প্রজননের সময় হলো মার্চ-জুলাই মাস, এরা নদীতে ডিম দেয়।

বিগহেড কার্প (*Aristichthys nobilis*) চীনের ইয়াংসি নদীসহ অনেক নদীতে বিগহেড কার্পের চাষ হয়। অনেক দেশে এই মাছের আমদানি হয়েছে। এদের পোনা সিলভার কার্পের পোনাদের মতো খাবার খায়। এদের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য সিলভার কার্পের অন্ত্রের চেয়ে খাটো এরা নদীতে প্রধানত প্রাণিপ্ল্যাঙ্কটন খেয়ে থাকে। এদের বৃদ্ধির প্রকৃতি সিলভার কার্পের মতো নিচে তা দেখানো হলো :

বয়স	দৈর্ঘ্য	ওজন
২	৬৩.০	৩,২৫০
৩	৭৪.৬	১০,৭০০
৪	৭৫.১	১০,৯০০
৫	৭৭.৮	১১,৮০০

এরা ২-৩ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। তখন এদের ওজন থাকে ৩-১০ কেজি। প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য বিগহেড ১,২৬০০০ টির মতো ডিম দিয়ে থাকে। যখন বিগহেড পোনা ডিম ফুটে বের হয়

তখন এদের দৈর্ঘ্য থাকে ৭.৫ মি. লি. এবং ওজন থাকে ০.০০২ গ্রাম। বর্ষাকাল (জুন-জুলাই) এদের প্রজনন কাল।

কার্পিও (*Cyprinus carpio*) :

কার্পিও মাছের চারটি উপ-প্রজাতি আছে এবং সেগুলো হলো ইউরোপের (*C carpio*) মধ্যে এশিয়ার (*C. aralensis),* আমুর নদীর *(C. haematopterus*) এবং দূর প্রাচ্যের (C. *virodiviolaceus*) কার্পিও মাছের অনেক varities রয়েছে। কার্পিও মাছ প্রধানত প্রাণী প্লাঙ্কটন খেয়ে বেঁচে থাকে। কার্পিও মাছ ১ বছর বয়সে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এরা নদী বা বদ্ধ পানিতে ডিম দেয়, এদের ডিম আঠালো এরা পৌষ মাঘ বা ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে প্রজনন করে।

মাগুর (*Clarias spp*) : বাংলাদেশে মাগুর (*Clarias batrachus*) ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। অর্থাৎ এদের দেহে আইঁশ নেই, গোফ আছে, এবং বক্ষ পাখনায় কমপক্ষে দুটি কাঁটা আছে। প্রজননের সময় হলো মে-আগস্ট।

শিং (*Heteropneustes fossilis*)

শিং মাছ ও ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। এরা কীটজাতীয় প্রাণী খায়। এরা এক বছর বয়সে প্রজনন করে এবং প্রজননের সময় হলো এপ্রিল-আগস্ট। এরা বদ্ধ পানিতে বা মুক্ত পানিতে ডিম দেয়। এরা সহজেই কৃত্রিম প্রজননে সাড়া দেয়।

কই (*Anabas testudineus*)

কই মাছ এক বছর বয়সে ডিম দেয়। এরা সহজেই কৃত্রিম প্রজননে সাড়া দেয়।

চাষযোগ্য মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

মৎস্য চাষ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো, নিয়মিতভাবে সঠিক মানের পোনা সরবরাহ করা। হ্যাচারিতে প্রণোদিত উপায়ে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করে উন্নত ও সঠিক মানের পোনা উৎপাদন করেই মৎস্য চাষের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। আর সঠিক মানের পোনা উৎপাদনের জন্য প্রধান কাজই হলো প্রত্যেকটি হ্যাচারিতে সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন প্রচুর পরিমাণে জেনেটিকভাবে বিশুদ্ধ ব্রুড মাছ মজুদ এবং পরিচর্যা করা। আমাদের দেশে বর্তমানে ৮৯টি সরকারি হ্যাচারি আছে যেখানে ১৪৭৭৫ কেজি রেণু উৎপাদন হয় এবং ৮১৩টি বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি আছে যেখানে ৫৯৪৮৩৯ কেজি রেণু উৎপাদন হচ্ছে। চাষযোগ্য বিভিন্ন মাছের প্রণোদিত প্রজনন কৌশল নিম্নে দেওয়া হলো :

রুই, কাতলা, মৃগেল, মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

বর্তমানে দেশে রুই জাতীয় মাছের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই মৎস্য চাষে রুই জাতীয় মাছের উন্নতমানের পোনা সঠিক আকার ও সময়মত জোগান দেওয়ার জন্য, মাছের প্রণোদিত প্রজনন করা হয়। মার্চের শুরু থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত রুই ও মৃগেল মাছের প্রণোদিত প্রজনন করা হয়। মার্চের আগেই এসব মাছ দৈহিকভাবে প্রজনন উপযোগী হয়ে যায়। তবে কাতলা একটু বিলম্বে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে প্রজনন উপযোগী হয়। রুই জাতীয় মাছের প্রণোদিত প্রজনন কৌশল নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

১. ব্রুড মাছ সংগ্রহ

i) প্রাকৃতিক উৎস থেকে অর্থাৎ নদ-নদী, প্লাবন ভূমি প্রভৃতি জলাশয় থেকে বন্য জাতের রুই মাছ সংগ্রহ করা হয়।

ii) হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করতে হয়।

iii) ব্রুড ব্যাংক হতে রুই জাতীয় মাছের ব্রুড সংগ্রহ করা হয়।

iv) এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড আদান প্রদান অর্থাৎ ব্রুড বিনিময় করে।

২. ব্রুড মাছ পালন

i) ব্রুড মাছ মজুদের পূর্বেই মজুদ পুকুরটি শুকিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করে অতিরিক্ত কাঁদা সরিয়ে ফেলতে হবে। শতাংশপ্রতি ১-১.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর, টি.এস.পি ২০০ গ্রাম ও ইউরিয়া ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে ব্রুড মজুদ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ii) মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হলে ভালো হয়। মজুদকালে পুকুরের তিনটি স্তরের মাছই মজুদ করলে খাদ্যের অপচয় হয়না। সুযোগ থাকলে প্রজাতি অনুযায়ী বা পুরুষ-স্ত্রী মাছ আলাদা পুকুরে পালন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

iii) প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে ২০-২৫% আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য দৈনিক দুইবার প্রয়োগ করতে হবে।

iv) ব্রুড মাছের রোগ-বালাই যাতে না হয় সে জন্য মাঝে মাঝে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. ব্রুড মাছ বাছাই

i) ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর প্রণোদিত প্রজননের সফলতা নির্ভর করে। মাছ বাছাইয়ের ব্যাপারটি মূলত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বাছাইয়ে খুবই সর্তক থাকতে হয়। পুকুরে মজুদ সব মাছ একত্রে পরিপক্ব হয় না। এজন্য ব্রুড বাছাই এর সময় পুকুরে জাল টেনে একটা একটা করে মাছ পরীক্ষা

করা হয়। স্ত্রী মাছের পেট যথেষ্ট স্ফীত ও নরম, পায়ুপথ স্ফীত, কিছুটা সম্প্রসারিত, লাল বা গোলাপি বর্ণের হলে বুঝতে হবে ব্রুডটি যথেষ্ট পরিপক্ব হয়েছে। পুরুষ ব্রুড মাছের পেট চিকন থাকে। তবে পেটে হালকা চাপ দিলে সাদা দুধের মতো শুক্র বা মিল্ট বেরিয়ে আসে। নিচের ছকে প্রজনন উপযুক্ত ব্রুড মাছের বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হলো :

ছক : ব্রুড বাছাইয়ের জন্য পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ মাছের বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক নং	স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
১।	বক্ষ পাখনা তুলনামূলক ছোট এবং পাখনার সর্ব বাহিরের রশ্মি খুব মোটা নয়।	বক্ষ পাখনা তুলনামূলক লম্বা এবং সর্ব বাহিরের রশ্মি মোটা ও বড়।
২।	বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক মসৃণ ও পিচ্ছিল হবে।	বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক খসখসে হবে।
৩।	পেট স্ফীত ও নরম হবে।	পেট চিকন হবে।
৪।	পায়ু ফোলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল হবে।	পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের হবে।
৫।	তলপেটে সামান্য চাপ দিলে ডিম বের হবে।	তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দুধের মতো তরল (মিল্ট) বেরিয়ে আসে।

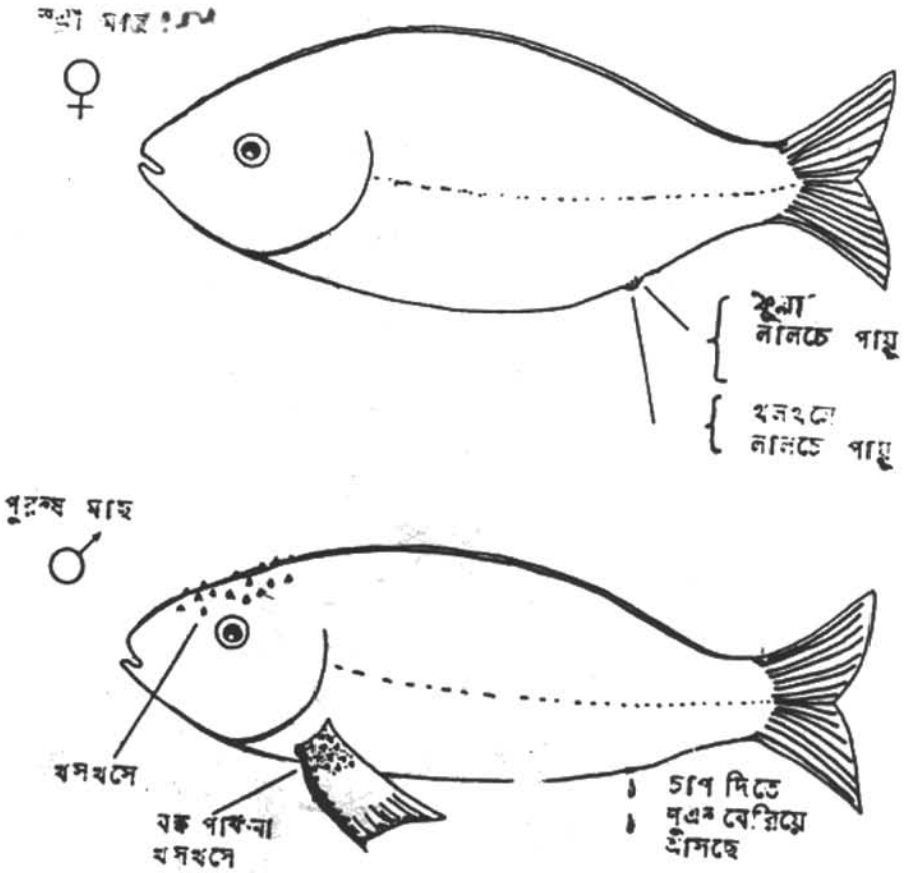

চিত্র : প্রজননযোগ্য স্ত্রী ও পুরুষ মাছের বৈশিষ্ট্য

ব্রুড বাছাইয়ের সময় জাল টানা, মাছ ধরা এবং পুকুর থেকে হ্যাচারির চৌবাচ্চায় আনার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার যাতে মাছ কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। যে মাছগুলো পরীক্ষা করার পর আবার ছেড়ে দেওয়া হয় তখনও খুব সতর্ক থাকতে হয়। যাতে মাছ কষ্ট না পায়। অনেক সময় জালের মাছ একত্র করার সময় খুব লাফালাফি শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় খুব ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হবে। লাফ মেরে ওঠা মাছের আঘাতে জাল টানায় নিয়োজিত মানুষ যেন আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। ব্রুড মাছের পুকুর হতে প্রজননের জন্য বাছাইকৃত মাছ হ্যাচারির চৌবাচ্চা পর্যন্ত আনার জন্য কাপড় বা জালের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার সুবিধাজনক। দূরবর্তী পুকুর থেকে ব্রুড আনয়নের সময় অবচেতন করে আনতে হবে। অবচেতন করার জন্য প্রতি লিটার পানিতে একফোটা ক্লোভ অয়েল (Clove Oil) মিশিয়ে ব্রুড মাছ পরিবহন করা যেতে পারে। তবে ওষুধ প্রয়োগের মাত্রা প্রজাতি ভেদে ও পানির তাপমাত্রার উপর কম বা বেশি হতে পারে। বাছাইয়ের সময় বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী মাছের জন্য দ্বিগুণ সংখ্যায় পুরুষ মাছ নেওয়া

হয়। তবে ওজনের দিক থেকে স্ত্রী মাছের ওজনের দেড় গুণ পরিমাণ পুরুষ মাছ হলে ভালো হয়। অর্থাৎ ২ কেজি ওজনের স্ত্রী মাছের জন্য ১.৫ কেজি ওজনের ২টি পুরুষ মাছে ৩ কেজি ওজনের হতে হবে। প্রজননের জন্য মাছ বাছাই করার ১-২ দিন পূর্বে ব্রুড মাছের পুকুরে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হয় এবং জাল টেনে মাছকে অভ্যস্ত করে নিতে হয়। মাছ বাছাই করে হ্যাচারির চৌবাচ্চায় ৫-৮ ঘণ্টা রেখে দিতে হয় যাতে হ্যাচারির পানিতে ব্রুড মাছ অভ্যস্ত হতে পারে।

১. হরমোন প্রয়োগ

প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত হরমোন বিভিন্ন উৎস হতে পাওয়া যায় এবং এগুলো বাজারে বিভিন্ন নামে প্রচলিত যেমন-

i) মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি বা পিজি

ii) এইচসিজি (H.C.G) যেমন-সুমাছ (ভারত), কোরোলন (হল্যান্ড)

iii) ওভাপ্রিম

iv) এল আর এইচ এ (LRHA) ইত্যাদি

মৎস্য প্রজননে হরমোনের প্রয়োগ মাত্রা বিভিন্ন প্রজাতির জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো মাছে শুধু পিজি আবার কোনো কোনো মাছে পিজি এবং এইচসিজি দুটোই প্রয়োগ করতে হয়। প্রজনন কাল, আবহাওয়া, তাপমাত্রা, ব্রুড মাছের পরিপক্বতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হরমোন প্রয়োগ কম বা বেশি হতে পারে। তবে রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোনের উৎস হিসেবে পিজি ব্যবহার করা হয়। পিটুইটারি গ্লান্ড বা পিজিতে গোনাডোট্রপিন হরমোন বিদ্যমান থাকে যা মাছের প্রজননকে প্রভাবিত করে।

৫. হরমোনের মাত্রা

রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোনের উৎস হিসেবে পিজি ব্যবহার করা হয়। হ্যাচারি পরিচালনার জন্য পিজি সংগ্রহ করা একটি ব্যয়বহুল খাত, সে কারণে সঠিক মাত্রায় পিজি ব্যবহার করলে একদিকে যেমন মাছের প্রজনন ভালোভাবে সম্পন্ন হবে ,অন্যদিকে পিজির অপচয়ও রোধ হয়।

পিজি বা হরমোনের মাত্রা নির্ভর করে ব্রুড মাছের ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতা এবং পানির তাপমাত্রার উপর। অপরিপক্ব ব্রুড মাছও তুলনামূলক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ক্ষেত্রে হরমোন বা পিজি একটু বেশি মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়। তাই মাছের পরিপক্বতা ও আবহাওয়াগত কারণে প্রজনন মৌসুমের বিভিন্ন মাসে পিজি বা হরমোনের মাত্রা কম বেশি হয়ে থাকে। সাধারণভাবে রুই, কাতলা মাছের প্রণোদিত প্রজননের জন্য স্ত্রী মাছের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৮-১৬ মিলিগ্রাম এবং পুরুষ মাছের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১-৪ মিলিগ্রাম পিজি ব্যবহার হয়ে থাকে। স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে মোট হরমোনের পরিমাণকে তিন ভাগে ভাগ করে মোট দুইবারে

হরমোন প্রয়োগ করা হয়। প্রথম ইনজেকশনের ৬ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় বা শেষ মাত্র দেওয়া হয়। পুরুষ মাছকে এ সময়ে অর্থাৎ স্ত্রী মাছের দ্বিতীয় ইনজেকশনের সময় ১-৪ মিলিগ্রাম পিজি প্রতি কেজি ওজনের জন্য একমাত্র ডোজ হিসেবে দেওয়া হয়। প্রণোদিত প্রজননে হরমোন মাত্রার ভিন্নতা কম বেশি হওয়া নির্ভর করে ব্রুড মাছের পরিপক্বতা, আবহাওয়া এবং হ্যাচারি পরিচালকের অভিজ্ঞতার উপর নিম্নে দুটি ছকে ব্রাক (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক সুপারিশকৃত রুই জাতীয় মাছের প্রজননে মাস ওয়ারি পিজি প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো :

ছক : ব্রাক কর্তৃক সুপারিশকৃত মাসওয়ারি রুইজাতীয় মাছের পিজি প্রয়োগের মাত্রা :

প্রজাতি	মাস	১ম ইনজেকশন	ব্যবধান	২য় ইনজেকশন	
মৃগেল	ফেব্রুয়ারি-মার্চ /ফাল্গুন-চৈত্র	২	৬	৬	
মৃগেল	এপ্রিল-মে বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	২	৬	৫.৫	২য় ইনজেকশন ৪-৮ ঘণ্টার মধ্যে মাছ ডিম দিতে শুরু করে
রুই		২	৬	৬	
কালিবাউস		২	৬	৫.৫	
কাতলা		২	৬	৬	
মৃগেল	জুন-জুলাই বা আষাঢ়-শ্রাবণ	১	৬	৫	
রুই		২	৬	৫	
কাতলা		১	৬	৫	
কালিবাউস		১.৫	৬	৫	
মৃগেল	আগস্ট-সেপ্টেম্বর বা ভাদ্র-আশ্বিন	১	৬	৫.৫	
রুই		১.৫	৬	৬	
কালিবাউস		১	৬	৫.৫	

দ্রষ্টব্য : পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের প্রথম মাত্রার সমান হরমোন স্ত্রী মাছের দ্বিতীয় ডোজের সময় একমাত্র ডোজ হিসেবে দিতে হয়।

ছক : মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশকৃত রুই জাতীয় মাছের জন্য মাস ওয়ারি পিজি ব্যবহারের পরিমাণ

প্রজাতি	মাস	১ম ইনজেকশন	ব্যবধান ঘণ্টা	২য় ইনজেকশন	মন্তব্য
কাতলা	এপ্রিল-মে বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১	৬	৪	ব্রুড যথেষ্ট পরিপক্ব হলে এবং আবহাওয়া
মৃগেল		২	৬	৬	
রুই		২	৬	৮	
কালিবাউস		২	৬	৬	

২০২০

কাতলা	মে-জুন বা জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়	১	৪-৬	৪	অনুকূলে থাকলে হরমোনের মাত্রা সামান্য কম বা বেশি হলে প্রজননে কোনো অসুবিধা হয় না।
মৃগেল		১-২	৪-৬	০-৪	
রুই		২	৪-৬	৬-৮	
কালিবাউস		১-২	৪-৬	০-৩	
কাতলা	জুন-জুলাই বা আষাঢ়-ভাদ্র	০.৫-১.০	৪-৬	৪	
মৃগেল		০-১.০	৪-৬	০-৪	
রুই		০-২.০	৪-৬	০-৪	
কালিবাউস		০-১.০	৪-৬	০-৪	

৬. দ্রবণ তৈরি

বাছাই করা ব্রুড মাছের প্রজাতি অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের ওজন একটি খাতায় লিখে রাখা হয়। এই হিসাব থেকে প্রতিটি মাছের কতটুকু পিজি প্রয়োজন তা নির্ণয় করা হয়। পূর্বে সংগৃহীত এবং অ্যালকোহল/অ্যাসিটোনে সংরক্ষিত পিজি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিজি নিয়ে টিস্যু পেপার দিয়ে চেপে চেপে শুকিয়ে নিতে হবে। এসিটোন সংরক্ষিত পিজি সরাসরি সূক্ষ্ম পাল্লায় দিয়ে মেপে নিতে হয়। এবারে পিজিকে টিস্যু হোমোজিনাইজার বা হামান দিস্তা (মর্টার) দিয়ে ভালোভাবে পিষতে হবে। পেষার সময় সামান্য পরিমাণে ডিস্টিলড ওয়াটার বা পরিশ্রুত পানি দিতে হবে। পানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে প্রতি কেজি ব্রুড মাছের দেহে ০.৩ মিলি গ্রামের বেশি দ্রবণ প্রবেশ না করে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিশ্রুত পানি দিয়ে ভালোভাবে দ্রবণ তৈরি করে ৩০ মিনিট ধরে একটি টেস্টটিউবে রেখে দিতে হবে। ভালোভাবে থিতানোর জন্য সেন্ট্রিফিউজ মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে। থিতানো দ্রবণ হতে তলানিটুকু বাদ দিয়ে পরিষ্কার দ্রবণ ইনজেকশনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি

সূক্ষ্ম সুচ ব্যবহার করে সিরিঞ্জের সাহায্যে মাছকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। ২০-২২ নম্বর সুচ ব্যবহার সুবিধাজনক। মাছের দেহে বিভিন্ন স্থানে মাংসপেশিতে বা দেহ গহ্বরে ইনজেকশন দিতে হয়। রুই, কাতলা মাছের ক্ষেত্রে বক্ষ পাখনার গোড়ার নিচের দিকে নরম স্থানে ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশন দেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে সুচ দ্বারা মাছের শরীরের ভিতরের অঙ্গপ্রতঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। ব্রুড মাছকে আলতো করে ধরে ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে স্পঞ্জের প্যাডে রেখে সাবধানে ইনজেকশন দেওয়া হয়। অনেকে মাছ পানির মধ্যে রেখেই ইনজেকশন দিয়ে থাকেন।

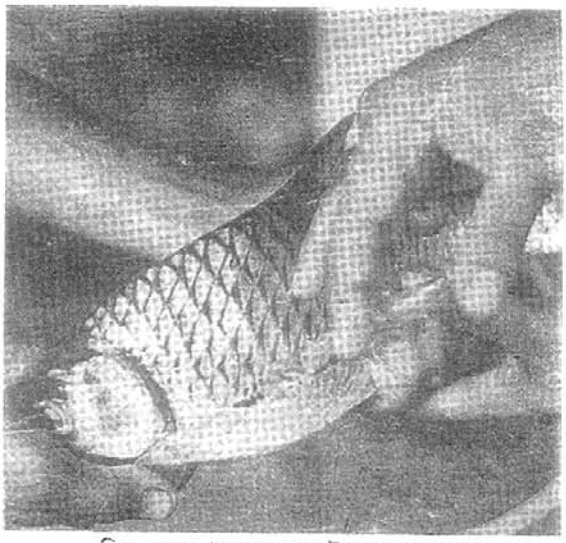

চিত্র ব্রুড মাছকে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

৮. ইনজেকশনের সময়

ইনজেকশন দেওয়ার সময় এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে প্রজনন পরিচালনাকারীর সুবিধা হয়। সাধারণত সকাল ৯টার মধ্যে জাল টেনে মাছ বাছাই করে হ্যাচারির চৌবাচ্চায় বিশ্রামের জন্য রেখে দিতে হবে। ৬-৭ ঘণ্টা হ্যাচারির পানিতে অভ্যস্তকরণের পর বিকেল ৪টার দিকে প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হয়। সাধারণত স্ত্রী মাছকে ২টি ইনজেকশন এবং পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের ২য় ইনজেকশনের সময় একটি মাত্র ইনজেকশন দেওয়া হয়। স্ত্রী মাছকে প্রথম ইনজেকশন দেওয়ার ৬ ঘণ্টা পর অর্থাৎ রাত ১০টার দিকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেওয়া হয়। এসময় পুরুষ মাছকে একমাত্র ইনজেকশনটি দেওয়া হয়।

৯. প্রজনন পদ্ধতি

হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয়ের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং ডিম ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ হ্যাচারির চৌবাচ্চায় সহজেই ডিম ছেড়ে দেয়। আবার বিদেশি কার্প যেমন : সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প এরা সহজে ডিম ছাড়েনা। তাই এরা ২য় ইনজেকশনের পর যখন ডিম ছাড়ার উপযুক্ত হয় তখন এসব ব্রুড মাছের পেটে সামান্য চাপ প্রয়োগ করলে ডিম ও শুক্রাণু বেরিয়ে আসে। তাই এদের প্রজনন আচরণ অনুসারে হ্যাচারিতে দুইটি পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটানো হয় যথা :

i) সহজাত প্রক্রিয়া

ii) চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া

i) সহজাত প্রক্রিয়া :

স্ত্রী ব্রুড মাছকে ২য় ইনজেকশন এবং পুরুষ মাছকে ১ম ইনজেকশন দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে একত্রে প্রজনন হাপায় রাখা হয়। বড় হ্যাচারিতে সার্কুলার ট্যাংকে অনেকগুলো ব্রুড মাছ একত্রে রাখা হয়। প্রতিটি স্ত্রী মাছের জন্য ২টি করে পুরুষ মাছ রাখা হয়। এভাবে রাখার পর তাদের প্রজনন উপযোগী পরিবেশ যেমন পানির প্রবাহ সৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (২৫°সে.- ৩১.৫° সে.) পর্যাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেনসমৃদ্ধ পরিষ্কার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। পরিপক্ব ব্রুড মাছ এবং উপযুক্ত পরিবেশ হলে এ প্রক্রিয়ায় প্রজনন ভালো হয় এবং ডিম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। স্ত্রী মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দিয়ে পুরুষ মাছের সাথে রাখার ৪-৮ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছ ডিম দিতে শুরু করে, স্ত্রী মাছ ডিম দেওয়ার সময় হলে পুরুষ মাছ তাদের তাড়া করে, এভাবে পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্ত্রী মাছের ডিম দেওয়ার সাথে সাথে পুরুষ মাছ ডিমের উপর শুক্রাণু ছাড়ে। ডিম ছাড়ার ঘণ্টাখানেক পরে ব্রুড মাছকে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রজননকৃত মাছকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা অ্যাক্রিফ্লাভিন ১-২মি.গ্রাম / লিটার দ্রবণে গোসল করিয়ে পৃথক পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিষিক্ত ডিম ফুলে সাগুদানার মতো দেখায়। এবার হাপা থেকে নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে ডিম ফুটানো জারে বা বোতলে দেওয়া হয়। সার্কুলার ট্যাংকে প্রজনন ঘটালে ব্রুড মাছ সরিয়ে ফেলার পর এখানেই ডিম ফুটানো হয়। এই ক্ষেত্রে ব্রিডিং ট্যাংকই ইনকুবেশন ট্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া : চাপ প্রয়োগ করে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে সব মাছ সহজাত প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে না বা প্রজনন করানো সম্ভব হয় না তাদের জন্য চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সিলভারকার্প, বিগহেডকার্প বা অনেক সময় রুই, কাতলা মাছকেও চাপ প্রয়োগ দ্বারা প্রজনন ঘটানো হয়। অনেক সময় পুরুষ ব্রুড কম থাকলেও চাপ প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ইনজেকশনের পর স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে আলাদা হাপা বা চৌবাচ্চায় রাখা হয়। অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানির প্রবাহ ও তাপমাত্রা ঠিক থাকলে ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছ ডিম দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। এজন্য ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে কিনা তা দ্বিতীয় ইনজেকশনের ৪ ঘণ্টা পর থেকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। স্ত্রী মাছ ২-৪টা ডিম দিলেই বুঝতে হবে যে, এখনই চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আলাদা করে মাছ ধরে প্লাস্টিকের শুকনা গামলা বা ট্রের উপর ধরে পেটে হালকা চাপ দিলে সহজেই ডিম বের হয়ে আসে। এমনভাবে চাপ দিতে হবে যাতে মাছ না মারা যায়। একই সময় দ্রুততার সাথে ইনজেকশন দেওয়া পুরুষ মাছকে ধরে পেটে চাপ দিলে শুক্র বের হয়ে আসবে। এই শুক্র সংগৃহীত ডিমের উপর নিতে হবে এবং পরিষ্কার পালক বা নরম তুলি দিয়ে শুক্র ডিমের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হয়। মিনিট খানেক মিশানোর পর ডিম পরিষ্কার পানিতে কয়েকবার ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়ার পর নিষিক্ত ডিম ঘণ্টাখানেক রেখে দেওয়া হয়, তখন ডিমগুলো পানির সংস্পর্শের ফলে প্রায় ৩০-৪০ গুণ পর্যন্ত বড় হয়ে যায়। এবার ডিমকে ডিম ফুটানোর জার বা বোতলে দিয়ে দেওয়া হয়।

ডিম ফুটানো

নিষিক্ত ডিম ঘণ্টাখানেক পানিতে ধোয়ার পর হ্যাচিং বোতল বা ইনকুবেশন ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হয়। এর আগে অবশ্যই হ্যাচিং বোতল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা মিথিলিন ব্লু দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। চার ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার দুই ফুট ব্যাসের প্রতিটি হ্যাচিং বোতল এক থেকে দেড় কেজি নিষিক্ত ডিম ফোটানো যায়। বোতলে ডিম দেওয়ার প্রথম ঘণ্টা দুয়েক একটু বেশি মাত্রায় পানির প্রবাহ দেওয়া হয়। এ সময় প্রতি মিনিটে ১২-১৫ লিটার পানি প্রবাহিত করা হয়। দ্রুত প্রবাহের ফলে যাবতীয় ময়লা পদার্থ ধুয়ে যায়। দুই ঘণ্টা পরে পানির প্রবাহ কমিয়ে দেওয়া হয় এবং মিনিটে ৮-১০ লিটার মাত্রায় রাখা হয়। ২৭° সে. ৩১° সে. তাপমাত্রায় ৭-৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিমের ভ্রূণ নড়াচড়া করতে দেখা যায় এবং ১২-১৬ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে রেণু বের হয়। এ সময়ে প্রতি মিনিটে ১২-১৫ লিটার পানি প্রবাহ ডিমের খোসা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় হ্যাচিং জারের মুখে লাগানো জাল মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দিতে হয়। কারণ স্রোতের ফলে ডিমের খোসা সব জালে আটকে থাকে। ডিম ফোটা শেষ হলে পানির প্রবাহ আবার কমিয়ে ৭-৮ লিটার প্রতি মিনিটে করা হয়। ডিম ফুটানোর পর রেণু আরও ২০-৩০ ঘণ্টা বোতলে রাখা হয়।

চাইনিজ কার্পের প্রণোদিত প্রজনন

সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও বিগহেড কার্পকে চাইনিজ কার্প বলা হয়। আমাদের দেশি অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের মতো চাইনিজ কার্পও পুকুরে ডিম দেয়না। তাই হ্যাচারিতে এদের প্রণোদিত প্রজনন করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাইনিজ কার্প-এর প্রণোদিত প্রজনন করা যায়। সিলভার কার্প বিগহেড কার্প ও গ্রাস কার্প-এর প্রণোদিত প্রজননের উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহ :

i) প্রাকৃতিক উৎস থেকে অর্থাৎ নদ-নদী বা প্লাবন ভূমি প্রভৃতি থেকে বন্য জাতের রুই জাতীয় মাছ সংগ্রহ করা হয়।

ii) হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করে।

iii) ব্রুড ব্যাংক হতে ব্রুড সংগ্রহ করে।

iv) এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড আদান-প্রদান অর্থাৎ ব্রুড বিনিময় করে।

২। ব্রুড মাছ পালন :

i) ব্রুড মাছ মজুদের পূর্বেই মজুদ পুকুরটি শুকিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করে অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে। শতাংশপ্রতি ১-১.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর, টি এস পি ২০০ গ্রাম ও ইউরিয়া ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে ব্রুড মাছ মজুদ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ii) মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হলে ভালো হয়। মজুদকালে পুকুরের তিনটি স্তরের মাছই মজুদ করলে খাদ্যের অপচয় হয় না। সুযোগ থাকলে প্রজাতি অনুযায়ী বা পুরুষ ও স্ত্রী মাছ আলাদা পুকুরে পালন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

iii) প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছের দেহ ওজনের ৩%-৫% হারে ২০%-২৫% আমিষ যুক্ত উন্নত মানের খাদ্য দৈনিক ২ বার প্রয়োগ করতে হবে। গ্রাস কার্পের জন্য নরম ঘাস, ক্ষুদিপানা, তরিতরকারির বর্জ্যপাতা কুচিকুচি করে কেটে মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ২০-২৫ ভাগ দৈনিক পুকুরে দেওয়া আবশ্যক।

iv) ব্রুড মাছের রোগ-বালাই যাতে না হয় সে জন্য মাঝে মাঝে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। ব্রুড বাছাইকরন :

যথেষ্ট সংখ্যক ব্রুড থেকে প্রজননের জন্য ব্রুড বাছাই করতে হবে। সাধারণত সিলভার ও বিগহেড কার্পের জন্য দুই বছরের বেশি বয়সের এবং দুই কেজির উপর ওজন এমন ব্রুড প্রণোদিত প্রজননের জন্য উত্তম। তবে গ্রাস কার্প তিন কেজি বা তার চেয়ে বেশি হলে ভালো। সকালের দিকে ব্রুড পুকুরে জাল টেনে একটা একটা করে মাছ হাতে ধরে বাছাই করা হয়। সব মাছ একত্রে পরিপক্ব হয় না তাই অধিকতর উপযুক্ত ব্রুডগুলোকে আগে প্রজননের জন্য বাছাই করা হয়। স্ত্রী মাছের পেট স্ফীত ও নরম হয়, পায়ুপথ কিছুটা উদগত ও স্ফীত। পুরুষ মাছের পেট চিকন। পেটে হালকা চাপ দিলে মিল্ট বের হয়ে আসে। গ্রাস কার্প মাছের পেটে পর্যাপ্ত ঘাস থাকে তাই এদের স্ত্রী মাছের পরিপক্বতা নির্ণয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সিলভার ও বিগহেড কার্প নরম প্রকৃতির মাছ। তাই জালের ঘষা লেগে যাতে মাছ আহত না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার।

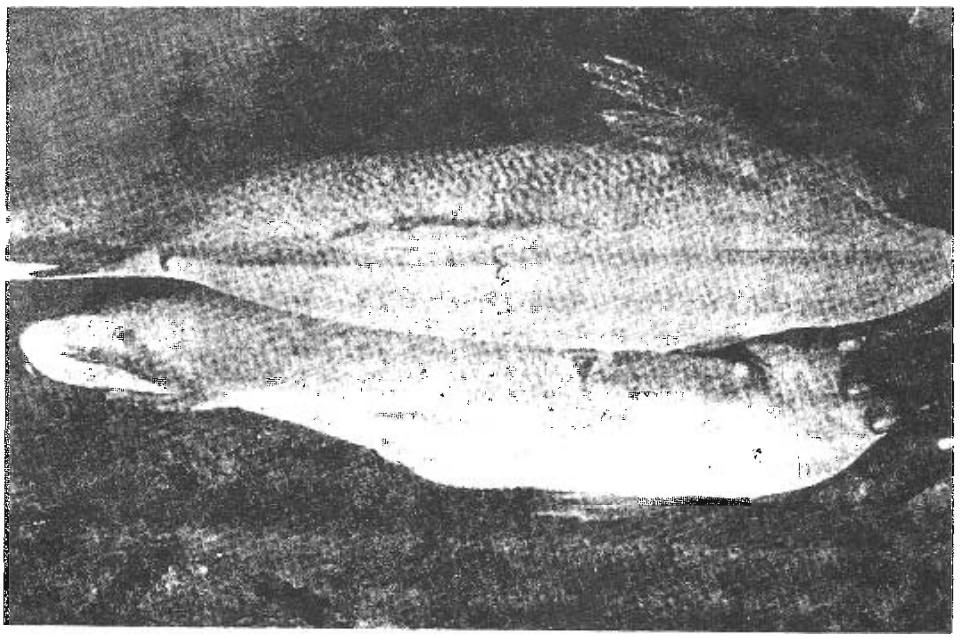

চিত্র : স্ত্রী ও পুরুষ সিলভার কার্পের ব্রুড

৪। হরমোন প্রয়োগ :

চাইনিজ কার্প মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোন হিসেবে পিজি ও এইচসিজি দুটোই ব্যবহার করা যায়। তবে কেউ কেউ শুধুমাত্র এইচসিজি দিয়েই প্রজনন করান আবার কেউ কেউ পিজি ও এইচসিজি একত্রে প্রয়োগ করেন। পিজি ব্রুড মাছের শরীরের ওজন অনুপাতে মি. গ্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে এইচসিজি ব্রুড মাছের শরীরের ওজন অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট (International Unit বা I.U) মাত্রায় ব্যবহার করা হয়।

৫। হরমোন মাত্রা :

চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছে পিজি ও এইচসিজি উভয় প্রকার হরমোনই ব্যবহার করা হয়। মাছের প্রজনন অঙ্গের পরিপক্বতা ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে হরমোন মাত্রায় কম বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া একজন অভিজ্ঞ মৎস্য প্রজননকারী তার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ অনুসারে হরমোনের মাত্রার কার্যকরী ডোজ ঠিক করে নিতে পারেন।

পরবর্তী ছকে চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছের প্রজাতি অনুযায়ী হরমোনের মাত্রা দেওয়া হলো :

প্রজাতি	১ম ইনজেকশন প্রতি কেজি	ব্যবধান ঘণ্টা	২য় ইনজেকশন প্রতি কেজি	মন্তব্য
সিলভার কার্প	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	৯-১২	৮০০-১২০০ আই ইউ এইচ সিজি	২য় ইনজেকশনের ৭-৮ ঘণ্টা পর ওভুলেশন
	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	৮	৩০০-৪০০ আই ইউ এইচ সিজি	ঐ
	২.২ মিলি গ্রাম পিজি	৬	৪.৮ মি.গ্রা. পিজি	ঐ
গ্রাস কার্প	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	১২	১৪৫০ আই ইউ এইচ সিজি	২য় ইনজেকশন ৬ ঘণ্টা পর ২.৫ মি. গ্রা. পিজি ৪-৬ গন্টা পর ওভুলেশন
	১.৫-২.০ মি. গ্রাম পিজি	৬	৪.৫ মি.গ্রা. পিজি	২য় ইনজেকশন ৬ ঘণ্টা পর ওভুলেশন
বিগহেড কার্প	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	৯-১২	৪০০ আই ইউ এইচ সিজি + ২ মি.গ্রা. পিজি	ঐ
	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	১২	১৪০০ আই ইউ এইচ সিজি	ঐ

২০২০

৬। দ্রবণ তৈরি :

প্রজননের জন্য বাছাই করা মাছের স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রজাতি অনুসারে সংখ্যা ও ওজন একটা খাতায় লিখে রাখতে হবে। এবারে ওজন অনুযায়ী পিজি ও এইচসিজি দ্রবণ তৈরি করে নিতে হবে। পিজি দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এইচসিজি পাউডার আকারে কাচের ভায়ালে বা কাগজের প্যাকেটে প্যাক করা থাকে এবং হরমোনের পরিমাণ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে লেখা থাকে। এইচসিজি পাউডার ডিস্টিলড ওয়াটারে দ্রবীভূত করে সেন্ট্রিফিউজে থিতিয়ে নেয়া হয়। থিতানো দ্রবণ ইনজেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭। ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি :

চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছকে মাংসপেশির ভিতর ইনজেকশন দেওয়া হয়। সূক্ষ্ম সুচ ব্যবহার করে পৃষ্ঠ পাখনার নিচে মাংসপেশিতে বা লেজে ইনজেকশন দেওয়া হয়। হরমোন দ্রবণ এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে প্রতি কেজি মাছের দেহে ০.২ থেকে০.৩ মি.লি. এর বেশি দ্রবণ প্রবেশ না করে। অনেক সময় ইনজেকশন দেওয়ার আগে মাছকে অবচেতন করে নেয়া হয়। অবচেতন করার জন্য এমএস ২২২ বা কুইনালডিন ব্যবহার করা হয়। ব্রুড মাছ বাছাইয়ের পর হ্যাচারির পানিতে ৬-৭ ঘণ্টা খাপ খাওয়ানোর পর প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই কার্যক্রম এমনভাবে শুরু করা হয় যাতে সকালে ঠাণ্ডার মধ্যে জাল টানার কাজ হয়ে যায়। মাছের বিশ্রামের পর ইনজেকশনের সময় এমন ভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে গভীর রাতে কষ্ট করে জাগতে না হয়। ইনজেকশন দেওয়ার সময় হ্যাচারিতে অন্তত তিনজন কর্মীর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

৮। প্রজনন পদ্ধতি :

চাইনিজকার্প সহজাত পদ্ধতিতে প্রজনন করে না এজন্য সর্বদা এদের পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে পৃথক পৃথক চৌবাচ্চায় রাখা হয়। সর্বশেষে ইনজেকশন দেওয়ার পর ৬-৭ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছের দুই একটা ডিম বেরুতে শুরু করে। ডিম বেরুতে থাকলেই বুঝাতে হবে ওভুলেশন এর সময় হয়েছে। ওভুলেশন হচ্ছে স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয়ের ডিমগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হওয়া এবং ডিমগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে মাছের জননেন্দ্রিয় দিয়ে সামান্য চাপে বের হয়ে আসার অবস্থা। ঠিকমতো ওভুলেশন হলে স্ত্রী মাছকে সাবধানে ধরে প্লাস্টিকের গামলায় স্ট্রিপিং করে ডিম সংগ্রহ করা হয়। একইভাবে পুরুষ মাছকে ধরে পেটে চাপ দিয়ে সংগৃহীত ডিমের উপর শুক্র মিল্ট সংগ্রহ করা হয়। পাখির পালক দিয়ে ডিমের সাথে শুক্র ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এবারে অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে ডিম নাড়াচাড়া করে ডিম ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে ৩-৪ বার ধুয়ে ফেলার ফলে অতিরিক্ত শুক্রাণু পানির সাথে চলে যায়। এভাবে ধুয়ে ফেলার পর আধা ঘণ্টা পর্যন্ত ডিমগুলো পরিষ্কার পানির মধ্যে রেখে দিতে হয়। স্ট্রিপিং করার সময় মাছ ধরা ও আনার কাজের জন্য অন্তত তিন জন কর্মী থাকা দরকার। অনেকে স্ট্রিপং করার সময় মাছকে অবচেতন করে থাকে। স্ট্রিপিং পদ্ধতিতে ডিম বেশি পাওয়া যায় এবং ভালো ভাবে নিষিক্ত হয় ফলে রেণু বেশি উৎপন্ন হয়। ২-৩ বছর বয়সের ২-৫ কেজি ওজনের সিলভার কার্পের স্ত্রী ব্রুড থেকে গড়ে প্রতি কেজি দেহ ওজনের ১৫০০০০-৩০০০০০টি ডিম পাওয়া যায়। ২-৩

বছরের ৩-৭ কেজি ওজনের বিগহেড কাপের স্ত্রী ব্রুড থেকে প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ১০০০০০ - ১২৫০০০ টি ডিম পাওয়া যায়। ২-৩ বছরের ১.৫-৪ কেজি ওজনের গ্রাস কার্প থেকে প্রতি কেজি দেহ ওজনে ৪৫০০০ - ১১৫০০০টি ডিম পাওয়া যায়।

৯। ডিম ফুটানো :

নিষিক্ত ডিম পানিতে ভিজে ফুলে বড় বড় হয়ে যায়। এবারে নিষিক্ত ডিমকে ১-১.৫ কেজি হারে প্রতিটি হ্যাচিং জারে স্থানান্তর করা হয়। প্রথম ঘণ্টা দুয়েক পানিপ্রবাহের মাত্রা প্রবাহপ্রতি মিনিটে ১১-১৫ লিটার রাখা হয়। এরপর ৮-১০ ঘণ্টা সময় হ্যাচিং জারে পানির প্রবাহ একটু কমিয়ে দিতে হবে। এ সময়ে ডিমের মধ্যে ভ্রূণ ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে এবং ডিমের মধ্যে মোচড় দিয়ে নড়াচড়া করে। ভ্রূণের বৃদ্ধি লাভ পানির তাপমাত্রার সাথে কম-বেশি হয়। সাধারণত ২৭° সে. - ৩০° সে. তাপমাত্রায় নিষিক্ত হওয়ার ১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে রেণু বের হয়। রেণু ফুটে বের হলে আবার পানির প্রবাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে ডিমের খোসা ও অনান্য দূষিত পদার্থ সহজে ধুয়ে যেতে পারে। সব ডিম ফুটে গেলে এবং যাবতীয় ময়লা ও ডিমের খোসা পরিষ্কার হয়ে গেলে পানি-প্রবাহের মাত্রা কমিয়ে মিনিটে ৭-৮ লিটার করা হয়। এ ভাবে আরও ২০-৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত রেণু কে হ্যাচিং জারে রেখে দেওয়া হয়।

কমন কার্প মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

কমন কার্প চাষযোগ্য মাছের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল। আমাদের দেশে আবহাওয়ায় কমন কার্প এক বছরের মধ্যে প্রজনন পরিপক্বতা লাভ করে। এরা ৪-৫ বছর সময়ের মধ্যে ১৩-১৪ কেজি ওজনের থেকে পারে। এরা বছরে ২ বার প্রজনন করে। ১ম বার ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এবং ২য় বার জুলাই থেকে আগস্ট মাস। আমাদের দেশে এই মাছের কয়েকটি জাত আছে তার মধ্যে স্কেল কার্প, মিরর কার্প ও লেদার কার্প উল্লেখ যোগ্য। বাণিজ্যিকভাবে কমন কার্প প্রজননের জন্য প্রণোদিত প্রজনন প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয়।

কমন কার্প মাছের প্রণোদিত প্রজননের ধাপ সমূহ নিম্নরূপঃ

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহ :

ক. প্রাকৃতিক উৎস থেকে অর্থাৎ নদ-নদী বা প্লাবন ভূমি প্রভৃতি থেকে বন্য জাতের মাছ সংগ্রহ করা হয়।

খ. হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করা।

গ. ব্রুড ব্যাংক থেকে রুই জাতীয় ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা।

ঘ. এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড আদান প্রদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২। ব্রুড মাছ পালন :

ক. বাছাইকৃত ব্রুড ভালো পরিবেশে উৎপাদনশীল পুকুরে ২/৩ বছর যত্ন সহকারে পালন করতে হবে।

খ. প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির থেকে ২০-২৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

গ. মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে এক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হলে ভালো।

ঘ. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

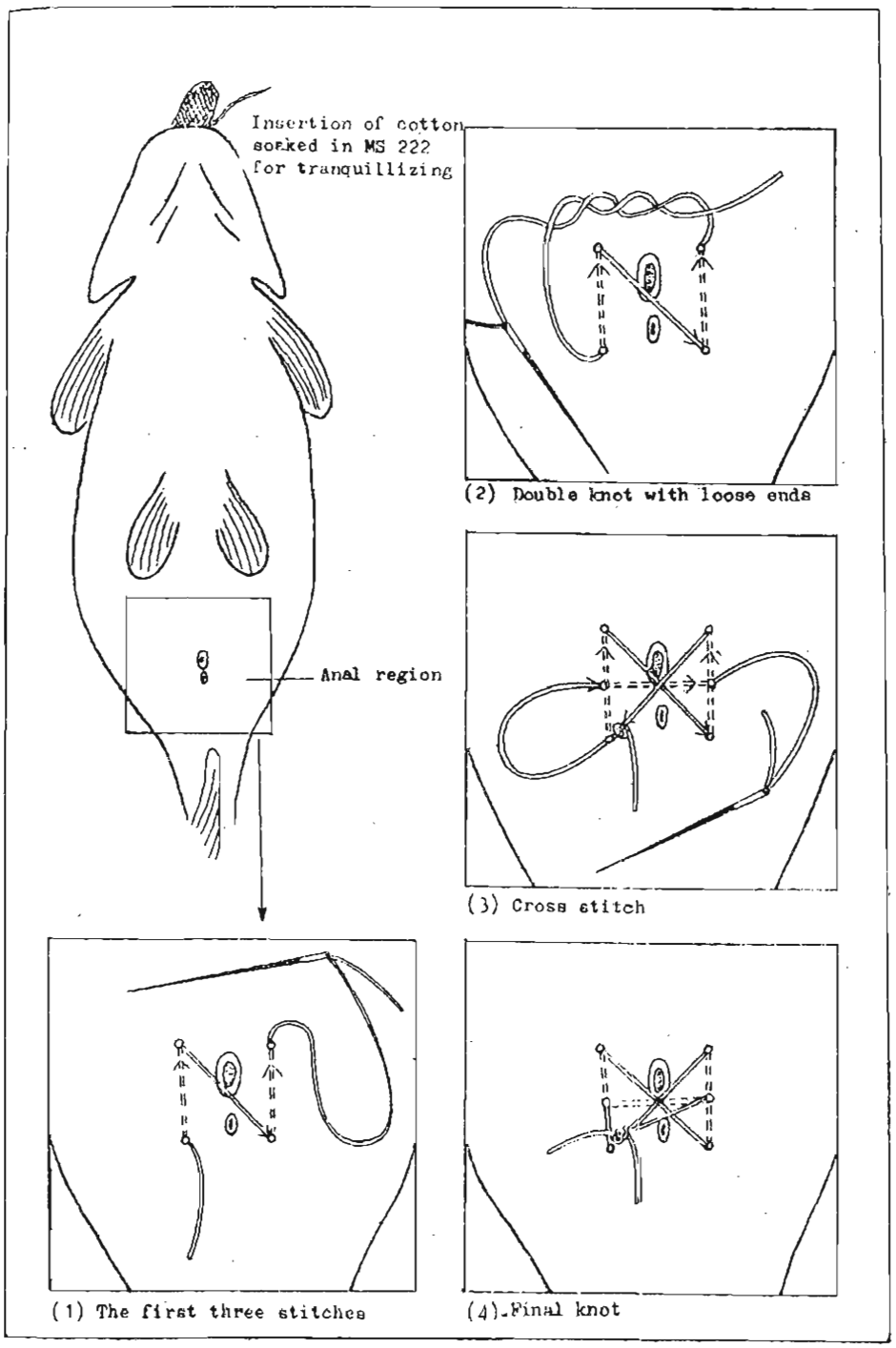

চিত্র ঃ কমন কার্পের পেট সেলাই করার কৌশল

কমন কার্পের প্রণোদিত প্রজনন :

পিটুইটারি গ্লান্ড ইনজেকশনের মাধ্যমে কমন কার্পের প্রণোদিত প্রজনন সম্পন্ন করা হয়। বাছাই করা ব্রুড মাছকে ৩-৪ মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনের জন্য পিজি ইনজেকশন করে পেট সেলাই করে দেওয়া হয়। পেট সেলাই করার জন্য মোম লাগানো সুতা ব্যবহার সুবিধাজনক। পেট সেলাই দেওয়ার সুবিধা হলো পরিপূর্ণ ওভুলেশন না হওয়া পর্যন্ত ডিম বের হওয়া বন্ধ থাকে। কমন কার্পের ইনজেকশন ও পেট সেলাই করার আগে মাছকে অবচেতন করে নেয়া হয়। এজন্য এম এস ২২২ ঔষধ ০.৫ গ্রাম প্রতি ৫০ মি.লি. পানিতে গুলিয়ে একটি তুলার সাহায্যে মাছের মুখে দেওয়া হয়। একই সাথে পুরুষ মাছকে ২ মি.লি. গ্রাম/কেজি হিসেবে পিজি দ্রবণের ইনজেকশন দিয়ে পৃথক চৌবাচ্চায় রাখা হয়। ২৭-২৮° সে. তাপমাত্রায় ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে ওভুলেশন সম্পন্ন হয়। স্ট্রিপিং প্রক্রিয়ায় কমন কার্পের প্রজনন ঘটানো হয়। ইনজেকশন দেওয়ার ৬-৮ ঘণ্টার পর স্ত্রী মাছকে সাবধানে ধরে পেটের সেলাই কেটে দিতে হয়। শুকনা প্লাস্টিকের গামলায় চাপ প্রয়োগ করে ডিম বের করা হয়। সাথে সাথে পুরুষ মাছ সংগ্রহ করে ঐ ডিমের উপর শুক্র বা মিল্ট সংগ্রহ করা হয়। পরিষ্কার পাখির পালক দ্বারা ডিম ও শুক্রাণুকে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। অন্যন্যা কার্প জাতীয় মাছের ডিম থেকে কমন কার্প মাছের ডিমের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের ডিম আঠালো প্রকৃতির। তাই এদের ডিম একটার গায় একটা লেগে যায় বা অন্য কোনো বস্তুর গায়ে লেগে যায় বলে আলাদাভাবে যত্ন নেওয়া অবশ্যক। ডিমের এই আঠালো বৈশিষ্ট্যের দরুন স্ট্রিপিং-এর পর সংগৃহীত ডিমকে ইউরিয়া ও লবণ পানি দ্রবণে ধৌত করতে হয়।

আঠালো ডিমের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া (যেমন-মিরর/কমন কার্পের ক্ষেত্রে) :

১. হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর স্ত্রী মাছকে ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে রাখতে হবে।

২. পুরুষ মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর পৃথক ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে স্ত্রী মাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে হবে।

৩. ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪০ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ তৈরি করে রাখতে হবে।

৪. ডিম পাড়ার সঠিক সময়ে পুরুষ মাছ ধরে পেটে চাপ দিয়ে বীর্য পূর্বে সংগৃহীত ডিমের উপর ফেলে একটি পাখির পালক দিয়ে বীর্যকে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে ডিমকে নিষিক্ত করতে হবে। কিছু দ্রবণ ডিমের মধ্যে দিতে হবে এবং নাড়াতে হবে। এইভাবে ৫ মিনিট অন্তর অন্তর দ্রবণ ডিমের মধ্যে দিতে হবে এবং নাড়তে হবে। এই প্রক্রিয়া ৩০-৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৫. এই প্রক্রিয়ার ফলে ডিমের গায়ের প্রোটিন দূর হবে এবং ডিম নরম হয়ে যাবে। এরপর ডিমগুলোকে ননীযুক্ত দুধ দিয়ে ২৫-৩০ মিনিট নাড়ার পর ডিম শক্ত ভাব ধারণ করবে।

৬. এই ডিমকে তখন পরিমাপ করে হ্যাচিং জার অথবা ইনকুবেশন ট্যাংকে পানির স্রোত ও ফোয়ারার মধ্যে স্ফুটনের জন্য রাখতে হবে।

৭. জার অথবা পুলে ডিম দেওয়ার পর ডিমগুলো জার বা পুলের গায়ে আটকে যেতে থাকলে পাখির পালক বাঁধা একটি কাঠি দিয়ে ডিমগুলোকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

ডিম ফোটানো :

উপযুক্ত ব্রুড মাছ থেকে প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ১০০০০০-২০০০০০ টি ডিম পাওয়া যায়। নিষিক্ত ডিমের আঠালো ভাব দূর করার পর এদেরকে হ্যাচিং জার বা হ্যাচিং বোতলে দেওয়া হয়। অবশ্য ডিমের পরিমাণ বেশি হলে সার্কুলার ট্যাংক ইনকুবেশন ট্যাংক ও ব্যবহার করা যায়। প্রতিটি বোতলে ১-১.৫ কেজি পানিতে ফোলা ডিম ফুটানো যায়। কমন কার্পের ডিম ফুটতে বেশি সময় নেয়। যেখানে অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের ডিম ফুটতে ১৬-২২ ঘণ্টা সময় লাগে সেখানে কমন কার্পের ডিম ফুটে বাচ্চা বের থেকে ৬০-৭২ ঘণ্টা সময় লাগে।

মিরর কার্প বা কার্পিও মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন :

রুই জাতীয় কার্প মাছ বদ্ধ জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে না। এসব মাছের প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য মৃদু স্রোত প্রয়োজন বদ্ধ জলাশয়ে সে পরিবেশ না থাকায় বদ্ধ জলাশয়ে প্রজনন করে না। কিন্তু কমন বা মিরর কার্পের ব্যাতিক্রম। এরা বদ্ধ জলাশয়ে যেমন- পুকুর, দীঘি, ডোবা, বিল, বাঁওড়ে সামান্য কিছু জলজ আগাছায় প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে। কমন কার্পে এ প্রজনন স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে সামান্য কিছু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা বদ্ধ জলাশয়ে এবং ধানক্ষেতের গর্তে রেণু উৎপাদন করতে পারি। বোরো মৌসুমে ধান ক্ষেতে সাধারণত পানির পরিমাণ কম থাকে। ফলে আঙ্গুলী পোনা ছেড়ে বড় আকারের মাছ উৎপাদনের চেয়ে কমন কার্পের রেণু ছেড়ে আঙ্গুলী পোনা উৎপাদন অনেক সহজ।

মাছের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য :

১. বিদেশি মাছ।
২. পুকুরেই ডিম দেয়।
৩. ভালো খাদ্য পেলে বছরে ১-৩ কেজি ওজন হয়।
৪. পানির নিচের স্তরে বাস করে।
৫. রুই কাতলা মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা যায়।
৬. গলদা চিংড়ির সাথে মিশ্র চাষ করা যায় না।

মিরর কার্প ও কার্পিও বা কমন কার্প মাছের পার্থক্যকরণ বৈশিষ্ট্য :

১। মিরর কার্প :

ক. দেহ ঈষৎ হলদে থেকে সবুজাভ
খ. শরীরে পার্শ্ব রেখা এবং পৃষ্ট পাখনার দিকে অল্প দুই একটা আঁইশ থাকে।
গ. সাধারণত কার্পিয় মাছের চেয়ে দেহের বৃদ্ধি বেশি হয়।

২। কার্পিও বা কমন কার্প মাছ :

ক. এদের দেহ সোনালি, হলদে বা লালচে রঙের হয়।

খ. সমস্ত শরীর আঁইশ দিয়ে আবৃত্ত।

গ. মিরর কার্পের চেয়ে কিছুটা কম গতিতে বাড়ে।

স্বভাব ও খাদ্য

১. পুকুরের তলায় ও পাড়ের দিকে বিচরণ করে।

২. অনেক সময় পুকুরের পাড় ভেঙে ফেলে।

৩. পুকুরের তলায় কীটপতঙ্গ খেতে পছন্দ করে তবে সম্পূরক খাদ্যও খায়।

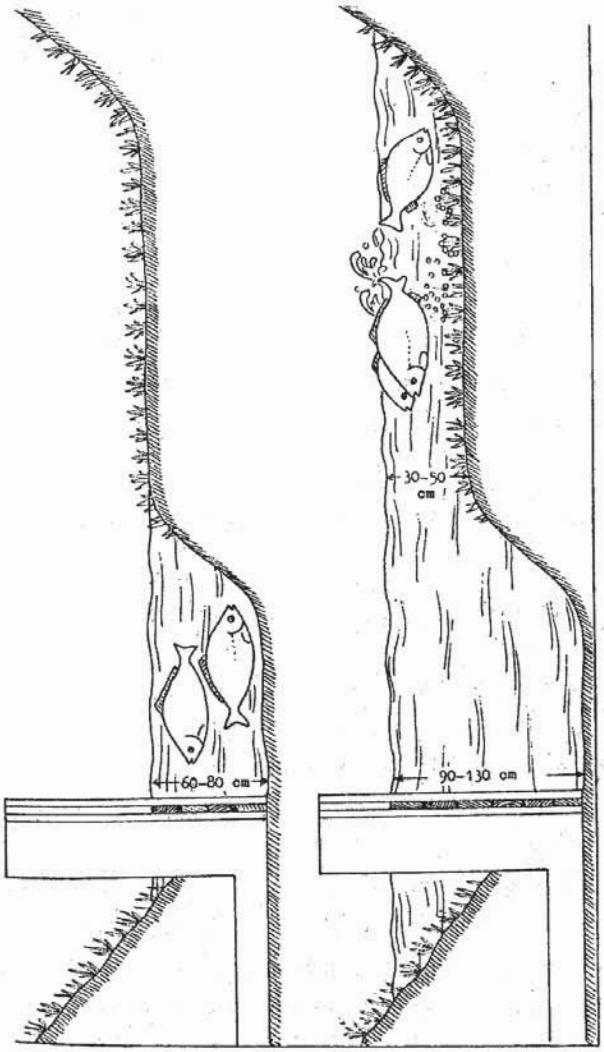

চিত্র : কমনকার্প মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন

প্রাকৃতিক প্রজনন

প্রজনন ঋতু : মূলত দুটি মৌসুমে প্রজনন করে

শীতকালীন প্রজনন : অগ্রহায়ণ, (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি) থেকে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ।

বর্ষাকালীন প্রজনন : জৈষ্ঠের (জুন) মাঝামাঝি থেকে আষাঢ় (জুলাই) পর্যন্ত ।

প্রজনন সময় : অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমার মধ্যে অথবা অমাবস্যা পূর্ণিমার কাছাকাছি সময় ।

প্রজনন স্থান : পুকুর পাড়ের কাছাকাছি জলজ আগাছা, যেমন : কচুরিপানা, টোপাপোনা ইত্যাদির শিকড়ের মধ্যে ।

প্রজনন কৌশল

১ । প্রজননক্ষম ব্রুড মাছ বাছাই করার উপায় ।

পুরুষ মাছ :

১. পার্শ পাখনার ভিতর দিকে খসখসে হবে ।

২. পেটে চাপ দিলে সাদা দুধের মতো মিল্ট বেরিয়ে আসবে ।

৩. দেখতে উজ্জ্বল এবং মোটাসোটা হবে ।

স্ত্রী মাছ :

১. পেট বেশ ফোলা ফোলা দেখাবে ।

২. নাভীর রং লাল দেখাবে এবং বাইরের দিকে কিছুটা বেরিয়ে থাকে ।

৩. পেটে চাপ দিলে ডিম বেরিয়ে আসে ।

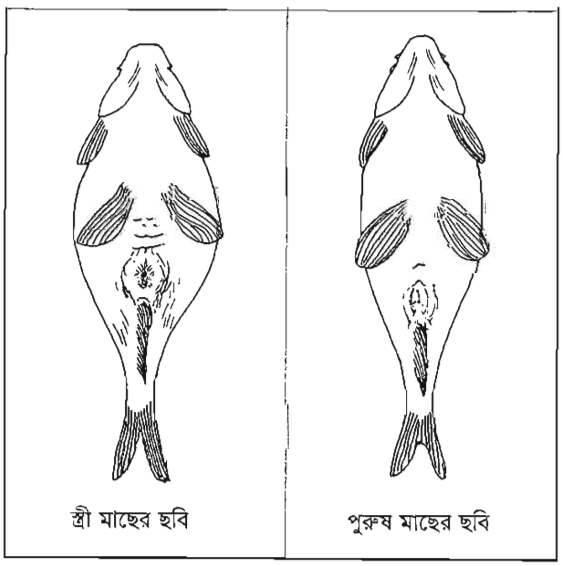

স্ত্রী মাছের ছবি | পুরুষ মাছের ছবি

২। বাসা তৈরি :

প্রজনন ঋতুতে পুকুরের অগভীর অংশে একটি খাচাঁর মতো করতে হবে। ৫ ফুট লম্বা ৪টি বাঁশের চটা দিয়ে চৌকোনাকার একটি ভাসমান কাঠামো করতে হবে। কাঠামোটি একটি খুঁটি দিয়ে নিরিবিলি জায়গায় ভাসমান অবস্থায় স্থাপন করতে হবে। কাঠামোর মধ্যে কচুরিপানা দেওয়ার সময় ঐগুলো থেকে পচা পাতা, পচা শিকড় পরিষ্কার করে দিতে হবে। কচুরিপানাগুলোকে ১০ লিটার পানিতে ২০০-৩০০ গ্রাম লবণ অথবা ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে নিলে ভালো হয়। পুকুরের সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

চিত্র ঃ ধান ক্ষেতের গর্তে ডিমসহ কচুরিপানা স্থাপন

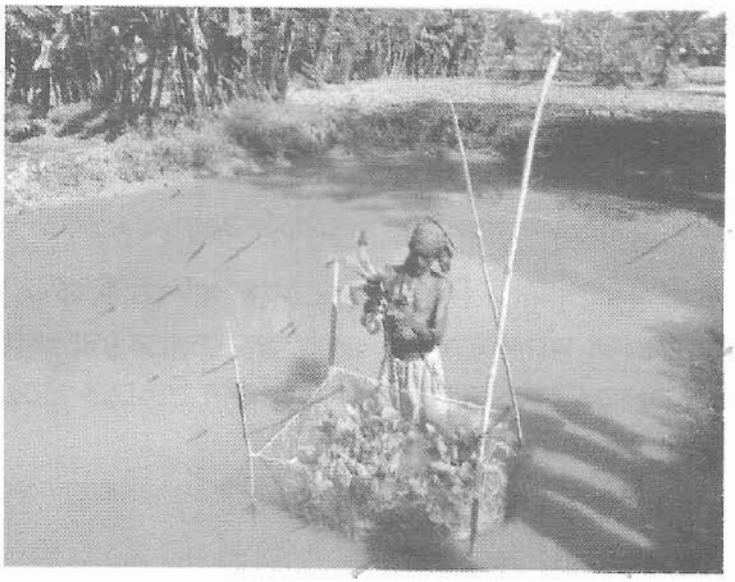

৩। মিলন :

ডিম দেওয়ার চূড়ান্ত সময় হলেই স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলো ঐ বাসার নিচে যেয়ে অবসরে মিলিত হবে।

৪। পর্যবেক্ষণ :

যদি দেখা যায় পানাগুলো নড়াচড়া করছে এবং ওলটপালট হয়েছে। তবেই বুঝতে হবে মাছের প্রজনন শুরু হয়েছে। এভাবে প্রজনন সারাদিন রাত চলতে পারে। এ অবস্থায় মাছকে কোনো অবস্থাতেই বিরক্ত করা যাবে না।

চিত্র : কচুরিপানায় লেগে থাকা কমন কার্পের ডিম

৫। হাপা স্থাপন :

ডিম দেওয়া শেষ হলে, কচুরিপানার বাসার কাছাকাছি জায়গায় একটি ঘন/চট জালের হাপা টানাতে হবে।

৬। পানা স্থানান্তর :

ডিমসহ কচুরিপানা হাপাতে রাখতে হবে। পানাগুলো হাপাতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোকামাকড় না থাকে এবং হাপা যেন কাঁকড়ায় কেটে না ফেলে। ১০ লিটার পানিতে ৫ মি. গ্রাম

ম্যালাকাইট গ্রীন মিশিয়ে, ডিমসহ কচুরিপানা ১-২ মিনিট ভিজিয়ে রেখে নিলে ভালো, তাতে রোগ জীবাণু মুক্ত থাকে।

৭। ডিম স্ফুটন :

ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে (শীতকালে) প্রায় তিন দিন সময় লাগে। এ অবস্থায় যেকোনো ধরনের পোকা যেন ডিমে না বসে সে জন্য নজর রাখতে হবে। হাপার পরিবর্তে গামলা বা ড্রামে ডিম ফুটালে প্রতি দিন পানি পরিবর্তন করতে হবে।

৮। কচুরিপানা সরানো

ডিম ফুটলে তারা কচুরিপানার শিকড় ছেড়ে দিয়ে পানিতে কিলবিল করে সাঁতার কাটবে। তখন দেখতে অনেকটা মশার বাচ্চার মতো দেখাবে। এ অবস্থায় সাবধানে কচুরিপানা তুলে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিকড়ের সাথে পোনা লেগে না থাকে।

৯। রেণুপোনাকে খাওয়ানো

ডিমপোনার পেটের কুসুম থলি শরীরের সাথে মিশে গেলে বাইরের খাবার খেতে পারে। তখন পোনার বয়স প্রায় ২ দিন হয়। মুরগি বা হাঁসের ডিম ভালোভাবে সিদ্ধ করে কুসুমটি একটি পাতলা কাপড়ে নিয়ে একটি বাটিতে পানি নিয়ে ভালোভাবে গুলতে হবে যাতে বড় কোনো দানা না থাকে। কুসুম গোলা পানি হাপার যেখানে রেণু দেখা যাবে, সেখানে ছিটিয়ে দিতে হবে। দৈনিক ৩-৪ বার খাবার দিতে হয়। ৩-৪ দিন পর এ পোনা পূর্বে প্রস্তুত আঁতুড় পুকুরে ছেড়ে অন্যান্য মাছের পোনার মতো লালন-পালন করা যাবে।

বিশেষ সতর্কতা

১। প্রতিদিন ভোরে অব্যশই পোনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

২। ভালো পোনা পাওয়ার জন্য নার্সারি পুকুর তৈরির নিয়ম ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে।

থাই কৈ মাছের জীবন বৃত্তান্ত

সাধারণ নাম : থাই কৈ

বৈজ্ঞানিক নাম : এনাবাস টেস্টোডাইনাস *(Anabas testudineus)*

দেহের বিবরণ : এ মাছের মাথা বড় ও প্রায় ক্রিকোনাকৃতি বর্ণ কালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। দেহ আঁইশ দিয়ে ঢাকা, দুটো চোয়ালেই দাঁত আছে। পিঠের পাখনাযুক্ত কাঁটাগুলো ধারালো। থাই কৈ মাছ কানকো দিয়ে মাটিতেও চলাচল করতে পারে। গায়ে কালো ফোঁটা থাকে।

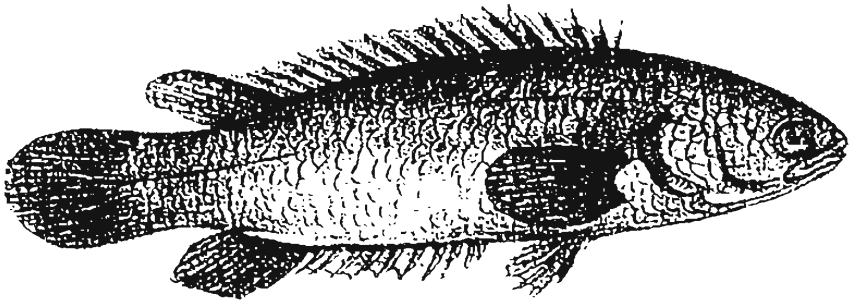

চিত্র : থাই কৈ মাছ

চাষের সুবিধাঃ

ক) মাছটি এ দেশের পরিবেশ সহনশীল।

খ) অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়।

গ) গভীর অগভীর ছোট-বড় সব ধরনের জলাতে চাষ করা যায়।

ঘ) অতিরিক্ত শ্বাস যন্ত্র থাকায় স্বল্প অক্সিজেনেও বেঁচে থাকতে পারে।

ঙ) মাছ ধরার পরে অনেক সময় বেঁচে থাকতে পারে বলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়।

চ) চাষের ৩-৪ মাসের মধ্যে বাজারজাত করা যায়।

ছ) রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছ অত্যন্ত সমাদৃত।

প্রাপ্তি স্থান : বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

বাস স্থান : পুকুর ডোবা নালা, নর্দমা, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি জলাশয়ে পানির মধ্যে ও নিচু স্তরে বাস করে।

রোগ বালাই : থাই কৈ মাছের দেহে ও লেজে বিভিন্ন ছত্রাক ও ক্ষত রোগের সৃষ্টি হয়। শীতকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করলে গরমে তেমন কোনো রোগ দেখা যায় না।

খাদ্য : ইহা ভাসমান পিলেট খাবার বেশি পছন্দ করে। তাবে ছোট অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও তাদের শূককীট, শৈবল এবং পুকুরের তলায় সঞ্চিত জৈব পদার্থ খায়।

প্রজনন : থাই কৈ মাছ এক বছরেই প্রজননক্ষম হয়। বর্ষাকাল এ মাছের প্রজনন সময়। এ মাছ ধানক্ষেত পুকুর, ডোবা নালা, খাল ও বিলে প্রজনন করে। কৃত্রিম উপায়েও মাছের সফল প্রজনন করানো সম্ভব হয়েছে। কৈ মাছের ডিমের পরিমাণ ৪,০০০ থেকে ১২০০০ হয়ে থাকে।

আহরণ প্রক্রিয়া : ফাঁস জাল, খেপলা জাল, ছিপ বঁড়শি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ যেমনঃ চারো, আরিন্দা প্রভৃতি দ্বারা থাই কৈ মাছ আহরণ করা যায়। তবে পুকুর শুকিয়ে আহরণ করাই উত্তম।

বাজারজাতকরণ : ১০ সে. মি. বড় হলেই কৈ মাছ জালের সাহায্যে অথবা সেচের মাধ্যমে ধরা যায়। এ মাছ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়।

থাই কৈ মাছের ব্রুড ব্যবস্থাপনা : বর্তমানে থাই কৈ মাছের ব্যাপক চাহিদার কারণে প্রথম দিকে বিদেশ থেকে উচ্চ মূল্যে পোনা আমদানি করা হলেও এখন দেশেই অনেকগুলো হ্যাচারিতে থাই কৈ মাছের পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। দ্রুত বর্ধনশীল ও ভালো গুণ সম্পন্ন পোনা পাওয়ার জন্য ব্রুড মাছের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা অবশ্যক।

ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার কৌশল :

১. মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা
২. মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
৩. মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১। মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা :

ক) থাই কৈ মাছের ব্রুড চাষের ক্ষেত্রে পুকুর নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহজে পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন করা যায় এবং তলদেশে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম এরূপ বেলে, বেলে-দোঁয়াশ মাটির পুকুর এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হয়। নিজস্ব উর্বরা শক্তি কম আছে এরূপ পুকুরের পানি দূষণ সমস্যা কম হয়ে থাকে। বিশেষ করে ধান ক্ষেতকে অগভীর জলাশয়ে রূপান্তর করে বর্তমানে যে মাছ চাষ করা হচ্ছে, সে ধরনের জলাশয় নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে পুকুরটিতে যাতায়াত ব্যবস্থা উত্তম হবে এবং পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো ও বাতাস প্রবাহের জন্য খোলামেলা স্থানে হতে হবে। মজুদ পুকুর ১০-২০ শতাংশ হলেই ভালো।

খ) সঠিকভাবে পুকুরের পাড় ও তলা ঠিক করতে হবে। ভারি বর্ষণ হলে যাতে কৈ মাছ বাইরে চলে যেতে না পারে সেজন্য পুকুরের চতুর্দিকে বাঁশের বানা চাটাই বা ঘন মেস সাইজের নাইলন সুতার জাল দিয়ে ২-৩ ফুট উঁচু করে ঘিরে দিতে হবে।

গ) সব ধরনের জলজ আগাছা দূর করতে হবে। পুকুরের পাড়ে বড় গাছ পালা থাকলে তার ডাল ছেঁটে দিতে হবে।

ঘ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। বিভিন্নভাবে এটা দূর করা গেলেও পুকুর শুকালেই ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঙ) চুন প্রয়োগ : পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশন করে মাটি ভিজা থাকা অবস্থায় চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রৌদ্রময় সময়ে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চ) সার প্রয়োগ : পুকুরের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য ও প্রাকৃতিক খাদ্যের জন্য চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সার	পরিমাণ/প্রতি শতাংশে
গোবর	৫-৭ কেজি
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম
টি.এস.পি	২০০ গ্রাম

২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা :

ক) ব্রুড মাছ সংগ্রহ : সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে অথবা ব্রুড ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

খ) শোধন করা : থাই কৈ মাছের ব্রুড বাহির থেকে সংগ্রহ করলে পুকুরে মজুদের আগে ১০০-১৫০ পি পি এম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা লবণ জলে গোসল দিয়ে মজুদ করতে হবে।

গ) মজুদ ঘনত্ব : সুষম পরিপক্ব ব্রুড পেতে হলে প্রতি শতাংশে ৪০-৫০টি থাই কৈ মাছ মজুদ করা যেতে পারে।

৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

ক) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ও সার প্রয়োগ :

যদিও থাই কৈ মাছ সাধারণত ভাসমান ও ডুবন্ত পিলেট খাদ্য পছন্দ করে তবুও খরচ কামানোর জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য নিম্নোক্ত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রতি শতাংশে ১.৫-২ কেজি গোবর ৪০-৫০ গ্রাম ইউরিয়া ২০-২৫ গ্রাম টিএসপি সার একত্রে গুলে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খ) সম্পূরক খাদ্য:

সাধারণত থাই কৈ মাছ চাষে ভাসমান ও ডুবন্ত পিলেট খাবার (৩০-৩৫% আমিষসমৃদ্ধ) প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ থাই কৈ মাছ এই ধরনের খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। পিলেট খাবার পানিতে সহজে গলে না খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং পানি সহজে নষ্ট হয় না। বাজারের পিলেট খাবারের পুষ্টিমান ঘোষণার সাথে সব সময় ঠিক থাকে না। মাছের বর্ধন ভালো পেতে খাদ্য উপকরণসমূহ বাজার থেকে কিনে নিজস্ব পিলেট মেশিন দ্বারা খাদ্য তৈরি করা সবচেয়ে নিরাপদ। এ ক্ষেত্রে থাই কৈ মাছের জন্য নিম্ন হারে খাদ্যের উপকরণ (Composition) মিশিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে :

১. ফিশমিল বা মৎস্য চূর্ণ ৫০%

২. সয়াবিন চূর্ণ-১০%

৩. সরিষার খৈল-১০%

৪. অটোকুঁড়া-২০%

৫. ভুট্টা চূর্ণ-০৯%
৬. ভিটামিন প্রিমিক্স-১%

মজুদকৃত ব্রুড মাছের দৈহিক ওজনের ৫-৬% হারে দিনে ২বার প্রয়োগ করতে হবে।

গ) পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ : যেহেতু থাই কৈ মাছ সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল, তাই অনেক সময় পুকুরের পানি দূষিত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পুকুরের ১৫-২০% পানি পরিবর্তন করে দিলে ভালো হয়।

ঘ) হররা টানা : সপ্তাহে একবার জাল বা হররা টেনে পুকুরের তলদেশের গ্যাস দূর করতে হবে।

ঙ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা : মাছ রোগাক্রান্ত হলে তা ডিমের পরিপক্বতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। তাই মাছ যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা উচিত পানি দূষিত হলে থাই কৈ মাছের দেহে ও বিভিন্ন ছত্রাক ও ক্ষত রোগের সৃষ্টি হয়। ছত্রাকজনিত রোগের জন্য ম্যালাকাইট গ্রীন ২ মিলি গ্রাম/লিটার/সপ্তাহে এভাবে সপ্তাহে একবার মোট তিন সপ্তাহ প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষত রোগের জন্য অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ১০০ মিলি গ্রাম/কেজি খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। তবে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়াই শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে পানি দূষিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। ব্রড ব্যবস্থাপনার সকল ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা সফলভাবে হ্যাচারি পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। কোনো কারণে ব্রুড ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি হলে হ্যাচারি পরিচালনা সম্পূর্ণ অলাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

থাই কৈ মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

থাই কৈ মাছের প্রণোদিত প্রজননের ধাপসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহ : সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে অথবা ব্রুড ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ব্রুড বিনিময়ের মাধ্যমেও ব্রুড সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ব্রড মাছ পালন :

বাছাইকৃত ব্রুড মাছকে ভালো পরিবেশে উৎপাদনশীল পুকুরে যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে পুকুরের আয়তন ২০ শতাংশে হলে ভালো হয়। সুষম ও পরিপক্ব ব্রুড পেতে হলে প্রতি শতাংশে ৪০-৪৫ টি থাই কৈ মজুদ করতে হয়। থাই কৈ মাছ সাধারণত ভাসমান ও ডুবন্ত পিলেট খাবার (৩০-৩৫% অমিষ সমৃদ্ধ) খেতে পছন্দ করে। থাই কৈ মাছের জন্য নিম্ন হারে খাদ্যের উপকরণ (Composition) মিশিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে।

১. ফিশমিল বা মৎস্য চূর্ণ-৫০%
২. সয়াবিন চূর্ণ-১০%

৩. সরিষার খৈল-১০%

৪. অটোকুঁড়া-২০%

৫. ভুট্টা চূর্ণ-০৯%

৬. ভিটামিন প্রিমিক্স-১%

মজুদকৃত ব্রুড মাছের দৈহিক ওজনের ৫-৬% হারে দিনে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রুড মাছ বাছাই: মাছ প্রজনেনর আগে সঠিক ভাবে ব্রুড বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
নিম্নে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের পার্থক্য দেওয়া হলো :

ক্র: নং	স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
১।	বক্ষ পাখনা তুলনামূলক ছোট এবং পাখনার সর্ব বাহিরের রশ্মি খুব মোটা নয়।	বক্ষ পাখনা তুলনামূলক লম্বা এবং সর্ব বাহিরের রশ্মি মোটা ও বড়।
২।	বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক মসৃন ও পিচ্ছিল হবে।	বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক খসখসে হবে।
৩।	পেট স্ফীত ও নরম হবে।	পেট চিকন হবে।
৪।	পায়ু ফোলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল হবে।	পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের হবে।
৫।	তলপেটে সামান্য চাপ দিলে ডিম বের হবে।	তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দুধের মতো তরল (মিল্ট) বেরিয়ে আসে।

হরমোন : থাই কৈ মাছের প্রণোদিত প্রজননের জন্য সাধারণত পিটুইটারি গ্লান্ড বা পিজি ব্যবহার করা হয়।

হরমোনের মাত্রা : পিজি বা হরমোনের মাত্রা নির্ভর করে ব্রুড মাছের ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতা প্রজনন ঋতু ও তাপমাত্রার উপর প্রজননের জন্য স্ত্রী মাছের জন্য সাধারণত ৬-৮ মি. গ্রা. কেজি দেহ ওজন ও পুরুষ মাছের জন্য ২ মি. গ্রা. তবে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় কোনো প্রকার হরমোন প্রয়োগ না করলেও তারা ডিম দেয়।

হরমোনের দ্রবণ তৈরি :

মধ্যম আকারের একটি সংরক্ষিত গ্লান্ডের ওজন ধারা হয় ২.০-২.৫ মি. গ্রাম। মাছের ওজনের আনুপাতিক হারে গ্লান্ড নিতে হবে। গ্লান্ডগুলোকে টিস্যু হোমোজিনাইজার বা মর্টারে ভালোভাবে গুঁড়ো করে ডিস্টিলড ওয়াটার অথবা ০.৫ - ০.৭% লবণ পানি দিয়ে (রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ ০.৫-০.৭ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে ডিস্টিলড ওয়াটার) মিশিয়ে ১০০ মি. লি. (মি.লি. বা সিসি) করলে ০.৫-০.৭% লবণ দ্রবণ তৈরি হবে) দ্রবণ তৈরি করতে হবে। গ্লান্ডের দ্রবণ পরিমাণ প্রতি কেজি মাছের জন্য ০.২-০.৫ মি. লি. এর বেশি হবে না।

ইনজেকশন প্রয়োগ :

থাই কৈ মাছের বক্ষ পাখনার গোড়া নরম জায়গায় ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয়।

প্রজনন :

ইনজেকশন দিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে গ্লাসনাইলন কাপড়ের হাপাতে রাখতে হবে এবং ঝর্ণার ব্যবস্থা করতে হবে। ৮-৯ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছ ডিম দিয়ে থাকে এবং পুরুষ মাছ মিল্ট দিয়ে ডিম নিষিক্ত হয়ে থাকে। ডিমগুলো খুবই ছোট ও পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

ডিম ফুটানো :

সাধারণ ১৬-২০ ঘণ্টা পর ডিম ফুটে রেণুপোনা বেড় হয়। ডিম দেওয়া শেষ হয়ে গেলে মাছগুলোকে হাপা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

থাই কৈ মাছের রেণুর পরিচর্যা ও খাদ্য প্রয়োগ :

ডিম থেকে রেণু বের হওয়ার পর হাপাতেই ২-৩ দিন রেণুগুলোকে রাখতে হবে। রেণুগুলো আকারে খুবই ছোট হয়। প্রথম অবস্থায় হাঁস/মুরগির সিদ্ধ ডিমের কুসুম খাবার হিসেবে দিতে হবে। ২-৩ দিন খাওয়ানোর পর রেণু নার্সারি পুকুরে দিতে হবে। হাপাতে বেশি দিন রাখলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

থাই কৈ মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা

লাভজনকভাবে মাছ চাষ করতে হলে ভালো গুণগতমান সম্পন্ন দ্রুত বর্ধনশীল জাতের পোনা খুবই জরুরি। আর তা পেতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

(ক) মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা :

১. নার্সারি পুকুরের পাড় ও তলা সুন্দরভাবে ঠিক করতে হবে। যাতে ভেতর থেকে বাহিরে পানি না যেতে পারে বা বাহির থেকে পানি না আসতে পারে। নার্সারি পুকুরের আয়তন ১৫-২০ শতাংশ হলেই চলে। বর্ষাকালে যাতে থাই কৈ মাছ বাহিরে চলে যেতে না পারে। সে জন্য পুকুরের চারদিকে জাল দিয়ে রাখতে হবে।

২. জলজ আগাছা দূর করা : জলজ আগাছা সূর্যের আলো পড়তে বাঁধা দেয় ও পুষ্টি শোষণ করে নেয়।

৩. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা : তিন ভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। তবে নার্সারি পুকুরের ক্ষেত্রে, পুকুর শুকালে ভালো হয়।

৪. পানি সরবরাহ: চুন প্রয়োগের আগে দূষণমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হয়।

৫. চুন প্রয়োগ : প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। পরিমাণমত চুন আগের দিন মাটির চাড়িতে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রৌদ্রোজ্জ্বল সময়ে ছিটিয়ে দিতে হয়।

৬. সার প্রয়োগ : জৈব সার প্রতি শতাংশে ১০-১৫ কেজি,খৈল প্রতি শতাংশে আধা কেজি প্রয়োগ করতে হবে। কারণ জৈব সার প্রয়াগে প্রচুর জু-প্লাঙ্কটন উৎপাদন হয়, যা পোনার প্রিয় খাদ্য।

৭. জলজ পোকা দমন : হাঁস পোকা, ক্লাডোসেরা কপিপোডা ও অন্যান্য কয়েক ধরনের জলজ পোকা রেণু পোনার জন্য ক্ষতিকর। রেণু পোনা পুকুরের ছাড়ার ২৪-৪৮ ঘণ্টা পূর্বে প্রতি ঘন মি. পানির জন্য আধা মি.লি. হারে সুমিথিয়ন বা এক গ্রাম হারে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করতে হবে।

২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা :

হ্যাচারির থেকে অক্সিজেন ব্যাগেই রেণু পরিবহন করা উচিত। ৯০×৫০ সে. মি. পলিথিন ব্যাগেই ৮-১০ ঘণ্টা দূরত্বে ১২৫ গ্রামের বেশি রেণু পরিবহন করা উচিত। সাধারণত প্রতি প্যাকেটের জন্য ২ টি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত কোনো কারণে যদি একটি ছিদ্র হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি পানি, অক্সিজেন ও পোনা রক্ষা করতে সাহায্য করবে। পরিবহনকালে ব্যাগে যাতে কোনো ধরনের আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আগুনের উৎস থেকে ব্যাগ সাবধান রাখতে হবে। রেণু ছাড়ার পূর্বেও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে রেণু বহনকারী ব্যাগে ও বা পাতিলের পানির তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানি আস্তে আস্তে বদল করে তাপমাত্রার ব্যবধান ধীরে ধীরে কমাতে হবে। এ কাজটি ১৫-২০ মিনিট করতে হবে। তাপমাত্রা সমতায় এলে ব্যাগের বা পাতিলের এক অংশ পানিতে ডুবিয়ে বাহির থেকে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে পানির স্রোত দিলে ধীরে ধীরে রেণু স্রোতের বিপরীত বেরিয়ে আসবে। সাধারণত পাড়ের কাছাকাছি রেণু ছাড়তে হয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রেণু ছাড়তে হয়।

৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

রেণু ছাড়ার পরদিন গামছা দিয়ে টেনে রেণুর বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পুকুরের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হওয়ার জন্য নিম্মোক্ত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা নিম্নরূপ :

সার	মাত্রা (শতাংশে প্রতিদিন)
গোবর	২০০গ্রাম
ইউরিয়া	৫ গ্রাম
টিএসপি	৫ গ্রাম

মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। পোনা ছাড়ার পর প্রতিদিন দৈহিক ওজনের শতকরা ১০-১২% হারে (চালের কুঁড়া ৪০% সরিষার খৈল ৩০% ও ফিস ফিম ৩০% মিশণ করে বল আকারে প্রয়োগ করতে হবে অথবা সৌদি-বাংলা চিংড়ির নার্সারি ফিড) খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সপ্তাহে অন্তত একবার হররা টেনে পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস দূর করতে হবে। ২০-২৫ দিন পর পর জাল টেনে

মাছের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পোনাকে জাল টেনে পানির ঝাঁপটা দিয়ে পোনার পেট খালি করে ফেলতে হবে। এবং বিক্রির দুই এক দিন আগে খাদ্যে প্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে। থাই কৈ মাছ বিশেষত বড় কৈমাছের চাহিদা বিত্তবান শ্রেণির কাছে অত্যন্ত বেশি। রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছের চাহিদা রয়েছে এবং বেশ চড়া দামে থাই কৈ-এর পোনা সরবরাহ করার জন্য উপরোক্ত ধাপগুলো মেনে চলতে হবে।

শিং মাছের প্রজোদিত প্রজনন

শিং মাছ এদেশের আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাছ। এটি ও সুস্বাদু, পুষ্টিকর কম চর্বিযুক্ত মাছ। জ্যান্ত অবস্থায় এ মাছের বাজারজাত করা হয় বলে রোগীর পথ্য হিসেবে এ মাছের চাহিদা প্রচুর। সাম্প্রতিক সময়ে শিং মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে দেশে শিং মাছের পোনা প্রাপ্তি ও চাষের পথ সুগম হয়েছে।

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহ ও পরিচর্যা :

সাধারণত ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সুস্থ্য সবল ও পরিপক্ব ব্রুড মাছ সংগ্রহ করতে হবে। পুকুরে প্রতি শতাংশে ৫০-৬০ টি ব্রুড শিং রাখা যায়। মাছের মোট ওজনের ৫-৬% সম্পূরক খাবার দিতে হবে।

চিত্র : শিং মাছ

২। কৃত্রিম প্রজনন :

স্ত্রী মাছকে ১০০-১২৫ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি হিসেবে একটি ইনজেকশন প্রয়োগ করা যায়। তবে স্ত্রী মাছকে প্রথম ইনজেকশন ৫০ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি হিসেবে প্রয়োগ করে ৬-৮ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছকে ১০০ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি হিসাবে ২য় ইনজেকশন প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। স্ত্রী মাছের ২য় ইনজেকশনের সময় পুরুষ মাছকে ৫০ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি হিসাবে প্রয়োগ করলে অধিক পরিমাণে মিল্ট পাওয়া যায়। স্ত্রী মাছকে ২য় ইনজেকশন দেওয়ার ৯-১২ ঘন্টার মধ্যে ডিম দিয়ে থাকে।

৩। ডিমের পরিচর্যা :

শিং মাছের ডিম আঠাল হওয়ার কারণে ট্রে অথবা সিস্টার্নে ৪-৬ ইঞ্চি পানির গভীরতায় ডিমগুলো ট্রে/সিস্টার্নের তলদেশে ঘন মেস সাইজের মশারি কাপড়ের ফ্রেমে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ঝরনা / ০.৫ ইঞ্চি

প্লাস্টিক পাইপ সূক্ষ্ম ছিদ্র করে ঝর্ণার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রে/ সিস্টার্নে পানি নির্গমন মুখে গ্লাস নাইলন কাপড় দিয়ে দিতে হবে যাতে ডিম ফুটে রেণু বের হলে চলে যেতে না পারে। রেণু পোনা বের হলে ট্রে/ সিস্টার্নের তলায় ডিমের খোসাসহ অন্যান্য ময়লা সাইফনিং করে পরিষ্কার করে দিতে হবে। ট্রে বা সিস্টার্নে রেণু পোনা যাতে ফাঙ্গাসে আক্রান্ত না হয় সে জন্য মিথিলিন ব্লু বা ম্যালাকাইট গ্রীন ব্যবহার করা যেতে পারে। ২৮-৩২ ঘন্টা পর নিষিক্ত ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হয়।

৪। পোনার পরিচর্যা :

ডিম ফোটার ৩-৪ দিন পর রেণু পোনাকে ডিমের কুসুম, টিউবিফেক্স, জুপ্লাঙ্কটন বা আর্টিমিয়া খাবার হিসেবে দিতে হবে। ট্রে বা সিস্টার্নের কর্নারের কিছু অংশ কাল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কারণ রেণু পোনা অন্ধকার জায়গা পছন্দ করে এবং দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে। রাতে সমস্ত ট্রে বা সিস্টার্নে বিচরণ করে এবং রাতে খাবার খেতে বেশি পছন্দ করে। হ্যাচারিতে ৮-১০ দিন যত্ন সহকারে প্রতিপালনের পর ডিম পোনা থেকে ধানী পোনায় পরিণত হয়।

৫। নার্সারির পুকুরের যত্ন :

প্রথমে একটি পোনা রাখার নার্সারি পুকুর তৈরি করে রাখতে হবে। ৮-১০ দিনের ধানী পোনা প্রতি শতাংশে ১০-১২ হাজার মজুদ করা যেতে পারে। প্রতিদিন পোনার মোট ওজনের দ্বিগুণ হারে ২-৩ বার নার্সারি খাবার দিতে হবে। ধানী পোনার ছাড়ার ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে ২-৩ ইঞ্চি চারা পোনায় পরিণত হয়।

দেশি মাগুরের প্রণোদিত প্রজনন

মাগুর মাছ এদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় মাছ। এটি সুস্বাদু পুষ্টিকর, কম চর্বিযুক্ত মাছ। জীবিত অবস্থায় বাজারজাত করা হয় বলে এ মাছের বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। পূর্বে খাল বিলে পুকুর ডোবা পতিত জলাশয়সমূহে প্রচুর মাগুর মাছ পাওয়ার যেত। কিন্তু বর্তমানে এই মাছটি বিলুপ্তির পথে। প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সমূহের পরিবেশ বিপর্যয়ই মাগুর মাছের বর্তমান অপ্রতুলতার প্রধান কারণ। বিজ্ঞানীরা দেশীয় মাগুর মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতির প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছেন।

চিত্র : মাগুর মাছ

১। প্রজননক্ষম মাছ সংগ্রহ ও পরিচর্যা :

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে সুস্থ ও সবল ব্রুড মাছ সংগ্রহ করতে হবে। পুকুরের প্রতি শতাংশে চল্লিশটি মাছ মজুদ করা যায়। মাছের দেহ ওজনের ৫-৬% হারে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

মাছের ভ্রূণের পরিস্ফুটন ও শূকের বৃদ্ধি

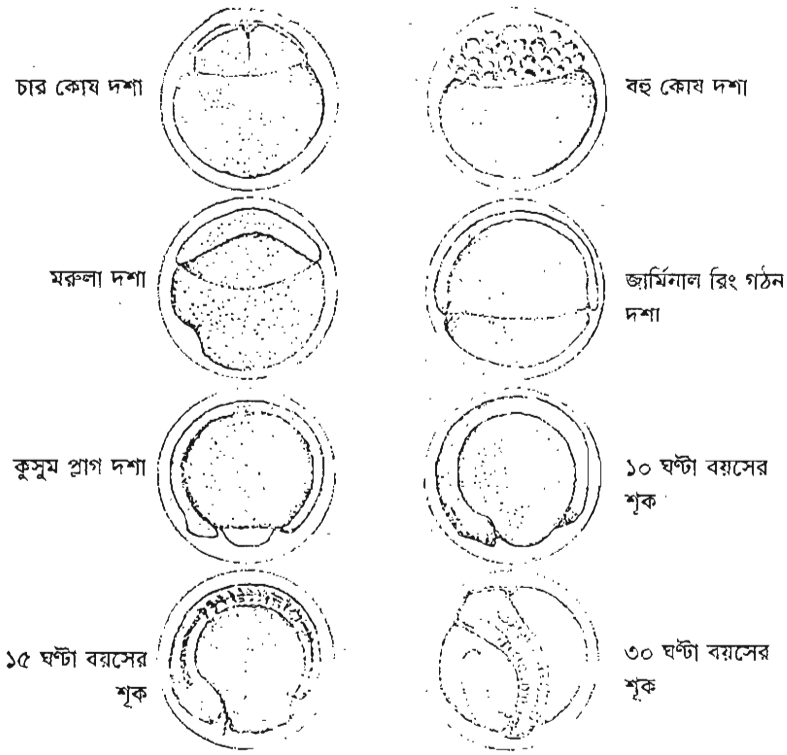

চিত্র : দেশী মাগুরের ভ্রূণীয় পরিস্ফুরণের বিভিন্ন দশা

২। কৃত্রিম প্রজনন :

স্ত্রী মাছকে ১০০-১২৫ মিলি গ্রাম পিজি / কেজি হিসেবে একটি মাত্র ইনজেকশন প্রয়োগ করা যায়। তবে স্ত্রী মাছকে ১ম ইনজেকশন ৫০মি.গ্রা. পিজি/কেজি হিসেবে প্রয়োগ করে ৬-৮ ঘণ্টা পর ১০০ মি.গ্রা. পিজি/কেজি হিসেবে ২য় ইনজেকশন প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। স্ত্রী মাছের ২য় ইনজেকশনের সময় পুরুষ মাছকে ৫০ মি.গ্রা. পিজি/কেজি হিসেবে প্রয়োগ করলে অধিক পরিমাণ মিল্ট পাওয়া যায়। স্ত্রী মাছকে ২য় ইনজেকশন দেওয়ার ৯-১২ ঘণ্টার মধ্যে ডিম দিয়ে থাকে। স্ত্রী মাছের ডিম দেওয়ার সময় পুরুষ মাছের পেট কেটে শুক্রশয় বের করে কাচি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ০.৯% লবণ দ্রবণে মিশিয়ে শুক্রাণুর দ্রবণ তৈরি করতে হবে। স্ত্রী মাছের পেটে চাপ দিয়ে ডিম বের করে শুকনা থালা বা পাত্রে সংগ্রহ করে তার উপর শুক্রাণুর দ্রবণ মিশিয়ে ঐ ডিম নিষিক্ত করা হয়।

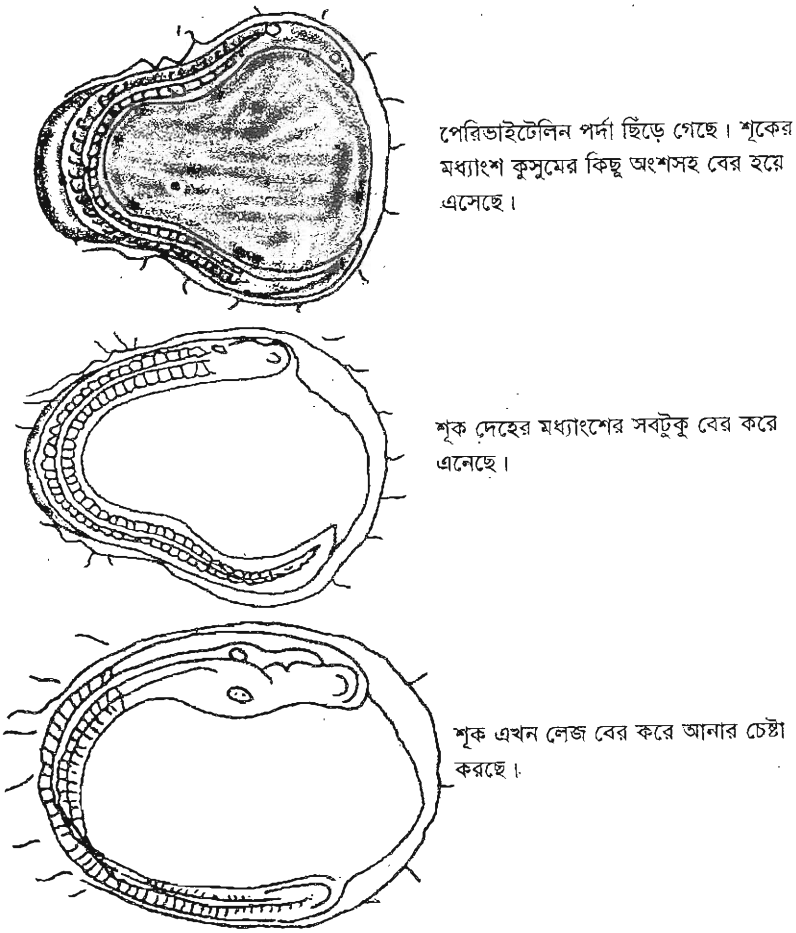

চিত্র : দেশি মাগুরের ডিম ফোটার প্রক্রিয়া

৩। ডিমের পরিচর্যা :

মাগুর মাছের ডিম আঠালো হওয়ার কারণে ট্রে অথবা সিস্টার্নে ৪-৬ ইঞ্চি পানির গভীরতায় ডিমগুলো ট্রে বা সিস্টার্নের মধ্যে ড্রেন তৈরি করে ঘন মশারির কাপড়ের নেটে ছড়িয়ে দিতে হয় এবং ডিমগুলোর উপর ঝর্ণার ব্যবস্থা করতে হয়। ট্রে অথবা সিস্টার্নে পানি নির্গমন মুখে গ্লাসনাইলন কাপড় দিয়ে এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে ডিম ফুটে রেণু বের হয়ে যেতে না পারে। রেণু পোনা বের হলে ট্রে অথবা সিস্টার্নের তলায় ডিমের খোসাসহ অনান্য ময়লা সাইফনিং করে পরিষ্কার করে দিতে হবে। ট্রে বা সিস্টার্নে রেণু পোনা যাতে ফাঙ্গাসে আক্রান্ত না হয় সে জন্য মিথিলিন ব্লু বা ম্যালাকাইট গ্রীন ব্যবহার করা যেতে পারে। ২৮-৩২ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হয়।

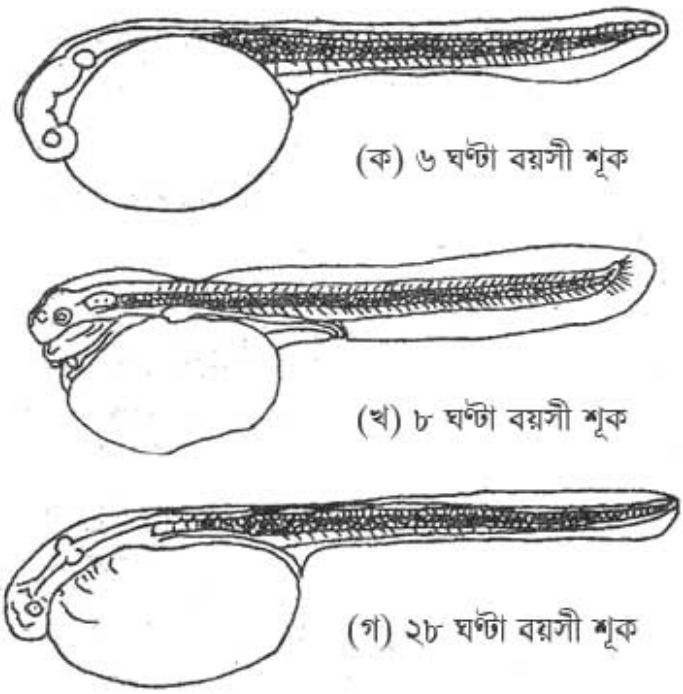

চিত্র : দেশি মাগুরের বিভিন্ন বয়সের শূক

৪। পোনার পরিচর্যা :

ডিম ফোটার ৩-৪ দিন পর রেণু পোনাকে ডিমের কুসুম, টিউবিফেক্স জুপ্লাঙ্কটন বা আর্টিমিয়া খাবার হিসেবে দিতে হবে। ট্রে বা সিস্টার্নের কর্ণারের কিছু কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কারণ রেণু অন্ধকার জায়গা পছন্দ করে এবং দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে। রাতে সমস্ত ট্রে বা সিস্টার্নে বিচরণ করে এবং রাতে খাবার খেতে এরা বেশি পছন্দ করে। হ্যাচারিতে ৮-১০ দিন যত্ন সহকারে প্রতিপালনের পর ডিম পোনা থেকে ধানী পোনায় পরিণত হয়।

৫। নার্সারি পুকুরের যত্ন :

প্রথমেই একটি পোনা রাখার নার্সারি তৈরি করে রাখতে হবে। ৮-১০ দিনের ধানী পোনা প্রতি শতাংশে ৮-১০ হাজার মজুদ করা যেতে পারে। প্রতিদিন পোনার মোট ওজনের দ্বিগুণ হারে ২-৩ বার নার্সারি খাবার দিতে হবে। ধানী পোনা ছাড়ার ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে ৩-৪ ইঞ্চি আকারের চারা পোনায় পরিণত হয়।

খাঁই পাঙাশ মাছের ব্রুড ব্যবস্থাপনা :

একটি হ্যাচারির প্রাণ হলো ব্রুড মাছ। প্রজনন সফলতা ও ভালো মানের পোনা প্রাপ্তি বহুলাংশে নির্ভর করে ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার উপর।

২০২০

ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনা কৌশল :

১। মজুদ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা

২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১। মজুদ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা :

(ক) পাড় ও তলা ঠিক করা :

i. পাড় ভাঙা থাকলে বর্ষায় পুকুরের মাছ বাহিরে চলে যেতে পারে এবং বাহির থেকে অপ্রয়োজনীয় মাছ চলে আসতে পারে।

ii. পাড় ভাঙা থাকলে বাহির থেকে দূষিত পানি প্রবেশ করতে পারে।

iii. তলা ঠিক না থাকলে পুকুরে জাল টানতে অসুবিধা হয়।

iv. বেশি কাদা থাকলে তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়।

খ) জলজ আগাছা দূর করা :

i. জলজ আগাছা পুকুরে থাকলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না।

ii. ক্ষতিকর প্রাণী যেমন– সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে পারে।

iii. জলজ আগাছা পুকুরে পুষ্টিকর দ্রব্য শোষণ করে নেয়, তাই পুকুরের সব ধরনের আগাছা দূর করা অবশ্যক।

(গ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন :

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে থাকলে চাষকৃত মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে এবং মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই পুকুরে সব ধরনের রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ তিন ভাবে দমন করা যায় :

i. বার বার জাল টেনে।

ii. রোটেনন প্রয়োগ করে।

iii. পুকুর শুকিয়ে।

তবে সবচেয়ে পুকুর শুকালে ভালো হয়। এই কাজ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে করা হয়।

চুন প্রয়োগ :

পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশন করে মাটি ভিজে থাকা অবস্থায় চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ফলে :

i) পুকুরের তলদেশে পুষ্টি উপাদান মুক্ত হয়।

ii) রোগ-বালাই দূর হয়।

iii) মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর করে।

iv) মাটি থেকে ক্ষতিকর গ্যাস বের করে দেয়।

v) পিএইচ-এর মান নিয়ন্ত্রণ থাকে।

প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রৌদ্রময় সময়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

ক) সার প্রয়োগ :

সার প্রয়োগে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। সার প্রয়োগের মাত্রা :

সারের নাম	গ্রাম/শতক
ইউরিয়া	২৫০ গ্রাম
টি.এস.পি	৫০০ গ্রাম
এম পি	১২০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৮০০ গ্রাম
গোবর	৬০০০ গ্রাম- ৯০০০ গ্রাম

সাধারণত চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয়।

(২) মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা :

(ক) ব্রুড মাছ সংগ্রহ:

i) হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করে।

ii) ব্রুড ব্যাংক থেকে পাঙ্গাশের ব্রুড সংগ্রহ করে।

iii) বিদেশ থেকে ব্রুড আমদানি করে।

iv) এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড বিনিময় করে।

(গ) পরিবহন :

ব্রুড অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিবহন করতে হবে। এসব মাছ পরিবহনের সময় যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হয়। পরিবহনের আগে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বাড়ার আগেই ব্রুড বাছাইয়ের কাজ সেরে ফেলা ভালো। খেয়াল রাখতে হবে মাছ যাতে কোনোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। ব্রুড মাছ খুব সকাল বা বিকেলে অর্থাৎ ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সাবধানতার সাথে পরিবহন করতে হবে, প্রয়োজনে অবচেতন করে নিতে হবে। অবচেতন করার জন্য প্রতি লিটার পানিতে এক ফোঁটা ক্লোভ অয়েল (Clove Oil) মিশিয়ে ব্রুড মাছ পরিবহন করা যেতে পারে। ব্রুড পরিবহনের ক্ষেত্রে বর্তমানে M.S-২২২ ও কুইনালডিন বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে ঔষধ প্রয়োগের মাত্রা প্রজাতিভেদে ও পানির তাপমাত্রার উপর কম বা বেশি হতে পারে।

(ঘ) শোধন :

পুকুরে ব্রুড মাছ ছাড়ার আগে মাছকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য শোধন করে নেওয়া হয়। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা লবণ দিয়ে ব্রুড মাছকে শোধন করতে হবে।

(ঙ) মজুদ ঘনত্ব :

প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি ব্রুড মাছ মজুদ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করলে মাছের ডিমের পরিপক্বতা বিলম্বে আসে এবং প্রজননকাল ক্ষণস্থায়ী হয়। এতে মৌসুমের শুরুতে রেণু উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পরবর্তিতে রেণুর মূল্য কমে যাওয়ায়, হ্যাচারি মালিকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। পুকুরে ব্রুড মজুদের কাজটি কার্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত।

৩) মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

(ক) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ও সার প্রয়োগ :

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা বজায় রাখার জন্য নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রতি শতাংশে ১.৫-২ কেজি গোবর সার ৪০-৫০ গ্রাম ইউরিয়া ২০-২৫ গ্রাম টিএসপি সার একত্রে গুলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রা পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে। তাই সার ব্যবহার কম বা বেশি হতে পারে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার প্রাকৃতিক খাদ্যের মাত্রা হাত বা গামছা-গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

(খ) সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ :

ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ। কারণ পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যে মাছের পুষ্টি চাহিদা জোগান দিতে পারে না। আর প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ব্রুড মাছের কতকগুলো খারাপ লক্ষণ দেখা যায়

i) ব্রুড মাছের ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয়।

ii) মাছের ডিমের সংখ্যা বা Fecundity কমে যায়।

iii) ডিমের আকার ছোট হয়।

iv) ডিমের গুণাগুণ নিম্নমানের হয়, ফলে ডিমের পরিস্ফুটন হার কমে যায়।

v) রেণুপোনা বেঁচে থাকার হার কমে যায়।

সম্পূরক খাদ্যে নিম্নলিখিত উপাদান দিয়ে তৈরি করা যায়।

উপাদান	মাত্রা
গমের ভুসি /চালের কুঁড়া (অটো রাইস)	৪৫%
তৈল বীজের খৈল	৩০%
মৎস্য চূর্ণ	১৫%

আটা	৫%
চিটাগুড়	৪%
ভিটামিন (Vitamin E)	১%
মোট	১০০%

উপরোক্ত উপাদানের সাথে ভিটামিন মিক্সারে প্রতি ১০০ কেজির জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করলে ডিমের পরিপক্বতা ভালো হয়। এসব উপাদান একত্রে মিশিয়ে খাদ্যে বল তৈরি করে মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে দৈনিক ২ (দুই) বার প্রয়োগ করতে হয়।

গ) পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ :

ব্রুড মাছের পরিপক্বতা পুকুরের পানি ও মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। তাই পুকুরের পানি মাঝে মধ্যে আংশিক পরিবর্তন করে দিলে ভালো হয়। পানিতে এরেশন (Aeration) দিলে মাছের পরিপক্বতা দ্রুত আসে।

পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ ছকের সাহায্যে নিম্নে দেওয়া হলো :

ভৌত গুণাগুণ	উপযুক্ত মাত্রা
পানির রং	হালকা সবুজ বা বাদামি
স্বচ্ছতা	২৫-৩০ সে. মি.
আলো	প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা
গভীরতা	১.৫-৩ মিটার
তাপমাত্রা	২৫-৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

রাসায়নিক গুণাগুণ	উপযুক্ত মাত্রা
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৮ PPM
কার্বন ডাই-অক্সাইড	১২- PPM এর নীচে
PH (পিএইচ)	৬.৫-৯
অ্যামোনিয়া	০.০২৫ PPM এর নীচে
ক্ষারত্ব	২০ মি. গ্রা. /লিটার
লৌহ	১০ মি. গ্রা. /লিটার এর নীচে

(ঘ) হররা টান :

সপ্তাহে একবার হররা টেনে পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস দূর করতে হবে।

২০২০

(ঙ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা :

মাছ রোগাক্রান্ত হলে তা ডিমের পরিপক্বতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। তাই মাছ যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। আমাদের দেশে সাধারণত আরগুলাস বা মাছের উঁকুন দ্বারা মাছ বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ব্রুড আরগুলাস দ্বারা আক্রান্ত হলে দ্রুত প্রতিকার করা উচিত। এ রোগ প্রতিকারের জন্য ০.৫ পি.পি.এম হারে ডিপটারেক্স বা ০.২৫ পিপিএম হারে সুমিথিয়ন পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এ ঔষধ ৫-৭ দিন অন্তর অন্তর সপ্তাহে একবার করে মোট তিনবার প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রুড ব্যবস্থাপনার সকল ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা সফলভাবে হ্যাচারি পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। কোনো কারণে ব্রুড ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি হলে হ্যাচারি পরিচালনা সম্পূর্ণ অলাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

থাই পাঙ্গাশ মাছের রেণুর পরিচর্যা ও খাদ্য প্রয়োগ

থাই পাঙ্গাশের রেণু পোনাকে বিশেষ যত্নসহকারে পরিচর্যা করতে হয়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেণু একে অপরকে খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ থাই পাঙ্গাশের রেণুর মাঝে আত্মভুক (ক্যানিব্যালিস্টিক) বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সে কারণে সঠিক সময় পর্যাপ্ত খাবার না দিলে রেণুর সংখ্যা কমতে থাকে। যদিও রেণু পোনার কুসুম থলি ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। তবুও সাবধানতা অবলম্বন করে হ্যাচিং-এর ১৮ ঘণ্টা পর থেকে খাবার দেওয়া শুরু করতে হবে। এ সময় হালকা আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন মাছ সিদ্ধ করে ভালো করে পিষে পানিতে তরল করে ছেঁকে ট্রেতে দিতে হবে। ২-৩ ঘণ্টা পর পর মাছ সিদ্ধ দেওয়া যায়। ২ দিন পর থেকে আর্টিমিয়ার নপ্লি, টিউবিফেক্স, ছোট জুপ্লাঙ্কটন যেমন ময়না ট্রেতে খাদ্য হিসেবে দিতে হবে। প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা পর পর এসব খাদ্য হ্যাচিং ট্রেতে ৫-১০ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে সাইফনিং করে অতিরিক্ত খাদ্য, রেণুর বর্জ্য ও ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। অপরিষ্কার অবস্থার কারণে যে কোনো সময় ইনফেকশন হয়ে সমস্ত রেণু মারা যেতে পারে। ৭-১০ দিন পর বড় চৌবাচ্চা বা আঁতুড় পুকুরে স্থানান্তর করা যায়। এ সময় ৫০% টিউবিফেক্স চূর্ণ করে ভালো করে মিশিয়ে পোনাকে খাওয়াতে হবে। এ সময় পোনার ওজনের দ্বিগুণ পরিমাণ খাবার, দিনে ৩/৪ প্রয়োগ করতে হয়।

থাই পাঙ্গাশ মাছের প্রণোদিত প্রজনন:

চাষযোগ্য মাছ হিসেবে থাই পাঙ্গাশ বেশ জনপ্রিয়। তাছাড়া সুস্বাদু মাছ হিসেবে বাজারে বেশ চাহিদা আছে। থাই পাঙ্গাশ মাছের প্রণোদিত প্রজননের ধাপ সমূহ নিম্নরূপ :

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহ :

ক. হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করা।

খ. ব্রুড ব্যাংক থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা।

গ. এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড আদান প্রদান অর্থাৎ ব্রুড বিনিময় করে।

ঘ. বিদেশ থেকে ব্রুড আমদানি করে।

২। ব্রুড মাছ পালন :

ক. সংগৃহীত ব্রুড মাছ ভালো পরিবেশে উৎপাদনশীল পুকুরে যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুকুরের আয়াতন ৫০-১০০ শতাংশ হলে এবং গভীরতা ৬-৮ ফুট হলে ভালো হয়।

খ. প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির থেকে ৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য দিনে ২ (দুই) বার নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গ. নিয়মিত মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

ঘ. ১৫-৩০ দিন পরপর আংশিক পানি বদল করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

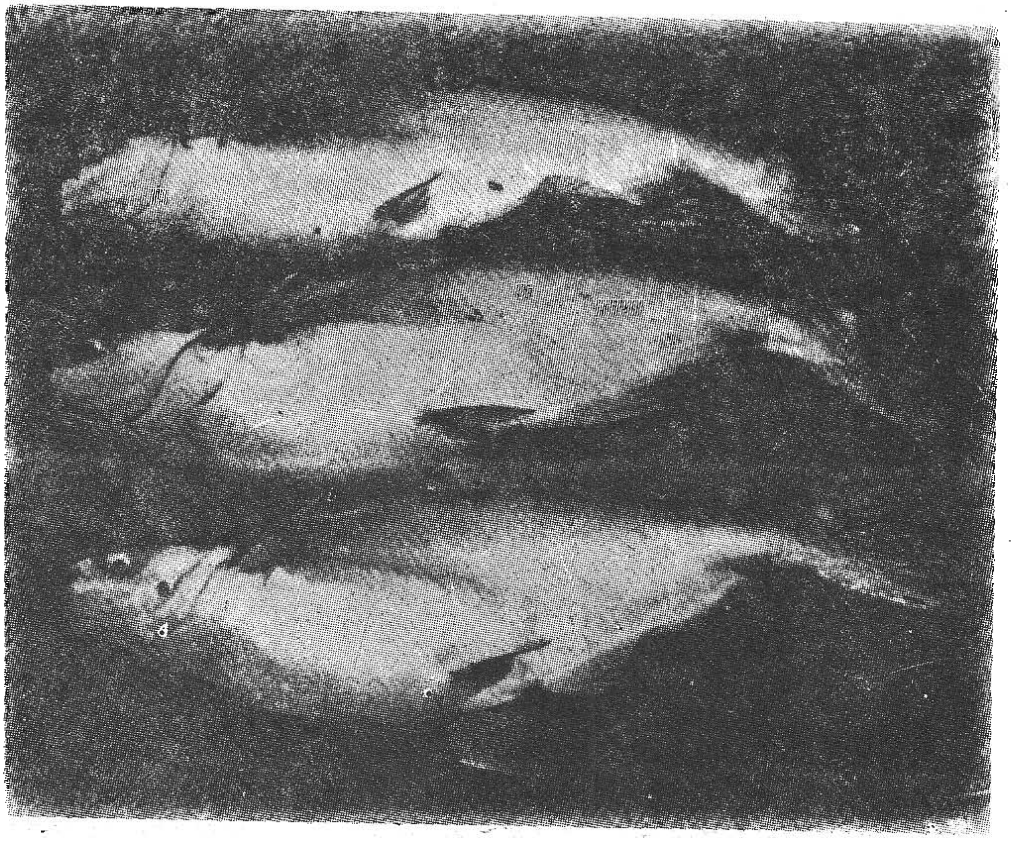

চিত্র : থাই পাঙ্গাশের ব্রুড

৩। ব্রুড মাছ বাছাই :

প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে ব্রুড মাছ বাছাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিপক্ব পাঙ্গাশ মাছের পুরুষ ও স্ত্রী মাছের বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো :

স্ত্রী	পুরুষ
১। স্ত্রী পাঙ্গাশ তুলনামূলক বড়।	১। পুরুষ পাঙ্গাশ তুলনামূলক ছোট।
২। স্ত্রী মাছের পেট ভারী ও নরম হয়	২। পুরুষ মাছের পেট চিকন হয়।
৩। পায়ুপথ ফোলা ও গোলাপি বর্ণের	৩। পায়ুপথ কালচে বর্ণের।
৪। পেটে চাপ দিলে দুই একটা ডিম বের হয়ে আসে	৪। পেটে চাপ দিলে পায়ু দিয়ে মিল্ট বের হয়ে আসে।

৪। হরমোনের মাত্রা :

হরমোনের মাত্রা নির্ভর করে মাছের ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের পরিপক্বতা প্রজনন ঋতু ও তাপমাত্রার উপর। থাই পাঙ্গাশের প্রণোদিত প্রজননের জন্য সাধারণত পিটুইটারি গ্লান্ড বা পিজি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাই পাঙ্গাশের প্রণোদিত প্রজনন করানো হয়। স্ত্রী মাছকে দুইটি মাত্রায় ও পুরুষ মাছকে একটি মাত্রায় ইনজেকশন দেওয়া হয়। প্রথমে স্ত্রী মাছকে ২ মি. গ্রা. পিজি প্রতি কেজি দেহ ওজনে ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রী মাছ আলাদাভাবে বড় বড় চৌবাচ্চায় রাখা হয়। প্রথম ইনজেকশনের ৬-৮ ঘণ্টা পর স্ত্রী মাছকে ৬ মি. গ্রা. পিজি প্রতি কেজি দেহ ওজনে দ্বিতীয় ইনজেকশন দিতে হয় এবং এ সময় পুরুষ মাছকে একমাত্র ইনজেকশন দিয়ে পৃথক চৌবাচ্চায় রাখা হয়। দ্বিতীয় ইনজেকশনের ৭-৯ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছের ওভুলেশন সম্পন্ন হয়।

৫) হরমোন দ্রবণ তৈরি :

এসিটোন বা অ্যালকোহলে সংরক্ষিত পিজি থেকে প্রয়োজনীয় পিজি নিয়ে টিস্যু পেপারের সাহায্যে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার পিজিকে টিস্যু হোমোজিনাইজার বা হামানদিস্তা দিয়ে ভালোভাবে পিষতে হবে। পেষার সময় এমনভাবে ডিস্টিল ওয়াটার দিতে হবে যেন প্রতি কেজি ব্রুড মাছ ০.৩ মি. লি. এর বেশি দ্রবণ না পায়। পেষার পর দ্রবণটি সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দিয়ে থিতিয়ে তলানি বাদ দিয়ে উপরের পরিষ্কার দ্রবণ ইনজেকশনের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৬। ইনজেকশন প্রয়োগ :

সাধারণত মাছের পার্শ্বরেখার উপর মাংস পেশি, বক্ষপাখনার গোড়ার নিচের দিকের নরম জায়গায় ২০-২২ নং সুচ ব্যবহার করে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। এসময় ব্রুড মাছকে আলতো করে ধরে ভেজা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফোমের উপর রেখে ইনজেকশন দিলে মাছ আঘাত পায় না।

চিত্র : স্ট্রিপিং করে পাঙ্গাসের ডিম বের করা হচ্ছে

৭। চাপ পদ্ধতিতে ডিম সংগ্রহ ও নিষিক্তকরণ :

পাঙ্গাশ মাছের ডিম ও শুক্রাণু স্ট্রিপিং বা চাপ প্রয়োগ করে সংগ্রহ করা হয়। স্ত্রী মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেওয়ার পর ৫-৬ ঘন্টা পর হতে মাছকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে,তাদের ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে কিনা। ডিম দেওয়ার সময় হলে পানিতে ২-১টা ডিম দেখা যাবে এবং পেটে সামান্য চাপ দিলে সহজে ডিম বের হয়ে আসবে। তখন চৌবাচ্চা থেকে স্ত্রী মাছ তুলে পরিষ্কার শুকনো প্লাস্টিকের গামলার উপর ধরে মাছের তলপেটে উপর থেকে নীচের দিকে হাত দিয়ে আস্তে চাপ প্রয়োগ করলে ডিম বের হয়ে আসবে। একই সময়ে পুরুষ মাছ হতে মিল্ট বা শুক্রাণু সংগ্রহ করে ডিমের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। ডিমে পুরুষ মাছের শুক্রাণু মেশানোর পর মুরগি বা পাখির পালকের সাহায্যে ভালোভাবে নেড়ে ৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট পর্যন্ত মিশিয়ে ডিম নিষিক্ত করতে হবে। ডিম নিষিক্ত হওয়ার পর গামলায় সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে নিষিক্ত ডিম হতে অতিরিক্ত মিল্ট ও অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করে কয়েক মিনিটের মধ্যে হ্যাচিং ট্রের মধ্যে স্থাপিত লোহার রড ও কাপড়ের অবকাঠামোর উপর খুব হালকাভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। থাই পাঙ্গাশের ডিম আঠালো তাই উপরোক্ত সমস্ত কাজ ৩-৪ মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হবে নতুবা ডিম জমাট বেঁধে যাবে।

৮। ডিম ফুটানো:

নিষিক্ত ডিম অবকাঠামোর উপর ছড়িয়ে দেওয়ার পর ট্রেতে পানিপ্রবাহ বা ঝর্ণা দিয়ে পানি দিতে হবে। পানির তাপমাত্রার উপর হ্যাচিং-এর সময় নির্ভর করে। সাধারণত ২৭°-২৯° সেঃ তাপমাত্রায় ২০-২১ ঘন্টার মধ্যেই থাই পাঙ্গাশের ডিম থেকে রেণু বের হয়ে আসে। সব ডিম ফুটে যাওয়ার পর হ্যাচিং ট্রের কাপড়ের ফ্রেমটি ডিমের খোসাসহ ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হয় এবং রেণু ট্রেতে থেকে যায়। পরে রাবার টিউব দিয়ে সাইফনিং করে ডিমের বাড়তি ময়লা ট্রে থেকে পরিষ্কার করতে হয়।

প্রশ্নমালা-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কোন ব্রুড মাছের পেট চিকন থাকে?

২। প্রজননের জন্য বাছাইকালে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের মধ্যে কোনটি বেশি নেয়া হয়?

৩। প্রজনন প্রভাবিত করে এমন ২টি হরমোন এর নাম লেখ।

৪। সিলভার কার্প এর প্রণোদিত প্রজননে কোন হরমোন ব্যবহার করা হয়?

৫। বেশির ভাগ হ্যাচারি মালিকগণ কোন হরমোন ব্যবহার করেন?

৬। ঠাণ্ডা আবহাওয়া প্রজননের জন্য হরমনের পরিমাণ কম না বেশি লাগে?

৭। রুই-মৃগেল মাছের প্রজননের জন্য কয়টি ইনজেকশন দিতে হয়?

৮। মাছের দেহে কোন কোন জায়গায় ইনজেকশন দিতে হয়?

৯। ব্রুড মাছকে অচেতন করার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন একটি ঔষধের নাম লিখ।

১০। ওভুলেশন বলতে কী বুঝায়?

১১। কমনকার্প বছরে কতবার ডিম দেয়?

১২। প্রাকৃতিক প্রজননে কমন কার্পের ডিম ফুটাতে কত সময় লাগে?

১৩। থাই পাঙ্গাশের প্রজননে কোন হরমোন ব্যবহৃত হয়?

১৪। থাই পাঙ্গাশের ব্রুড প্রতি শতাংশে কত কেজি রাখা হয়।

১৫। থাই কৈ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।

১৬। থাই কৈ মাছ কীভাবে আহরণ করা যায়?

১৭। থাই কৈ মাছের প্রধান খাদ্য কী?

১৮। থাই কৈ মাছের ব্রুড ব্যবস্থাপনায় মজুদ ঘনত্ব কী হওয়া উচিত?

১৯। থাই পাঙ্গাশের প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে হরমোনের মাত্রা লেখ।

২০। থাই কৈ মাছের প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে হরমোনের মাত্রা লেখ।

২১। শিং মাছ কী কী খায়?

২২। মাগুর মাছের মিল্ট কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. থাই কৈ মাছ চাষকালে পুকুর নির্বাচনের কোন বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়?

২. শিং/মাগুর মাছের রেণুর খাদ্য তালিকা লেখ।

৩. সহজাত প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

৪. পুরুষ ও স্ত্রী থাই কৈ মাছের পার্থক্য লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. থাই পাঙ্গাশ মাছের ব্রুড ব্যবস্থাপনার বর্ণনা দাও।

২. থাই কৈ মাছের প্রণোদিত প্রজননের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর।

৩. শিং মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

৪. মাগুর প্রণোদিত প্রজননের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর।

৫. কমন কার্পের প্রাকৃতিক প্রজননের আলোচনা কর।

৬. রুই জাতীয় মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোন দ্রবণ প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) কর্তৃক মাসওয়ারি রুই জাতীয় মাছের হরমোন প্রয়োগের মাত্রা লেখ।

৮. গ্রাস কার্পের প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি লেখ।

সপ্তম অধ্যায়
হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণ

হ্যাচারি :

যে প্রক্রিয়ায় পরিপক্ব পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রণোদিত করে ডিম ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং সে ডিম ফুটিয়ে রেণু উৎপাদন করা হয় তাকে প্রণোদিত প্রজনন বলা হয়। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অবকাঠামো ব্যবহার করা হয় তাকে হ্যাচারি হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ হ্যাচারি হলো একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, যেখানে মাছের প্রণোদিত প্রজননের সকল অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে মাছকে প্রজননে বাধ্য করা হয়।

হ্যাচারির প্রয়োজনীয়তা :

পরিবেশগত বিপর্যায়ের কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেণু/পোনা উৎপাদন ও প্রাপ্তি কমে যাওয়ায় ক্রমবর্ধমান রেণু/পোনার চাহিদা পুরণের জন্য হ্যাচারি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উল্লেখ্য, অধিক পরিমাণ উন্নত জাতের একই প্রজাতির একই বয়সের রেণু/পোনা পাওয়ার জন্য হ্যাচারির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিরল প্রজাতির বা প্রায় অবিলুপ্ত প্রজাতির মাছের প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে মাছের বিলুপ্তি রোধ করা যায়।

হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব :

হ্যাচারি কার্যক্রম পরিচালনার সময় এর অবকাঠামো ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহার করা, মেরামত করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়াকে হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণ বলে। একটি হ্যাচারি সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ প্রয়োজন হয়। এদের কোনো একটি একই সঙ্গে একাধিক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে স্বল্পদামি প্লাস্টিকের মগ, বালতি, পাইপ ইত্যাদি থেকে শুরু করে মূল্যবান যন্ত্র যেমন- মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউজ, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি কীটনাশক, জৈব ও অজৈব সার এবং মাছের খাবার ইত্যাদি। হ্যাচারির সফল পরিচালনার জন্য এসকল যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া :

একটি হ্যাচারি পরিচালনার বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো :

ক) প্রয়োজনীয় মাছ সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য :

১। বড় ফাঁসের বেড় জাল (২.৫-৪.০ সে. মি. ফাঁস)।

২। হাতাসহ নাইলনের স্কুপ নেট।

৩। মাছ বহনের জন্য হাতলওয়ালা স্ট্রেচার।।
৪। মাছকে অবচেতন করার জন্য প্লাস্টিকের বা ফাইবার গ্লাসের চৌবাচ্চা।
৫। জীবিত মাছ বহনের সুবিধাসহ পিকআপ বা অন্য কোনো যান।
৬। বিশ কেজি পর্যন্ত ব্রুড মাছ মাপার জন্য স্প্রিং ব্যালান্স।
৭। ব্রুড মাছ ধরে রাখার জন্য বড় তোয়ালে ও ফোম।
৮। অবচেতনকারী রাসায়নিক দ্রব্য যেমন: MS ২২২।
৯। ঢাকনাসহ প্লাস্টিকের বিভিন্ন আকারের বালতি।
১০। তুলা।

রক্ষণাবেক্ষণ :

১। মাছ ধরার জালসমূহ ব্যবহারের পর রৌদ্রে শুকিয়ে বাক্সে বা ড্রামের মধ্যে মুখ বেধে সংরক্ষণ করতে হবে। জীবাণুনাশক দ্রবণে চুবিয়ে সংরক্ষণ করা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে জালের সাথে কোনো অবস্থাতে মাছ থেকে না যায়।
২। মাছ পরিবহনের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ কাজ শেষে ক্লোরিনযুক্ত পানি দ্বারা ধুয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে।
৩। অবচেতনকারী ঔষধ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত।

খ) পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ও দ্রবণ তৈরি করার উপকরণ :

১। হ্যাক'স ব্লেড বা ইলেকট্রিক করাত।
২। মাছের দৈর্ঘ্য মাপার বোর্ড।
৩। পিটুইটারি গ্রন্থি ওঠানোর জন্য সূক্ষ্ম চিমটা।
৪। এসিটোন।
৫। ডেসিকেন্টসহ ডেসিকেটর।
৬। বিভিন্ন আকারের সিরিঞ্জ।
৭। টিস্যু হোমোজিনাইজার।
৮। ঢাকনাসহ বড় মুখওয়ালা বোতল।
৯। সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন।
১০। ব্রুডফিশে ট্যাগ লাগানোর জন্য ফিশ ট্যাগিং গান ও ট্যাগ।
১১। তুলা এবং অবচেতনকারী ঔষধ।
১২। পরিমাপক সিলিন্ডার।
১৩। পিটুইটারি গ্রন্থি মাপার জন্য ব্যালান্স।
১৪। পাতিত পানি।
১৫। পেট্রিডিস।
১৬। বড় মুখওয়ালা ফ্লাস্ক।

রক্ষণাবেক্ষণ :

১। পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ এবং পিটুইটারি দ্রবণ তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহারের পরে পাতিত পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে যত্ন সহকারে রাখতে হবে।

২। অব্যবহৃত হরমোন বা পিটুইটারি দ্রবণ যথাযথভাবে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) নিষিক্তকরণ ও চাপ দিয়ে ডিম বের করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণ :

১। প্লাস্টিকের গামলা।

২। প্লাস্টিক দাগ কাটা বালতি।

৩। কেথেডার।

৪। শুকনা পালক।

৫। প্লাস্টিকের মগ

৬। ছিপিসহ প্লাস্টিকের বোতল।

৭। টেবিল, চেয়ার।

৮। ডিসেকটিং বাক্স।

৯। বিভিন্ন আকারের ফানেল।

রক্ষণাবেক্ষণ:

১। কেথেডার সিরিঞ্জ, ডিসেকটিং বক্স, বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার শেষে পরিষ্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য উপকরণ ও কাজ শেষে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ) ডিম ফুটানো এবং পোনা লালন-পালনে ব্যবহৃত উপকরণ :

১। বিভিন্ন ব্যাসের প্লাস্টিক পাইপ।

২। হাপা

৩। থার্মোমিটার।

৪। অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

৫। বৈদ্যুতিক চুলা।

৬। ব্লেন্ডার।

৭। ব্রাশ।

৮। বিকার।

৯। বায়ু প্রবাহের যন্ত্র।

১০। বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর।

রক্ষণাবেক্ষণ:

১। প্লাস্টিক পাইপ, ডিপনেট ও ব্রাশ ব্যবহারের পর জীবাণুনাশক দ্রবণে চুবিয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে।

২। থার্মোমিটার, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) পোনা পরিবহণে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ :

১। অক্সিজেন সিলিন্ডার।

২। বিভিন্ন সাইজের পলিথিন ব্যাগ।

৩। পলিথিন ব্যাগ বাঁধাই-এর জন্য শক্ত সুতলি।

৪। চটের থলে ও কার্টন বক্স।

রক্ষণাবেক্ষণ :

১। বিভিন্ন ব্যাগ, সুতলি ইত্যাদি শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। এছাড়া পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন যোগ করার সময় সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

২। অক্সিজেন সিলিন্ডার ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

চ) হ্যাচারি অথবা মাঠে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ :

১। সেকিডিস্ক।

২। পানি সংগ্রহকারী যন্ত্র।

৩। প্লাঙ্কটন গণনাকারী যন্ত্র।

৪। পিলেট।

৫। প্লাংকট নেট।

৬। বহনযোগ্য নিক্তি।

৭। পানি পরীক্ষার যন্ত্র।

৮। পিএইচ মিটার।

৯। অক্সিজেন মিটার।

১০। রেফ্রিজারেটর।

১১। ডিপ ফ্রিজার।

১২। নমুনা সংরক্ষণের বিভিন্ন আকারের বোতল।

১৩। কোদাল বা বেলচা।

১৪। টুল বক্স।

১৫। মাছের বিভিন্ন প্রকার সম্পূরক খাদ্য ও সুষম খাদ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ :

১। উপরোক্ত যন্ত্রপাতি, হ্যাচারিতে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি আলাদা কক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়।

২। প্রয়োজনবোধে উক্ত কক্ষে বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ কাজ করা যেতে পারে।

৩। মাছের খাবার সংরক্ষণের জন্য আলাদা গুদামঘর প্রয়োজন।

ছ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি :

১। ফরমালিন।

২। ট্যানিক এসিড।

৩। লবণ।

৪। ম্যালাকাইট গ্রিন।

৫। তুঁতে বা কপার সালফেট।

৬। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

৭। সুমিমথিয়ন, ডিপটারেক্স।

৮। বিভিন্ন হরমোন যেমন : কার্প পিটুটারি পাউডার, এইচসিজি, এলএইচ, আরএইচ, সুমাচ ইত্যাদি।

৯। এসিটিক এসিড।

১০। সালফিউরিক এসিড।

১১। রোটেনন।

১২। ইঁদুর মারার বিষ।

১৩। ইউরিয়া।

১৪। টি. এস. পি।

১৫। এম.পি।

১৬। চুন।

১৭। ডিজইনফেকটেন্ট।

রক্ষণাবেক্ষণ :

১। উপরিউক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি অবশ্যই একটি আলাদা কক্ষে সংরক্ষণ করতে হবে।

২। সংরক্ষিত কক্ষে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩। এসব দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪। ঔষধসমূহ রেফ্রিজারেটরে রাখলে ভালো হয়।

প্রশ্নমালা-৭

এক কথায় উত্তর দাও :

১। মৎস্য হ্যাচারি কী?

২। হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কি বুঝায়?

৩। সেকিডিক্স কী?

৪। পেট্রিডিসের ব্যবহার লেখ।

৫। হ্যাচারিতে কী কী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব লেখ।

২। হ্যাচারির প্রয়োজনীয়তা লেখ।

৩। প্রজননকারী মাছ সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামের নাম লেখ ও রক্ষণাবেক্ষণের উপায় লেখ।

৪। ডিম ফুটানো ও পোনা লালন-পালনে ব্যবহৃত উপকরণের নাম সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া লেখ।

৫। হ্যাচারি অথবা মাঠে ব্যবহৃত উপকরণের নাম ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া লেখ।

৬। পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য উপকরণের নাম ও রক্ষণাবেক্ষণের উপায় লেখ।

৭। নিষিক্তকরণ ও চাপ দিয়ে ডিম বের করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণের নাম ও রক্ষণাবেক্ষণের উপায় লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। হ্যাচারি পরিচালার বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা কর।

ব্যবহারিক

জব নং-১

জবের নাম : মৎস্য হ্যাচারির বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মাছের প্রণোদিত প্রজনন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেসব ভৌত সুবিধা যেমন পুকুর, চৌবাচ্চা, হাপা, পানির পাম্প ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এগুলোকে একত্রে হ্যাচারি বলা হয় ।

হ্যাচারির দুইটি অংশ থাকে যথা :

১ । পুকুর অংশ

২ । হ্যাচারি অংশ

১ । একটি হ্যাচারির পুকুর অংশে কতকগুলো পুকুর থাকে যেমন :

ক) ব্রুড মাছ পালন পুকুর

খ) প্রজননোত্তর মাছের পালন পুকুর

গ) আঁতুড় পুকুর

ঘ) নার্সারি পুকুর

২ । হ্যাচারি অংশে কতকগুলো স্থাপন থাকে যেমন :

ক) ওভার হেড ট্যাংক ও পাম্প

খ) বিভিন্ন আকারের চৌবাচ্চা

গ) গোলাকার চৌবাচ্চা

ঘ) ডিম ফোটানোর বোতল

ঙ) অফিস, গুদাম, ল্যাবরেটরি, গার্ডশেড ইত্যাদি

উপকরণ :

ক) মৎস্য প্রজনন করা হয় এমন একটি হ্যাচারি

খ) প্রয়োজনীয় যানবাহন

গ) খাতা, পেন্সিল

কাজের ধাপ :

১ । বিদ্যালয় থেকে নিকটতম দূরত্বের কোনো হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ করে হ্যাচারি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা করে রাখি ।

২ । হ্যাচারি বিভিন্ন অংশের বিবরণ সংবলিত বই-এর তাত্ত্বিক অংশ ব্যবহারিক অনুশীলনের আগে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি ।

৩ । নির্দিষ্ট তারিখে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে গমন করি ।

৪। হ্যাচারির বিভিন্ন অংশ বা অবকাঠামোগুলো এক এক করে পর্যবেক্ষণ করি।

৫। প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথকভাবে শনাক্ত করি এবং ঐ অংশের কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করি।

৬। মৎস্য প্রজনন কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলোর সাথে হ্যাচারির সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর সম্পর্ক চিহ্নিত করি।

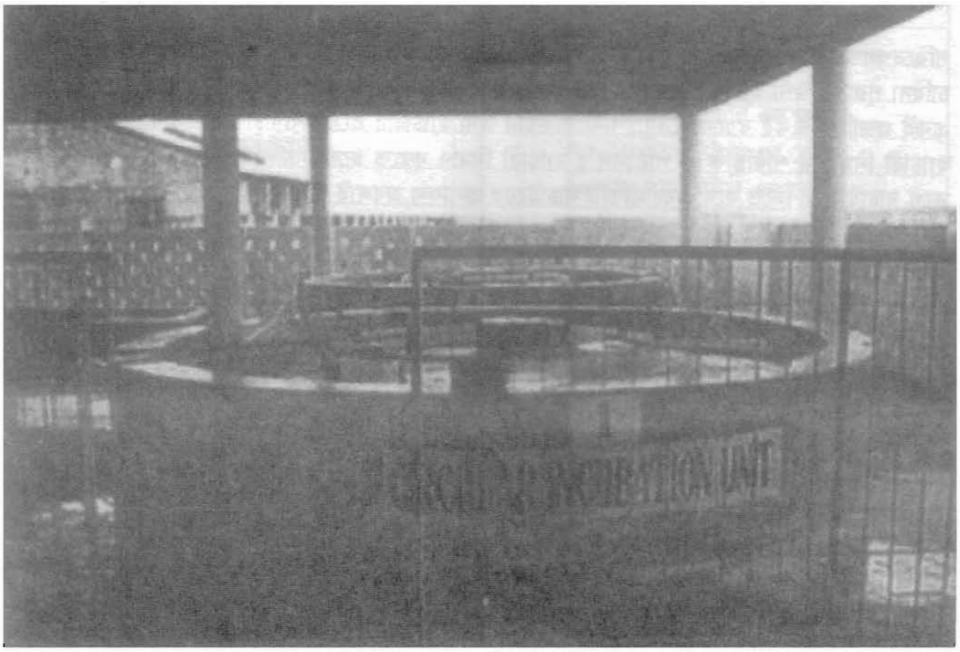

চিত্র : মৎস্য হ্যাচারির অংশবিশেষ

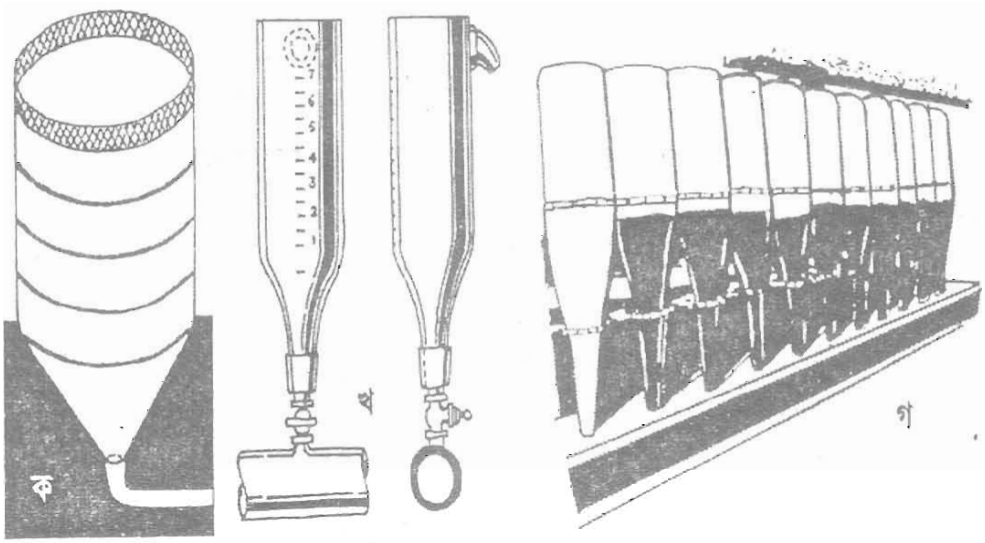

চিত্র : মাছের ডিম ফোটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের বোতল : (ক) ক্লে বোতল; (খ) গ্লাস বোতল এবং (গ) জুগার বোতল

৭। গৃহীত কার্যক্রমগুলো চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

চিত্র : হ্যাচারিতে মাছের প্রণোদিত প্রজননের প্রবাহচিত্র

জব নং -০২

জবের নাম : হ্যাচারির পুকুরে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : মৎস্য প্রজনন হ্যাচারি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় । পরবর্তী ছকে হ্যাচারির পুকুর অংশের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা দেওয়া হলো:

সরঞ্জামের নাম	ব্যবহার
১ । বেড় জাল	১ । ব্রুড মাছ ধরার জন্য ।
২ । গুজরী জাল	২ । চারা পোনা ধরার জন্য ।
৩ । চট জাল	৩ । ধানী পোনা ধরার জন্য ।
৪ । হররা	৪ । পুকুরের তলার গ্যাস দূর করার জন্য ।
৫ । সেকিডিস্ক	৫ । পানির স্বচ্ছতা নির্ণয় করে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ জানার জন্য ।
৬ । পিএইচ মিটার	৬ । পানির পিএইচ মাপার জন্য ।
৭ । ডিও মিটার	৭ । পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন পরিমাপের জন্য ।
৮ । অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি	৮ । পোনা কাটাই করার জন্য ।
৯ । ব্যারেল	৯ । পোনা পরিবহনের জন্য ।
১০ । ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্প	১০ । পানি সেচের জন্য ।

উপকরণ :

১ । হ্যাচারিতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ।

২ । খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি ।

কাজের ধাপ :

১ । নিকটস্থ একটি মৎস্য প্রজনন হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ স্থাপন করি ।

২ । নিদিষ্ট দিনে ও সময়ে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে যাই ।

৩ । হ্যাচারিতে রক্ষিত বিভিন্ন সরঞ্জাম একে একে পর্যবেক্ষণ করি ।

৪ । বিভিন্ন সরঞ্জাম শনাক্ত করি এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করি ।

৫ । ব্যবহারিক খাতায় সরঞ্জামের বর্ণনাসহ ছবি আঁকি ।

৬ । গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন ছবিসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি ।

জব নং-০৩

জবের নাম : প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মাছের প্রণোদিত প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি হ্যাচারিতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। প্রজনন পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রপাতির সম্ভাব্য তালিকা এখানে দেওয়া হলো :

যন্ত্রপাতির নাম	ব্যবহার
১। পেট্রিডিস	১। পিজি গণনার জন্য
২। হামানদিস্তা	২। পিজি গুঁড়া করার জন্য
৩। টিস্যু হোমাজিনাইজার	৩। পিজি গুঁড়া করার জন্য
৪। সেন্ট্রিফিউজাল মেশিন	৪। দ্রবণ থিতানোর জন্য
৫। সূক্ষ্ম ব্যালেন্স	৫। পিজি ওজন করার জন্য
৬। সিরিঞ্জ ও চিকন সূচ	৬। মাছকে ইনজেকশন দেওয়ার জন্য
৭। স্প্রিং ব্যালেন্স	৭। ব্রুড মাছের ওজন দেওয়ার জন্য
৮। স্পঞ্জের প্যাড	৮। ইনজেকশনের সময় মাছকে রাখার জন্য
৯। থার্মোমিটার	৯। পানি ও বাতাসের তাপমাত্রা জানার জন্য
১০। গামছা ও তোয়ালে	১০। মাছ মোছা ও ধরার জন্য
১১। প্লাস্টিকের গামলা ও বালতি	১১। ডিম সংগ্রহ ও স্থানান্তরের জন্য
১২। হাপা ও	১২। রেণু রাখার জন্য
১৩। কাচের বিকার	১৩। রেণু মাপার জন্য

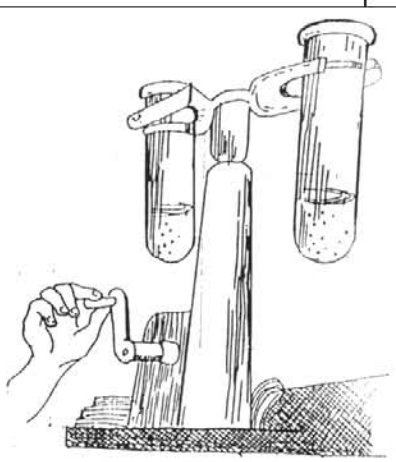

চিত্র : হস্তচালিত সেন্ট্রিফিউজ মেশিন

চিত্র : টিস্যু হোমোজিনাইজার

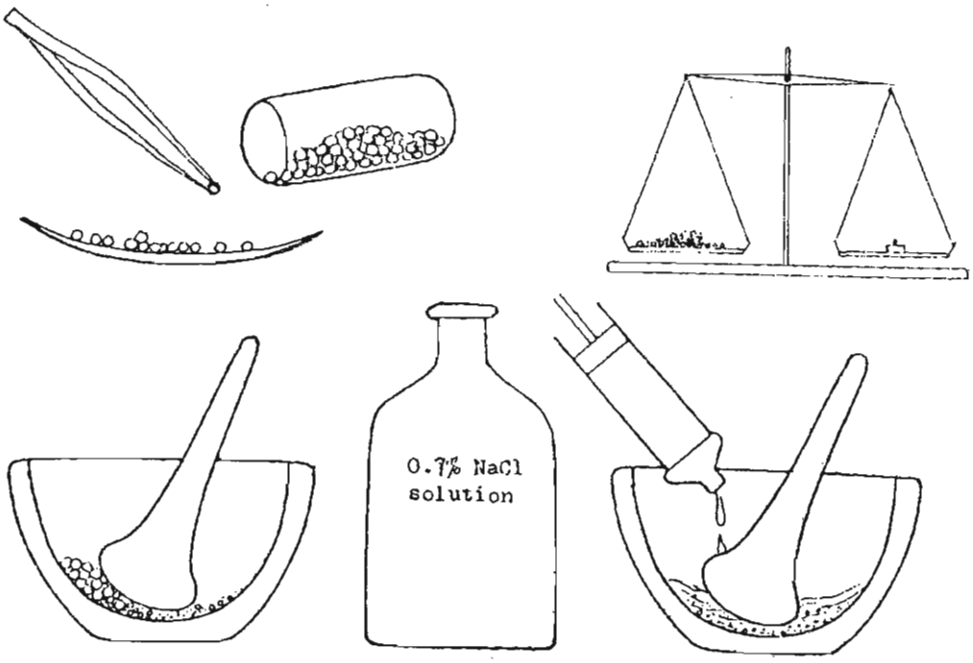

চিত্র ঃ পিজি দ্রবণ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম

উপকরণ : উপরের ছকে বর্ণিত উপকরণ

কাজের ধাপ :

১। ল্যাবরেটরিতে বর্ণিত উপকরণ একে একে পর্যবেক্ষণ করি।

২। যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তায় হাতে কলমে ধারণা লাভ করি।

৩। ব্যবহারিক খাতায় প্রতিটি যন্ত্রের ছবি আঁকি।

৪। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর চিত্র ও প্রতিবেদন ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং- ৪

জবের নাম : প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। একই উপকরণ পরিমিত বা নিয়মমাফিক ব্যবহার করলে মাছ চাষে সফলতা বয়ে আনতে পারে। আবার সেই উপকরণই কম মাত্রায় ব্যবহার করলে তা কার্যকরি নাও হতে পারে আবার বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে মাছ মারাও যেতে পারে। তাই যে কোনো উপকরণ প্রয়োগের সময় অবশ্যই প্রয়োগের উদ্দেশ্য জেনে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এমন কিছু অতীব প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের নাম, প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ মাত্রা নিম্নে দেওয়া হলো :

উপকরণের নাম	প্রয়োগের উদ্দেশ্য	প্রয়োগ মাত্রা
১। অ্যালকোহল	১। পিজি সংরক্ষণের জন্য	শিশির আকার অনুযায়ী
২। এসিটোন	২। পিজি সংরক্ষণের জন্য	শিশির আকার অনুযায়ী
৩। টেরামাইসিন	৩। ব্যাকটেরিয়া নাশকের জন্য	ব্রুড ফিশের জন্য ইনজেকশন হিসেবে ১৫ মিলিগ্রাম/কেজি মাছ/ সপ্তাহ এভাবে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত
৪। কুইনালভিন	ব্রুড মাছ পরিবহনের সময় অবচেতনের জন্য	১:৪০,০০০ পানি (মাছের প্রজাতি ও আকারের উপর নির্ভরশীল)
৫। ডিপটারেক্স	আরগুলোসিস বা মাছের উকুনজনিত রোগের জন্য,পোকা-মাকড় দমনের জন্য	১০গ্রাম/শতাংশ/ফুট পনির জন্য প্রয়োগ করতে হবে
৬। সুমিথিয়ন	আরগুলোসিস বা মাছের উকুনজনিত রোগের জন্য	৩ মিলি লিটার/শতাংশ/ফুট পানির জন্য
৭। ম্যালাকইট গ্রীন	ছত্রাকজনিত রোগের জন্য	২ মিলিগ্রাম/লিটার/সপ্তাহ এভাবে সপ্তাহে ১ বার মোট ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে
৮। ব্লিচিং পাউডার	পানি বিশোধনে চুনের পরিবর্তে ঘোলাত্ব দূর করতে এবং ক্ষতিকর রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয় এবং রাক্ষুসে মাছ দূর করা যায়।	৫০০ গ্রাম/শতাংশ/৫ফুট পানি ১ কেজি/শতাংশ/১ফুট পানিতে
৯। ফরমালিন	হ্যাচারি জীবাণুমুক্ত করার জন্য	২০%

উপকরণ : হ্যাচারিতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি ।

কাজের ধাপ :

১। নিকটস্থ একটি মৎস্য প্রজনন হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ স্থাপন করি অথবা নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে পর্যবেক্ষণ করি ।

২। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে/ল্যাবরেটরিতে যাই ।

৩। হ্যাচারিতে/ল্যাবরেটরিতে রক্ষিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ যেমন : ফরমালিন, ট্যানিক এসিড, লবণ, ম্যালাকাইট গ্রীন, তুঁতে, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, সুমিথিয়ন, বিভিন্ন হরমোন (যেমন - কার্প পিটুইটারি গ্রন্থি, এইচসিজি এল এইচ, আর এইচ, সুমাছ ইত্যাদি) এসিটিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, রোটেনন, ইঁদুর মারার বিষ, ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, পটাশ সার, চুন, ডিজইনফেকটেন্ট ।

৪। বিভিন্ন দ্রব্য শনাক্ত করি এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি ।

৫। ব্যবহারিক খাতায় এগুলোর কাজসমূহ লিখি ।

জব নং ০৫

জবের নাম : বিভিন্ন প্রজাতির প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ শনাক্তকরণ ও বাছাইকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর কৃত্রিম প্রজননের সফলতা নির্ভর করে। মাছ বাছাইয়ের ব্যাপারটি মূলত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বাছাই ও পরিবহনের কাজটি সকাল বেলায় পানির তাপমাত্রা বাড়ার আগেই করতে হবে। নিম্নবর্ণিত উপায়ে পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ মাছের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে ব্রুড মাছ নির্বাচন ও বাছাই করা যায়।

স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
বক্ষ পাখনার উপরিভাগ পিচ্ছিল হবে।	বক্ষ পাখনার উপরিভাগ খসখসে হয়।
স্ত্রী মাছের পেট স্ফীত ও নরম হয়।	পেট স্বাভাবিক হয়।
পায়ুপথ ফুলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল হবে।	পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের হবে।
স্ত্রী মাছের পেট সামান্য চাপে কিছু সংখ্যক ডিম বের হতে পারে।	সামান্য চাপে শুক্র বের হবে।

চিত্র : পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ কাতলা মাছ

উপকরণ :

১। হ্যাচারি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন।

২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পুকুরে নামার জন্য উপযুক্ত পোশাক।

কাজের ধারা :

১। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাধ্যমে নিকটতম কোনো হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ করি।

২। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হ্যাচারিতে পৌঁছি।

৩। ব্রুড মাছের পুকুরে বেড় জাল দিয়ে ব্রুড মাছ ধরি এবং ব্রুড মাছ বাছাই করি।

৪। হ্যাচারির অভিজ্ঞ কর্মীর সহায়তায় বিভিন্ন প্রজাতির ব্রুড মাছের স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুডের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করি।

৫। পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-০৬

জবের নাম : পরিপক্ব ডিম ও নিষিক্ত ডিম শনাক্তকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কার্প হ্যাচারিতে দুই প্রণালিতে ডিম নিষিক্ত হয়।

১। সহজাত বা স্বাভাবিক পদ্ধতি : হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর স্ত্রী মাছকে ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে রাখতে হবে। পুরুষ মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর পৃথক ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে স্ত্রী মাছ হতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে হবে। স্ত্রী মাছের ডিম ছাড়ার ২ ঘণ্টা পূর্বে পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের ব্রিডিং পুলে স্থানান্তর করতে হবে। স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের সাহচর্যে ডিম পাড়বে ও ডিম নিষিক্ত হবে।

২। স্ট্রিপিং পদ্ধতি : হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর স্ত্রী মাছকে ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে রাখতে হবে। পুরুষ মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর পৃথক ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে স্ত্রী মাছ হতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে হবে। ডিম পাড়ার সঠিক সময়ে স্ত্রী মাছ ধরে পেটে সামান্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পাত্রে ডিম সংগ্রহ করতে হবে। এরপর পুরুষ মাছের পেটে চাপ দিয়ে মিল্ট পূর্বে সংগৃহীত ডিমের উপর ফেলতে হবে এবং মুরগির নরম পালক দিয়ে মিল্টকে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে ডিমকে নিষিক্ত করতে হবে। নিষিক্ত ডিমকে পরিমাপ করে হ্যাচিং জার অথবা হ্যাচিং পুলে পানির স্রোত ও ফোয়ারার মধ্যে স্ফুটনের জন্য রাখতে হবে।

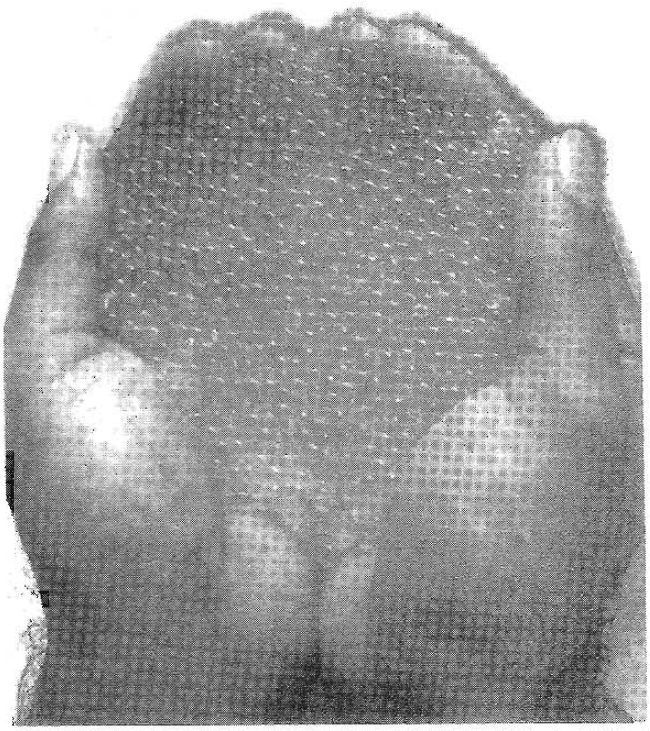

চিত্র হাতের মধ্যে ডিম

উপকরণ :

১। প্রজনন চালু আছে এমন হ্যাচারিতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন।

২। আতশ কাঁচ

৩। খাতা কলম ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১। প্রজনন কার্যক্রম আছে এমন হ্যাচারির সাথে আগে যোগাযোগ রাখি।

২। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে যাই।

৩। সহজাত পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্রুড মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেওয়ার ৪-৬ ঘণ্টা পর থেকে সার্কুলার ট্যাংকে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের কার্যাবলি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি। এক্ষেত্রে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ার পর পুরুষ মাছ শুক্রাণু ছেড়ে তা নিষিক্ত করে।

৪। চাপ পদ্ধতিতে ব্রুড মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেওয়ার পর ৪-৬ ঘণ্টা পর থেকে স্ত্রী মাছের পেটে চাপ দিয়ে পরিষ্কার গামলায় ডিম সংগ্রহ করি এবং পুরুষ মাছের শুক্র ডিমের উপর দিয়ে পালক দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিষিক্ত করি।

৫। সাদা থালায় কয়েকটা ডিম আতশ কাচ দিয়ে ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করি এবং খাতায় ছবি আঁকি।

৬। গৃহীত পর্যবেক্ষণের ছবিসহ ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

জব নং-০৭

জবের নাম : ব্রুড মাছের ঘনত্ব নির্ধারণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ব্রুড মাছের ডিমের পরিপক্বতা বহুলাংশে নির্ভর করে মজুদ ঘনত্বের ওপর। কিছুটা কম হারে মাছ মজুদ করলে পুকুরে খাদ্যের অভাব হয় না। ফলে সব মাছের ডিম্বাশয়ের ও শুক্রাশয়ের পরিপক্বতা নিশ্চিত হয়। সাধারণত শতাংশ প্রতি ৬-৭ কেজি মাছ মজুদ করা হয়। বড় ধরনের পুকুরে শতাংশপ্রতি ৫ কেজি ব্রুড মাছ পালন করলে দ্রুত ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতা আসে এবং বেশি রেণু পোনা পাওয়া যায়। পুকুরের সর্বস্তরের খাবার ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্তরের বিচরণশীল বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। নিম্নবর্ণিত হারে ব্রুড মজুদ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাছের প্রজাতি	মজুদের হার
সিলভার কার্প	২০%
কাতলা	১০%
রুই	৩৫%
মৃগেল	২৫%
গ্রাসকার্প	৫%
সরপুঁটি	৫%
মোট	১০০%

উপকরণ :

১। হ্যাচারি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন।

২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পুকুরে নামার জন্য উপযুক্ত পোশাক।

কাজের ধাপ:

১। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাধ্যমে নিকটতম কোনো হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ করি।

২। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হ্যাচারিতে পৌঁছি।

৩। হ্যাচারি মালিক নিয়োজিত লোকের কাছ থেকে ব্রুড মাছের ঘনত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি।

৪। অধিক ঘনত্বের কুফল এবং সঠিক ঘনত্বের সুফল জেনে কয়েকটি পুকুরে জাল টেনে ও পুকুরের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে এর সত্যতা পর্যবেক্ষণ করি।

৫। পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-০৮

জবের নাম : কার্প জাতীয় ব্রুড মাছের খাদ্য প্রস্তুতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ। কারণ পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের পুষ্টি চাহিদার পুরোটাই জোগান দিতে পারে না। আর প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ব্রুড মাছের কতকগুলো খারাপ লক্ষণ দেখা যায়।

ক) ব্রুড মাছের ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয়।
খ) মাছের ডিমের সংখ্যা বা Fecundity কমে যায়।
গ) ডিমের আকার ছোট হয়।
ঘ) ডিমের গুণাগুণ নিম্নমানের হয় ফলে ডিমের পরিস্ফুটন হার কমে যায়, রেণু পোনা বেঁচে থাকার হার কমে যায়।

সম্পূরক খাদ্য নিম্নলিখিত উপাদান দিয়ে তৈরি করা যায় :

উপাদান	শতকরা হার
গমের ভুসি/চালের কুঁড়া (অটোরাইস)	৪৫%
তৈল বীজের খৈল	৩০%
মৎস্য চূর্ণ	১৫%
আটা	৫%
চিটাগুড়	৪%
ভিটামিন	১%
মোট	১০০%

উপরোক্ত উপাদানের সাথে এমবাভিট এল প্রতি ১০০ কেজির জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করলে ডিমের পরিপক্বতা ভালো হয়। এসব উপাদান একত্রে মিশিয়ে খাদ্য বল বা পিলেট আকারের খাদ্য তৈরি করে মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে দিনে দুইবার প্রয়োগ করতে হবে। শীত মৌসুমে শতকরা ১-১.৫ ভাগ হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। গ্রাস কার্প সরপুঁটির জন্য নরম ঘাস, কুটি পোনা, তরিতরকারির বর্জ্যপাতা কুচি কুচি করে কেটে মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ২০-২৫ ভাগ দৈনিক পুকুরে দেওয়া আবশ্যক।

গমের ভূষি চালের কুঁড়া খৈল খাদ্যবল তৈরি

২০২০

ট্রে-তে খাদ্যবল প্রয়োগ

উপকরণ :

১। গমের ভুসি/চালের কুঁড়া (অটোরাইস)

২। তৈল বীজের খৈল

৩। মৎস্য চূর্ণ

৪। আটা

৫। চিটাগুড়

৬। ভিটামিন

৭। প্লাস্টিকের গামলা ও মগ

৮। ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা

কাজের ধাপঃ

১। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাধ্যমে নিকটতম কোনো হ্যাচারির মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ করে রাখি।

২। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হ্যাচারিতে পৌঁছি।

৩। হ্যাচারি মালিক নিয়োজিত লোকের কাছ থেকে কোনো একটি ব্রুড পুকুরের আয়তন ও ব্রুড মাছের ঘনত্ব পরিমাণ ও সংখ্যা জেনে নিই।

৪। ব্রুড মাছের ওজন হিসাব করে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে বল তৈরি করি।

৫। এসব বল খাদ্যদানী বা ফিডিং ট্রেতে করে পুকুরে প্রয়োগ করি। অতিরিক্ত পরিমাণ বল আকৃতির খাদ্য রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করি।

৬। গৃহীত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-০৯

জবের নাম : ব্রুড মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ব্রুড মাছ রোগাক্রান্ত হলে তা ডিমের পরিপক্বতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া । তাই মাছ যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। আমাদের দেশে সাধারণত আরগুলাস বা মাছের উকুন দ্বারা ব্রুড মাছ বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তা রুই মাছের বেলায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্রুড মাছ আরগুলাস দ্বারা আক্রান্ত হলে দ্রুত প্রতিকার করা উচিত। এ রোগ প্রতিকারের জন্য ০.৫ পিপি এম হারে ডিপটারেক্স বা ০.২৫ পিপিএম হারে সুমিথিয়ন পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। এ ঔষধ সপ্তাহে ১ বার করে পরপর তিন সপ্তাহ প্রয়োগ করতে হবে

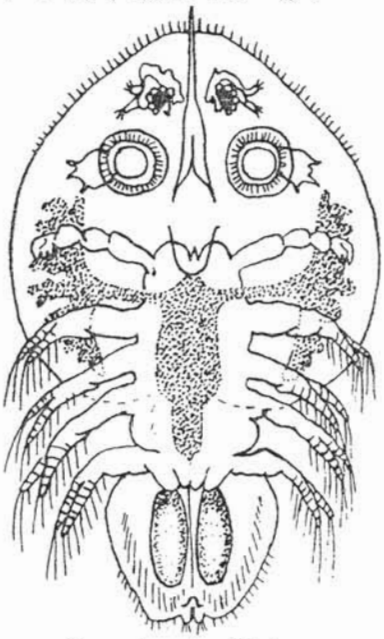

চিত্র : আরগুলাস ফলিয়াসেস

উপকরণ :

১। হ্যাচারি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন।

২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পুকুরে নামার জন্য উপযুক্ত পোশাক।

কাজের ধাপ:

১। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাধ্যমে নিকটতম কোনো হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ করে রাখি।

২। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হ্যাচারিতে পৌঁছি।

৩। হ্যাচারি মালিক নিয়োজিত লোকের কাছ থেকে ব্রুড মাছের রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবগত হই।

৪। সাবধানতা অবলম্বনের জন্য একটি ব্রুড পুকুরে জাল টেনে উকুন রোগে আক্রান্ত মাছ আছে কিনা পরীক্ষা করি।

৫। রোগাক্রান্ত মাছ থাকলে ০.৫ পিপিএম হারে ডিপটারেক্স পুকুরে প্রয়োগ করি।

৬। পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-১০

জবের নাম : প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ পর্যবেক্ষণ ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

নদীমার্তৃক বাংলাদেশের নদীগুলোই কার্প জাতীয় মাছের রেণু পোনার উৎস । বর্ষাকাল (মে-আগস্ট) দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো থেকে কোটি কোটি রেণু পোনা ধরা হয় । নদী থেকে রেণু পোনা ধরার কাজে কয়েকজন জেলে মিলে একটি দল গঠন করে থাকে । পোনা ধরার জন্য বিশেষ এক ধরনের জাল ব্যবহার করা হয় । যাকে সাভার জাল বলে । জালের দৈর্ঘ্য ৩০০-৩৬০ সে.মি. জালের মুখ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ২৪০-৩০০ সে.মি. শেষের খোলা মুখ ১৫-২২ সে.মি. এর মতো গোলাকার অঙ্গুরি থাকে । অবশেষে গামছা থাকে ৭৫-৯০ সে.মি. মাপের । ২টি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে জাল খাটানো হয় । পিছনে ২টি বাঁশের খুঁটি থাকে । গামছার শেষ অংশে ২টি বাঁশের খুঁটি থাকে । জালের বড় মুখ স্রোতের দিকে থাকে । পানির স্রোতের সাথে ডিম পোনা জালের মধ্যে আসে, পানি বেরিয়ে যায়, রেণুপোনা আবদ্ধ হয় । জালের শেষের দিকে ছোট গোলাকার খোলা মুখ থাকে তাতে বাঁশের বা বেতের তৈরি একটি গোল ধরনের অঙ্গুরি থাকে এবং রেণু পোনা ধরে রাখবার জন্য গামছাটি চতুষ্কোণ করে সাজানো হয় । যাতে অঙ্গুরির মধ্যে দিয়ে রেণু পোনা এসে গামছায় জড়ো হয় এবং বেঁচে থাকে । গামছা উঠিয়ে মাঝে মাঝে রেণু পোনা এনে হাঁড়ির উপর ঘন জালের ছাঁকনি বিছায়ে ঢালা হয় । এতে রেণু পোনার সাথে যদি অন্যান্য ছোট মাছ বা ময়লা থাকে তা ছাঁকানি দিয়ে বাদ করা যায় । তারপর জীবিত রেণু পোনা সাময়িকভাবে হাপাতে জমা করা হয় । নদীর কিনারের দিকে যেখানে রেণু পোনা ধরা পরার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে এরকম অনেক জাল পরপর খাটানো হয় এবং রেণুপোনা সংগৃহীত হয়। বহু জেলে সাময়িকভাবে নদী থেকে রেণুপোনা ধরার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে ।

আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ জাল দিয়েই পোনা সংগ্রহ করা হয় বেশি এবং এই জাল দিয়ে পোনা সংগ্রহ করা খুবই সহজ ও যে কেউ সহজে পোনা ধরতে পারে । এই জাল তৈরি করা খুবই সহজ এবং ব্যয় কম । আমাদের দেশে বর্ষাকালে বা মাছের প্রজনন মৌসুমে দেশের সমুদ্রের মোহনায়, নদীর কিনারায়, প্লাবন ভূমি, বিল প্রভৃতি স্থানে পোনা সংগ্রহ করা হয় । এই জাল তিনটি বাঁশের অংশ দ্বারা ত্রিভুজ আকৃতির একটি ফ্রেম প্রথমে তৈরি করা হয় যার একটি বাঁশ লম্বা থাকে এবং হাতলের কাজ করে । এরপর সূক্ষ্ম নাইলনের জাল বা সাইন নেটের জাল ৪ কোনাকৃতির লম্বা করে তৈরি করা হয় । যার পেছনের পার্শ্ব সরু এবং সামনের অংশ প্রশস্ত থাকে । জালের প্রশস্ত অংশটি ফ্রেমের সাথে চিকন নাইলনের সুতা দ্বারা বাঁধা থাকে । যাতে ফাঁকা না থাকে । চার মাথায় চারটি লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে । পোনা ধরার সময় জালের ফ্রেমসহ প্রশস্ত অংশটি অগভীর জলাশয়ের নিচে রাখা হয় । জালের তিন ভাগ পানির নিচে থাকে এ অবস্থায় জালের পিছনের অংশ স্রোতের দিকে বা টানার বিপরীত দিকে টানটান করা অবস্থায় বা লম্বা অবস্থায় থাকে । সুতা চারটি এক এক করে একত্র করে এবং নিচের সুতা দুটি একটু ঢিল দিয়ে উপরের অংশ দুটি ধরে ক্রমান্বয়ে টানতে হয় । এভাবে জাল টানার ফলে পোনা সহজেই ফ্রেমের মধ্য দিয়ে জালের শেষ প্রান্তে গিয়ে আটকে যায় । কিছু সময় পর জালের মধ্য হতে নির্দিষ্ট প্রজাতির পোনা সংগ্রহ করে পোনা হাঁড়িতে রাখতে হয় । কিন্তু নদ-নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাঁধ তৈরির মাধ্যমে মাছের চলাচলের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, প্রজননক্ষম মাছের অতি আহরণ এবং মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন- কৃষি জমিতে কিটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, পানি দূষণ, কারেন্ট জালের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এসব মাছের পোনার উৎস ধ্বংসের মুখে । এখন এসব স্থানে খুব সামান্য পরিমাণ মাছের পোনা পাওয়া যায় । আর তাই মানুষ এখন মাছ চাষের জন্য হ্যাচারির পোনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ।

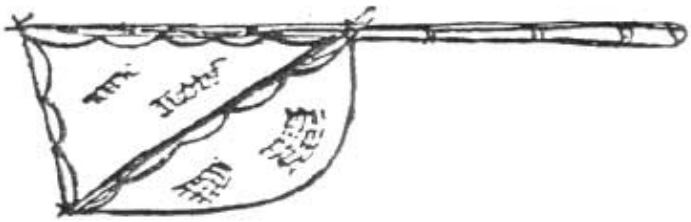

চিত্র : টানা জাল

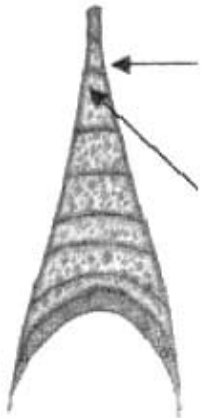

চিত্র : বেহুন্দী জালা

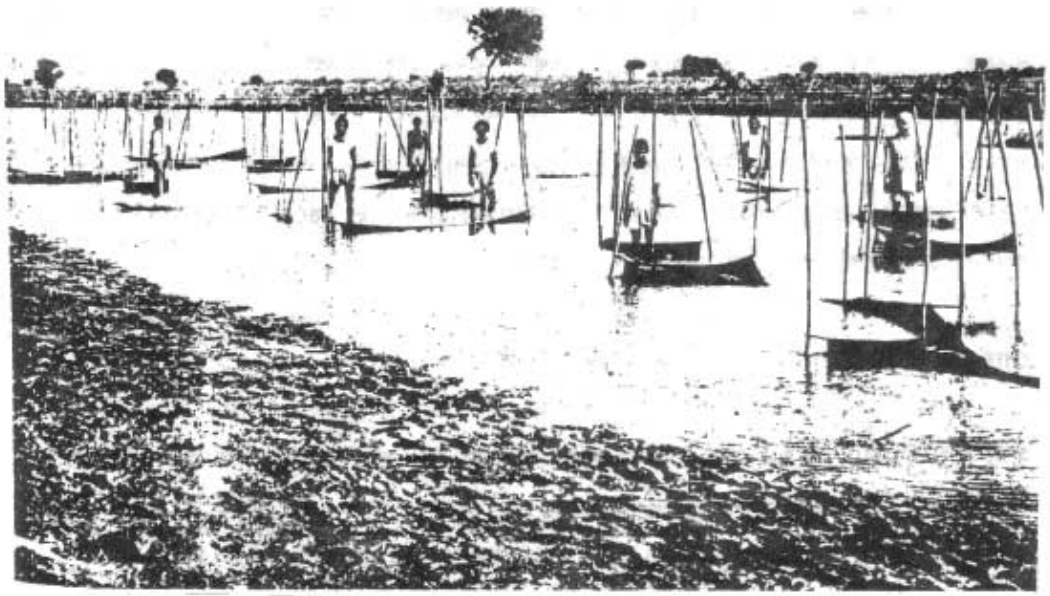

চিত্র : নদী থেকে রুই-কাতলা মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ

কাজের ধারা :

১। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা ধরা হয় এমন একটি স্থান নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট জেলের দলের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখি।

২। নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণি শিক্ষকসহ নির্দিষ্ট স্থানে যাই।

৩। পোনা ধরার বিভিন্ন জাল যেমন বেহুন্দি জাল, টানা জাল তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা নেই।

৪। প্রাকৃতিক উৎস থেকে আগের মতো পোনা না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে অবগত হই।

৫। গৃহীত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়
ব্রুড মাছ পালন, রেণু ও ধানী পোনা উৎপাদন পরিকল্পনা

ব্রুড মাছ বলতে প্রজননে উপযোগী পরিপক্ক বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে বুঝায়। প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নত মাছের পোনা উৎপাদনে ব্রুড মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে ষাটের দশকে কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন শুরু হয়। তবে আশির দশকে ইহা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক উৎসের প্রজনন ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উপর এ দেশের মৎস্য চাষ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে উন্নত পোনার অভাব যথেষ্ট লক্ষণীয়। বর্তমানে অভিযোগ পাওয়া যাচেছ যে, হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা থেকে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। কারণ হিসেবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা, প্রজননে ছোট আকৃতির ব্রুডের ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রজাতির সংকরায়ণই প্রধানত দায়ী। এ সমস্যা নিরসনে অন্তঃপ্রজননমুক্ত উন্নত ব্রুড নির্বাচন ও সঠিক ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন।

প্রণোদিত প্রজননে ব্রুড মাছের গুরত্ব :

প্রণোদিত প্রজননে সফলতার প্রধান সোপান হচ্ছে ব্রুড মাছ। ব্রুড মাছকে হ্যাচারির প্রাণ বলা হয়ে থাকে কারণ প্রণোদিত প্রজননের সফলতার পুরোটাই নির্ভর করে মাছের প্রজনন পরিচর্যা ও রক্ষণবেক্ষণের উপর। তাছাড়া যত্নের উপর প্রজননকারী মাছের পরিপক্বতা, ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি এবং প্রণোদিত প্রজননে সাড়া দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, মাছের ডিম ছাড়ার হার, নিষেকের হার, ডিম ফোটার হার এবং পোনার বেঁচে থাকার হারও প্রজননকারী মাছের যত্ন ও পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। তবে স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা উচিত। সুস্থ, সবল, বড় আকারের দ্রুতবর্ধনশীল মাছ, ব্রুড হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত ৩টি ধাপে ভাগ করা যায় :

১। মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা
২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১। মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা :

ক) পুকুর নির্বাচন :

ব্রুড মাছের পুকুরের আয়তন ০.৫০ একর থেকে ১ একর হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুকুরে পানির গভীরতা ১.৫-২ মিঃ (৫-৭ ফুট) থাকতে হবে। পুকুরে পানি সরবরাহ ও নির্গমনের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। পুকুরের

তলদেশের মাটি এটেল বা দোঁআশ এবং কাঁদার পরিমাণ ১০-১৫ সে.মিঃ হওয়া উচিত। পুকুর এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকে। জাল টানার সুবিধার জন্য আয়তকার পুকুর অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে বেশি হওয়া ভালো।

খ) পাড় মেরামত ও তলদেশের কাদা তোলা :

পুকুরে অতিরিক্ত কাঁদা নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকারক গ্যাস সৃষ্টি হয়।

ii) পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস পায়।

iii) পানির দূর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে।

iv) স্ত্রী মাছের ডিম্ব কোষ বৃদ্ধিতে ক্ষতি সাধন।

v) পুরুষ মাছের শুক্রাণু সৃষ্টিতে ক্ষতি সাধন।

vi) মাছ আহরণে সমস্যা হয়।

পুকুরে পাড় ভাঙ্গা থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) পাড় ভাঙা থাকলে, মাছ বের হয়ে যেতে পারে।

ii) বিষাক্ত পানি ঢুকে মাছ মারা যেতে পারে।

iii) বাহির থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে ঢুকতে পারে।

iv) মৎস্যভূক প্রাণী সহজে ঢুকতে পারে ইত্যাদি।

গ) জলজ আগাছা দূর করা :

জলজ আগাছা নিম্নোক্ত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) জলজ আগাছা পুকুরে থাকলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য কম তৈরি হয়।

ii) ক্ষতিকর প্রাণী যেমন : সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে পারে।

iii) জলজ আগাছা পুকুরের পুষ্টিকর দ্রব্য শোষণ করে নেয়।

iv) জলজ আগাছা ব্রুড মাছের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই সব ধরনের জলজ আগাছা দূর করতে হবে।

ঘ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা :

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে থাকলে নিম্ন লিখিত সমস্যার সৃষ্টি হয় :

i) চাষকৃত মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে।

ii) চাষকৃত মাছের জায়গা দখল করে নেয়।

iii) প্রজনন করে মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে ফেলে।

iv) মাছকে আহত করতে পারে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ তিনভাবে দমন করা যায় :

i) বার বার জাল টেনে

ii) রোটেনন প্রয়োগ করে ।

প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করতে হয় ।

iii) পুকুর শুকিয়ে

ইহা রাক্ষুসে অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি । এ ক্ষেত্রে পুকুর রোগজীবাণু মুক্ত হয়, উর্বরতা বৃদ্ধি পায় । এই কাজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে করলে খরচ কম হয় ।

ঙ) চুন প্রয়োগ :

চুন প্রয়োগে নিম্নলিখিত উপকার হয় :

i) চুন মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করে ।

ii) মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর করে ।

iii) জৈব পদার্থের পচন ত্বরান্বিত করে ।

iv) মাটি থেকে ক্ষতিকর গ্যাস দূর করে দেয় ।

v) মাটির পিএইচ ওঠা-নামাকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

vi) রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে ।

পুকুর শুকানোর পরপর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রৌদ্রোজ্জ্বল সময়ে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে । চুন প্রয়োগের পরপর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে ।

চ) সার প্রয়োগে :

সার প্রয়োগের মাত্রা : প্রতি শতকে : পুকুরপ্রস্তুত কালে :

সারের নাম	মাত্রা/শতাংশ
ইউরিয়া	২৫০ গ্রাম
টি.এস.পি	৫০০ গ্রাম
এম.পি	১২০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৮০০ গ্রাম
গোবর	৬০০০-৯০০০ গ্রাম

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর রাসায়নিক সার ও গোবর উপরোক্ত মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে । এর ৪-৫ দিন পর হররা বা জাল টেনে তলদেশের মাটি নড়াচড়া করে ভিজানো খৈল পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে ।

ছ) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। এক্ষেত্রে পানির রং হালকা সবুজ অথবা বাদামি হতে পারে। পানিতে ফাইটোপ্লাংক্টন বেশি থাকলে পানির রং হালকা সবুজ হয় এবং পানিতে জুপ্লাংক্টন বেশি থাকলে পানির রং বাদামি হয়। তিন ভাবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায়।

(i) গামছা-গ্লাস পরীক্ষা সাহায্যে

(ii) সেক্কিডিস্কের সাহায্যে

(ii) হাতের সাহায্যে

জ) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা : পুকুরে রোটেননের সাহায্যে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা হলে এর বিষাক্ততা সাধারণত ৭ দিন পর্যন্ত থাকে। এর পরও সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মাছ ছাড়ার আগে কিছু পরিমাণ মাছ ঐ পানিতে ২৪ ঘণ্টা রেখে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যায়।

ঝ) হররা বা জাল টানা : পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত বা ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার জন্য হররা বা জাল টানতে হয়।

২। মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা :

ক) প্রজাতি নির্বাচন :

কৃত্রিম প্রজননের সফলতা বহুলাংশে ব্রুড মাছের সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত হ্যাচারিতে বাণিজ্যিকভাবে কার্প জাতীয় মাছ যেমন- কাতলা, রুই, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও এবং থাই সরপুঁটি মাছের প্রজনন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন হ্যাচারিতে পাঙ্গাশ মাছের প্রজনন করানো হয়ে থাকে। এলাকা ভিত্তিক রেণুর চাহিদার উপর ভিত্তি করে ব্রুডের প্রজাতি নির্বাচন করা উচিত।

খ) ব্রুড মাছ সংগ্রহ :

(i) প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ :

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত ব্রুড অন্তঃপ্রজনন মুক্ত, স্বাস্থ্যবান, দ্রুত বর্ধনশীল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। সংগৃহীত প্রাকৃতিক উৎসের মজুদ থেকে সঠিকভাবে ব্রুড বাছাই ও প্রতিপালনের পর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে পোনা পাওয়া যায় সেগুলো দ্রুত বর্ধনশীল উন্নত মানের পোনা। প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ করেও ব্রুড তৈরি করা যায়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত রেণু অসংখ্যা পৃথক পিতা-মাতা থেকে উৎপাদিত বিধায় উন্নত গুণগত মান বজায় থাকে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন সময়ে রেণু পোনা সংগ্রহ করে সেখান থেকে স্বাস্থ্যবান দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে উন্নত ব্রুড স্টক তৈরি করা যায়। ব্রুড স্টক তৈরি করার জন্য পোনাগুলোকে আলাদাভাবে প্রতিপালন করে তার মধ্যে থেকেই দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্বাস্থ্যবান পোনাকে বাছাই করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই একই ব্রুড স্টককে ৪-৫ বছরের বেশি প্রজননে ব্যবহার করা উচিত নয়। শুরু থেকেই এ সকল কাজ গুরুত্ব সহকারে সতর্কতার সাথে আন্তরিকভাবে সম্পাদন করা উচিত।

(ii) পুকুর থেকে সংগ্রহ :

অন্তঃপ্রজনন মুক্ত উন্নত ব্রুড হতে হ্যাচারিতে উৎপাদিত নিজস্ব পোনা থেকে বিক্রয়ের পূর্বে স্বাস্থ্যবান এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড স্টক তৈরির জন্য রাখা উচিত। সংগৃহীত পোনা যেন ভাই-বোন বা নিকট আত্মীয় না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে যারা দ্রুত বর্ধনশীল হবে তাদের পর্যায়ক্রমিকভাবে এক বছর বয়সের মাছ থেকে উন্নত মাছগুলোকে ব্রুড স্টক তৈরিতে ব্যবহৃত করা হয়। বয়স্ক, রোগগ্রস্ত, স্বাস্থ্যহীন ব্রুড স্টককে প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এদের থেকে উৎপাদিত মাছের পোনা গুণগত বৈশিষ্ট্য খুবই নিম্নমানের হবে এবং পরবর্তীতে ব্যাপক কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় হবে।

(iii) ব্রুড প্রতিস্থাপন :

ব্রুড মাছ ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর কিছু না কিছু ব্রুড নষ্ট হয়। এগুলো পূরণের জন্য ২/১টি পুকুরে প্রাকৃতিক উৎসের কিংবা অন্য কোনো দূরবর্তী স্থান থেকে সংগৃহীত মান সম্পন্ন পোনা প্রতিপালনের সংস্থান রাখতে হবে। এই পোনা থেকে দ্রুতবর্ধনশীল ও স্বাস্থ্যবান মাছগুলো পরিত্যক্ত ব্রুড মাছ এর বদলে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। বিদেশি প্রজাতির মাছগুলো দীর্ঘদিন আগে এদেশে আনা হয়েছে। এগুলোর অন্তঃপ্রজনন ঘটার ফলে গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা সরকারের সহায়তায় বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশ থেকে নতুন ব্রুড মাছ আনার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি।

(iv) ব্রুড ব্যাংক থেকে :

ব্রুড ব্যাংক হলো এমন একটি স্থান যেখানে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ বা উন্নত জাতের পোনা উৎপাদনের জন্য বিপুল সংখ্যক মাছকে প্রাকৃতিক উৎস হতে, বিদেশ থেকে আমদানি করে, পুকুরে বা হ্যাচারিতে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। যেখান থেকে হ্যাচারি মালিকগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী পোনা সংগ্রহ করতে পারে সেই স্থানকে ব্রুড ব্যাংক বলে।

গ) টেকসইকরণ :

মাছকে প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে টেকশইকরণ বলে। ব্রুড মাছ পরিবহনের সময় মাছ তার পেটের ভিতরের খাদ্য মলত্যাগ বা বমি করে পানি যেন দূষিত করতে না পারে সেজন্য পরিবহনের আগে মাছকে জাল টেনে হাপা বা হাউজে রেখে, পানির ঝাঁপটা দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত মাছকে অভুক্ত রেখে টেকসইকরণ করতে হয়।

ঘ) ব্রুড মাছ পরিবহন

ব্রুড মাছ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিবহন করা উচিত। পরিবহনের সময় মাছ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। ব্রুড মাছ পরিবহনের আগে টেকসইকরণ জরুরি। এক্ষেত্রে জাল টেনে পানির ঝাঁপটা দিয়ে এবং ব্রুড মাছকে ৪৮ ঘণ্টা অভুক্ত রেখে টেকসইকরণ করা যেতে পারে। পরিবহনের পূর্বে মাছ বাছাই এর কাজটি সকালবেলা সেরে ফেলা ভালো কারণ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মাছ বাছাই এর সময় বেশিক্ষণ উচ্চ তাপমাত্রায় পানিতে থাকার ফলে মাছের দেহে চাপ পড়ে। এতে করে প্রজননে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

দুই ধরনের পদ্ধতিতে ব্রুড মাছ পরিবহন করা হয় যেমন :

১। উন্মুক্ত বা খোলা পদ্ধতি

২। বদ্ধ পদ্ধতি।

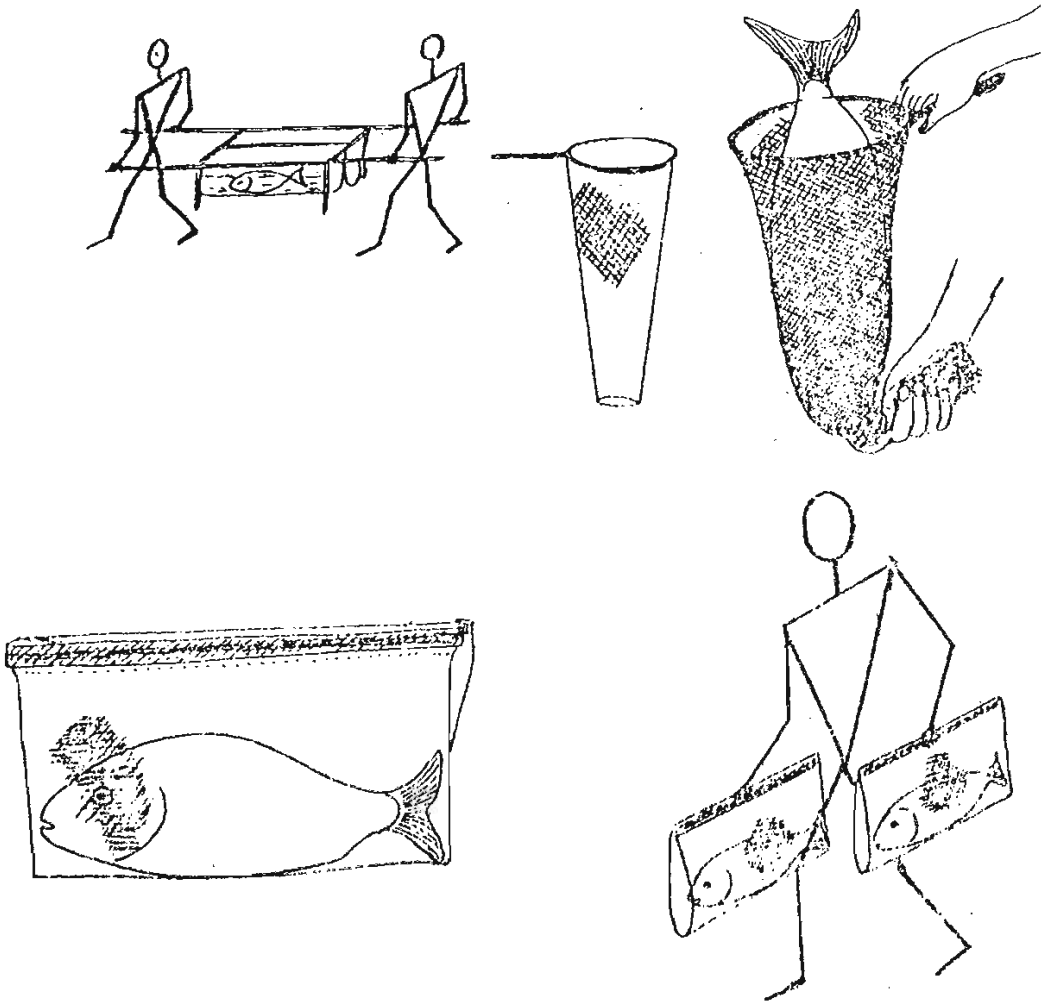

চিত্রঃ দুই মুখ খোলা হাতজাল ও কাপড়ের ব্যাগে করে ব্রুড মাছ নেওয়া হচ্ছে

১। উন্মুক্ত পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে পাত্রের উপরের দিক বা মুখ খোলা থাকে। এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতেও পারে আবার নাও পারে। প্রয়োজনে সময় সময় পানি বদল করে দেওয়া যায়। পুকুর হতে হ্যাচারি দূরবর্তী স্থানে হলে পরিবহন ট্যাংকের মাধ্যমে ব্রুড মাছ পরিবহন করা উচিত। সাধারণত ট্রলি বা খোলা জীপের ওপর ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে ব্রুড মাছ পরিবহন অত্যন্ত নিরাপদ। মাছ পরিবহনের সময় পরিবহন ট্যাংকের ভিতরে পলিথিন ব্যাগ ঢুকিয়ে তার মধ্যে মাছ পরিবহন করা উচিত। তাছাড়াও কোনো কোনো স্থানে মোটা কাপড় বা ত্রিপলের তৈরি বিভিন্ন আকারের উন্মুক্ত পাত্র বিশেষ ধরনের

২০২০

ধাতব নির্মিত ফ্রেমে আটকিয়ে রেখে ব্রুড মাছ পরিবহন করা হয়। এসময় ব্যাটারিচালিত এরেটরের সাহায্যে পানিত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ব্রুড মাছ পরিবহনের সুবিধা হলো মাছ কম আহত হয় এবং পানি তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা থাকে। সাধারণত এ ধরনের পাত্রের আকার এক মিটার ব্যাস এবং ১.২৫ মিটার গভীর হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পদ্ধতিতে ব্রুড মাছ পরিবহন করা হয়।

২। বদ্ধ পদ্ধতি : সাধারণত স্বল্প দূরত্বের ব্রুড মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে ব্রুড মাছ স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগের পরিমিত পরিমাণ পানি নেমে ৫-৬ কেজি ব্রুড মাছ রাখা হয়। মাছের মাথা পলিথিন ব্যাগের নিচের দিকে রাখতে হবে। তারপর মাছসহ পলিথিন ব্যাগে ভেজা বস্তার ভিতর ঢুকিয়ে অতি দ্রুত পরিবহনের কাজ সমাধান করতে হবে। তাছাড়া দূরবর্তী স্থানে ব্রুড মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতে বিভিন্ন আকারের পাত্রের নক্সা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ধরনের একটি পাত্রে একত্রে ৬০ কেজি ব্রুড মাছ পরিবহন করা যায়। পাত্রে প্রতি কেজি মাছ পরিবহনের জন্য ৪-৫ লিটার পানি থাকতে হবে। সাধারণত মাছগুলোকে মোটা পলিথিন ব্যাগে করে পরিবহন করা হয়। ব্যাগে যাতে ফেটে না যায় সেজন্য কাঠের বা মোটা কাগজের তৈরি বাক্সে রাখা হয়। পরিবহনকালে প্রয়োজনে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে।

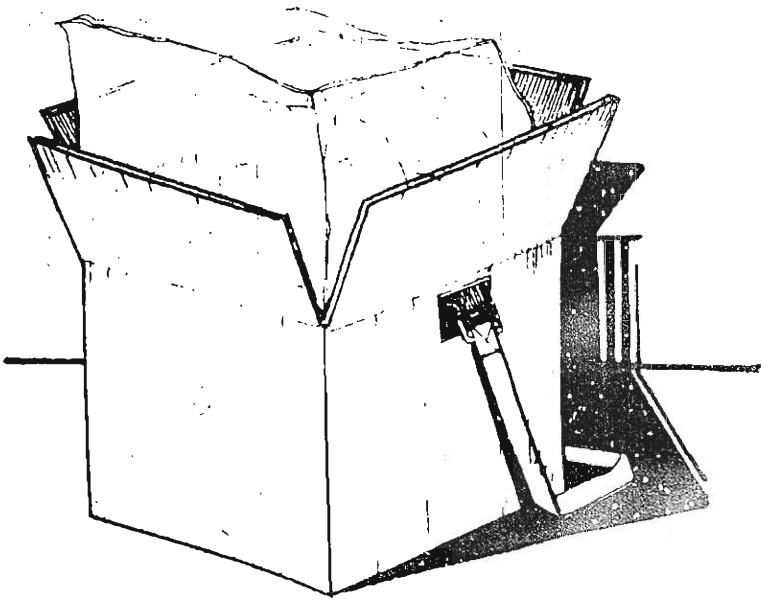

চিত্র : ব্রুড মাছ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত মোটা কাগজের তৈরি বাক্স

ব্রুড মাছ পরিবহনকালে ব্যবহৃত অবচেতনকারী ঔষধসমূহ :

ব্রুড মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে মাছকে অবচেতন করা আবশ্যক। সাম্প্রতিককালে ব্রুড মাছ পরিবহনের সময় মাছকে অবচেতন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত সুবিধার কারণে এ সকল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়–

১। মাছের ওপর সামগ্রিক চাপ হ্রাস পায়।

২। অক্সিজেন গ্রহণের হার হ্রাস পায় এবং একইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্যা বিষাক্ত পদার্থে নিঃসরণ হ্রাস পায়।

৩। মাছের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত হয় ফলে দৈহিক ক্ষত কম হয়।

৪। ব্রুড মাছ পরিচর্যা সময় কম লাগে।

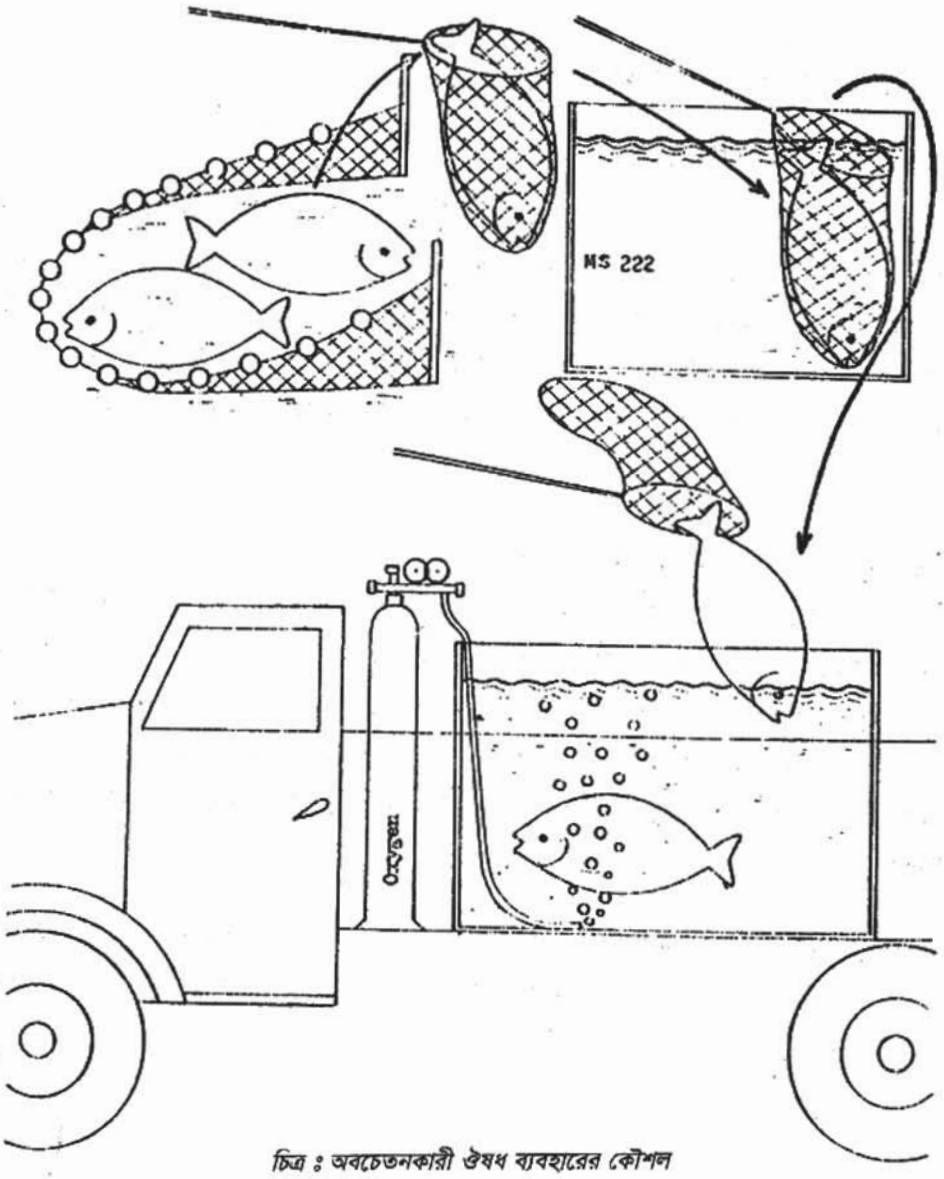

চিত্র ঃ অবচেতনকারী ঔষধ ব্যবহারের কৌশল

২০২০

রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে কম খরচে মাছকে পরিবহন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে পরিবহনের সময় পানির তাপমাত্রা ৫-১° সে. এর মধ্যে রাখা। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নয় কারণ পরিবহনকালে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তবে যদি পরিবহন মাধ্যম হিসাবে ঠাণ্ডা পানির সরবরাহ পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে রাসায়নিক অবচেতনকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত। নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ মাছকে অবচেতন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধের নাম	সুপারিশকৃত মাত্রা
১। নাভাইকেইন	৫০ মি.গ্রাম/কেজি মাছ
২। এমাবারবিটল সোডিয়াম	৮৫ মি. গ্রাম/কেজি মাছ
৩। বারবিটল সোডিয়াম	৫০ মি. গ্রাম/কেজি মাছ
৪। টারসিয়ারী এমাইল এলকোহোল	২ মি. গ্রাম/৪.৫ লিটার
৫। মিথাইল প্যারাফাইনাল	১-২ মি.লি./লিটার
৬। ইউরেথন	১০০ মি. গ্রাম/লিটার
৭। থাই ওণ উরাসিল	১০ মি. গ্রাম/লিটার
৮। হাইড্রোক্সি কুইনালডিন	১ মি.গ্রাম/লিটার
৯। এম. এস. ২২২	১ঃ২০০০০ পানি
১০। কুইনালডিন	১ঃ ৪০০০০ পানি

উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে কুইনালডিন এবং এম এস ২২২ মাছকে অবচেতন করার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কুইনালডিন বিষাক্ত হওয়ার ব্যবহারের সময় সতকর্তা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণত বৃহৎ আয়তনের পানিতে মাছকে অবচেতন করার কাজে কুইনালডিন ব্যবহৃত হয়। এম এস ২২২ দ্বারা ব্রুড মাছ অবচেতন করার সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমে ব্রুড মাছকে ১ঃ ২০০০০ মাত্রার এম এস ২২২ দ্রবণে রাখা হয়। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ যখন সম্পূর্ণভাবে অবচেতন হয় তখন উক্ত দ্রবণে পানি যোগ করে দ্রবণের ঘনত্ব কমানো হয়। কমন কার্প এবং বিগহেড কার্পের ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত ঘনত্ব হ্রাসের মাত্রা ২ গুন (১ঃ ৪০০০০) গ্রাস কার্প মাছের ক্ষেত্রে ২-২.৫ গুন (১ঃ৫০০০০) এবং সিলভার কার্প মাছের ক্ষেত্রে ৫ গুন (১ঃ ১০০০০০)।

ঙ) শোধন :

পুকুরে ব্রুড মাছ ছাড়ার আগে মাছকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য শোধণ করে নেওয়া হয়। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা লবণ দিয়ে ব্রুড মাছকে শোধন করতে হয়।

গ. ব্রুড মজুদ :

ব্রুড মাছ মজুদের হার ও ঘনত্ব কৃত্রিম প্রজননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করলে মাছের ডিমের পরিপক্বতা বিলম্বে আসে এবং প্রজননকাল ক্ষণস্থায়ী হয়। এতে মৌসুম শুরুতে রেণু উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পরবর্তীতে রেণুর মূল্য কমে যাওয়ায় হ্যাচারি মালিকের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। মজুদ যোগ্য ব্রুডের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল:

i) প্রজাতির প্রকার

ii) মাটির গুণাগুণ

iii) পানির গুণাগুণ

iv) পানিতে উৎপাদনক্ষম প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

মজুদ হার প্রতি শতকে ৮.০ কেজি থেকে ১২.০ কেজি। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রজননকারী ব্রুড মাছ পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে :

i) সব প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ একত্রে মজুদ করা।

ii) দুই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ একত্রে মজুদ করা।

iii) একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ একত্রে মজুদ করা।

iv) একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুড মাছ ভিন্ন পুকুরে মজুদ করা।

কার্পিও মাছের মতো যে সব মাছ পুকুরে ডিম দেয় সে সব মাছ স্ত্রী ও পুরুষকে একত্রে এক পুকুরে রাখলে প্রজননের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে কার্পিও মাছের সাথে অন্য প্রজাতির মাছ না রাখাই ভালো।

যেহেতু সব প্রজাতির মাছের পুষ্টি চাহিদা এক রকম নয় সেজন্য প্রজাতি ভিত্তিক যত্ন নেয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পুকুরের ব্যবস্থা করা উচিত। সম্ভব হলে একই প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ মাছকে আলাদা করে রাখা উচিত। এতে করে স্ত্রী-পুরুষের আলাদা যত্ন নেয়া সম্ভব। হ্যাচারির সাফল্য নির্ভর করে পরিপক্ব স্ত্রী ব্রুড মাছের উপর। তাই পুরুষের চেয়ে স্ত্রী ব্রুড মাছের যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

যদি পুকুরের অভাব হয় তাহলে একাধিক প্রজাতির মাছ নিম্নের মিশ্রণে একসাথে রাখা যেতে পারে–

i) রুই ও সিলভার কার্প

ii) গ্রাস কার্প ও কাতলা

iii) গ্রাস কার্প ও বিগহেড কার্প

iv) রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউস।

যদি পুকুরের খুব বেশি অভাব থাকে তবে সব প্রজাতির মাছ নিয়ে এক পুকুরে রাখা যেতে পারে।

সিলভার কার্প	২৪%
বিগহেড কার্প	১২%
কাতলা	১২%
মৃগেল	১২%
রুই	২০%
গ্রাস কার্প	২০%
	মোট - ১০০%

যদিও একই পুকুরে সকল প্রজাতির মাছ মজুদ করা যায়। তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

১. একই পুকুরে সিলভার কার্প, রুই অথবা কার্পিও এক সাথে মজুদ করা যেতে পারে কিন্তু রুই এবং কার্পিও-এর সাথে একত্রে সিলভার কার্প মজুদ করা উচিত নয়।
২. একই পুকুরে গ্রাস কার্প, কাতলা অথবা বিগহেড কার্পের এক সাথে মজুদ করা যেতে পারে কিন্তু কাতলা এবং বিগহেড কার্পের সাথে একত্রে গ্রাস কার্প মজুদ করা উচিত নয়।
৩. যেহেতু বিগহেড কার্প, কাতলা এবং সিলভার কার্পের খাদ্যাভ্যাস একই রকম সেহেতু এদেরকে কখনো একই পুকুরে একত্রে মজুদ করা উচিত নয়।

৩। মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা :

ক. মাছের মৃত্যুহার দেখা : মাছ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার পর থেকে পর দিন পর্যন্ত পুকুর পাড়ের চারপাশে ঘুরে দেখতে হবে কোনো মাছ মরে পানির উপরে ভেসে উঠেছে কি না। যদি কোনো মাছ মারা যায় সে ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ মাছ পুনরায় পুকুরে ছাড়তে হবে।

খ) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ও সার প্রয়োগ : পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত ভাবে সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১০০ গ্রাম টি.এস.পি ও ৩-৪ কেজি গোবর গুলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। সপ্তাহে অন্তত ১ বা প্রাকৃতিক খাদ্যের মাত্রা হাত, গামছা-গ্লাস বা সেক্কিডিস্ক, যে কোনো একটা দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

গ) সম্পূরক খাদ্যে প্রয়োগ : পুকুর বা জলাশয়ের মাটি ও পানির স্বাভাবিক উর্বরতায় পুকুরে যে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয় তা দিয়ে মাছের খাদ্যে চাদিা পূরণ হয় না। সেজন্য মাছের পুষ্টি চাহিদা পুরোপুরি মেটানোর জন্য বাইরে থেকে খাদ্যে সরবরাহ করা হয় পুকুরের বাইরে থেকে মাছকে দেওয়া এসব খাদ্য দ্রব্যকে সম্পূরক খাদ্য বলা হয়।

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব :

i) মাছ পুষ্টি অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

ii) মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

iii) ব্রুড মাছের গোনাডের দ্রুত পরিপক্বতা আসে।

iv) ব্রুড মাছের প্রজননকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

v) মাছের ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

vi) পোনা মৃত্যুহার সর্বনিম্ন হয় :

মাছ (%)	প্রোটিন (%)	চর্বি (%)	শর্করা (%)
রুই জাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি)	২০-২৫	৮-১০	২৫-৩৫
ক্যাট ফিস জাতীয় মাছ (মাগুর, পাঙ্গাস)	২৫-৩০	৮-১০	২৫-৩৫

ব্রুড মাছের ওপর পুষ্টি চাহিদার প্রভাব :

ব্রুড মাছের গোনাডের পরিপক্বতা সরবরাহকৃত খাদ্যে বিদ্যমান প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ ও মানের উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টির অভাব হলে নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

i) ব্রুড মাছ দেরীতে পরিপক্বতা লাভ করে।

ii) মাছের ডিমের সংখ্যা হ্রাস পায়।

iii) ডিমের আকার ছোট হয়।

iv) ডিমের গুণাগুণ নষ্ট হয় যেমন : রাসায়নিক উপাদান, লার্ভার বাঁচার হার, পরিস্ফুটন ক্ষমতা ইত্যাদি।

ব্রুড মাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান :

ব্রুড মাছের খাদ্যে পুষ্টি উপাদন প্রোটিন, চর্বি, শর্করা ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ কিছু পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন যেগুলো মাছের গোনাডের পরিপক্বতা, ডিম পরিস্ফুটনের হার ও ডিমের বঞ্চিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। নিম্নে ব্রুড মাছের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ পুষ্টি উপাদানের নাম ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো।

i) অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড মাছের শুক্রাণুর গুণাগুণ বৃদ্ধি করে এবং ডিমের ভেসে থাকার হার বাড়ায়।

ii) ফসফরাস মাছের প্রজনন সফলতা বাড়িয়ে দেয়।

iii) ভিটামিন-ই ডিমের পরিস্ফুটন ও লার্ভার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি করে।

সম্পূরক খাদ্যে তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

যেহেতু ব্রুড মাছের প্রোটিন চাহিদা একই প্রজাতির মাছের সর্বানুকূল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সমান সেহেতু মাছের মজুদ পুকুরে ব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্যেই ব্রুড মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে

ব্রুড মাছের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফিশ মিল থাকতে হবে। কারণ ফিশ মিলে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান মাছের প্রজনন সফলতায় সাহায্য করে। নিম্নে ব্রুড মাছের জন্য ৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ একটি খাদ্যসূত্র দেওয়া হলো :

খাদ্য উপাদান	শতকরা উপস্থিতি পরিমাণ
ফিশ মিল	২০
সরিষার খৈল	১৫
তিলের খৈল	১৫
চালের কুঁড়া	২৫
গমের ভুসি	২০
চিটা গুড়	৫

গমের ভুসি চালের কুঁড়া খৈল খাদ্যবল তৈরি

যেহেতু বিশেষ বিশেষ পুষ্টি উপাদান ব্রুড মাছের গোনাডের পরিপক্বতা, ডিমের পরিস্ফুটন, হার এবং লার্ভার বেঁচে থাকার হারকে ত্বরান্বিত করে সেহেতু এসব উপাদান উক্ত খাদ্যের সাথে মিশালেই চলবে। যেমন- প্রতি কেজি খাবারে ভিটামিন এ ১০০০০-২০০০০ মি. গ্রাম ভিটামিন ই মিশাতে হবে।

ট্রে-তে খাদ্যবল প্রয়োগ

ব্রুড মাছের বিশেষ খাদ্য পরিচর্যা :

নিম্নে ব্রুড মাছের বিশেষ খাদ্য পরিচর্যার বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. গ্রাস কার্প :

গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, ভুট্টো ও তিলের খৈল এর সমানুপাতের মিশ্রণে সেপ্টেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত খাদ্য হিসেবে দিতে হবে। খাদ্য দিনে একবার দুইবার দেহের ওজনের ৩-৫% হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এর সাথে প্রতিদিন দেহের ওজনের ১০০ ভাগ ঘাস ব্যবহার করতে হবে।

২. বিগহেড ও সিলভার কার্প :

পুকুরে প্রতি দশ দিন অন্তর ১.৫-২.০ টন/হেক্টর হারে জৈব সার দিতে হবে। যদি কোনো কারণে ডিম্বাশয় ভালোভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহলে তিলের খৈল, বাদামের খৈল, গমের ভুসি বা চালের কুঁড়ার সমানুপাতের মিশ্রণ খাদ্য হিসাবে প্রতিদিন দেহের ওজনের ৩-৫% হারে দিতে হবে।

৩. কাতলা:

পুকুরে কাতলাকে এককভাবে রাখতে হবে। গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি প্রয়োগ করে জুপ্লাংকটনের ঘনত্ব ৩০-৫০ মি. লি/১০০ লিটার বাড়াতে হবে। সয়াবিন বা ফিশমিল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করতে হবে। এতে প্রোটিনের পরিমাণ কমপক্ষে ২৫% থাকবে। খাদ্যে সরিষার খৈল না থাকাই ভালো, প্রতিদিন মাছের দেহের ওজনের ৩-৫% খাদ্য দিতে হবে।

৪. মৃগেল, রুই ও কার্পিও :

সমান হারে সয়াবিন মিল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি এবং সরিষার খৈল একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করতে হবে। অথবা গমের ভুসি, সরিষার খৈল দানাদার গমের ভুসি এবং ফিশমিল ৪ঃ ৪ঃ ১ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে মাছের দেহের ওজনের ৩-৫% হারে প্রতিদিন দুইবার করে প্রয়োগ করতে হবে। সরিষার খৈল সারা রাত ভিজিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

গ) পানির গুণাগুণ রক্ষা করা :

ব্রুড মাছের পরিপক্বতা পুকুরের পানির ও মাটির গুণাগুণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই পুকুরের পানি মাঝে মধ্যে আংশিক পরিবর্তন অর্থাৎ (১৫-২৫%) করে দিলে ভালো হয়। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে মাছের পরিপক্বতা দ্রুত আসে। পুকুরের পানি পরিবর্তন একদিকে যেমন পানির আপেক্ষিক পরিবাহিতা কমিয়ে দেয় অন্যদিকে পানিতে মুক্ত আয়ন যেমন Na+,K-, Ca++ও cl-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ফলে গোনাডের পানি/আয়ন সরবরাহ বৃদ্ধি পায় যার ফলে গোনাডের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

ব্রুড মাছের পুকুরে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং তাদের সর্বানুকূল মাত্রা নিম্নে দেওয়া হলো–

ভৌত গুণাগুণ	মাত্রা
১। পানির রং	হালকা সবুজ বা বাদামি
২। স্বচ্ছতা	২৫-৩০ সেন্টিমিটার
৩। আলো	প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা
৪। তাপমাত্রা	২৫০-২৯° সেলসিয়াস
রাসায়নিক গুণাগুণ	**মাত্রা**
১। দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫ P.P.M –এর উপরে
২। কার্বন ডাই-অক্সাইড	১৫ P.P.M এর কম
৩। P^H (পিএইচ)	৬.৫-৮.৫
৪। অ্যামোনিয়া	০.৫ P.P.M এর কম

ঘ. হররা টানা : সপ্তাহে একবার জাল বা হররা টেনে পুকুরের তলদেশের জমাকৃত বিষাক্ত গ্যাসসমূহ দূর করে ব্রুড মাছের সর্বানুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে যথাসময়ে পরিপক্বতা আনয়নের মাধ্যমে সুস্থ-সবল ব্রুড মাছ তথা উন্নত মানের রেণু উৎপাদনে সহায়তা করা।

ঙ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা :

ব্রুড মাছ রোগাক্রান্ত হলে তার ডিমের পরিপক্বতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে তাই মাছ যেন রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। সাধারণত ব্রুড মাছ আরগুলাস নামক এক ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায় যাকে মাছের উকুন বলে এবং তা রুই জাতীয় মাছের বেলায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আরগুলাস দ্বারা মাছ আক্রান্ত হলে যথাশীঘ্র সম্ভব এর প্রতিকার করা বাঞ্ছনীয়। এই রোগ প্রতিকারের জন্য ০.৫ পি. পি. এম হার ডিপটারেক্স বা ০.১ পি পি এম সুমিথিয়ন তিন দিন অন্তর সপ্তাহে দু'বার ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া হ্যাচারিতে

মাছ পরিবহন ও স্থানান্তরের সময় বিভিন্নভাবে মাছের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া জনিত আক্রমণে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে মজুদের পূর্বে ব্রুড ভালোভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে, প্রয়োজনে মজুদের আগে ব্রুড মাছকে শোধন করা যেতে পারে। ক্ষতের পরিমাণ বেশি মাছগুলোকে ১৫ মি.গ্রাম/কেজি হারে টেরামাইসিন ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে।

ব্রুড ব্যবস্থাপনা সকল ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করা হ্যাচারি পরিচালনার পূর্বশর্ত। কোনো কারণে ব্রুড ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি হলে হ্যাচারি পরিচালনা সম্পূর্ণ অলাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

বেশিরভাগ ক্ষেতে দেখা যায় হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা প্রয়োজন তা অনেক হ্যাচারিতেই না করে আশপাশের মাছ চাষের পুকুর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এনে প্রজনন ঘটানো হয়। এ অবস্থায় মাছের আকার, স্বাস্থ্য, পরিপক্বতা, বয়স, বংশগতি, উৎপত্তির ইতিহাস কিছুই বিবেচনা করা হয় না। কেবল পেটে ডিম আছে কিনা কিংবা পুরুষগুলোর মিল্ট আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়েই প্রজনন ঘটানোর জন্য সংগ্রহ করা হয়।

এ ছাড়া হ্যাচারির পুকুরে যে সব ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই ২/৪ জোড়া ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা থেকেই তৈরি ব্রুড। পরবর্তীতে ও বার বার প্রজননকৃত একই ব্রুডের বংশধরদের ব্রুড পরিণত করা হয়। দলে অন্তঃপ্রজননের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ২-৩ বংশগতিতেই (Generation) দেখা যায়।

বড় আকারের ব্রুড মাছের ডিমের পরিমাণ ছোট আকারের মাছের তুলনায় কম। তাই হ্যাচারি ব্যবস্থাপকেরা তাদের ব্রুড মাছ ছোট করে রাখতে আগ্রহী। তাছাড়া মাছের প্রজনন ঘটানোও সহজ এবং ডিম পাড়ার হারও বেশি। তাই বাণিজ্যিক সফলতার উদ্দেশ্যে গুণগতমান গৌণ হয়ে পড়ে।

হ্যাচারীতে ব্রুড ব্যবস্থাপনার ছক

হ্যাচারীতে ব্রুড ব্যবস্থাপনা ছক নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো-

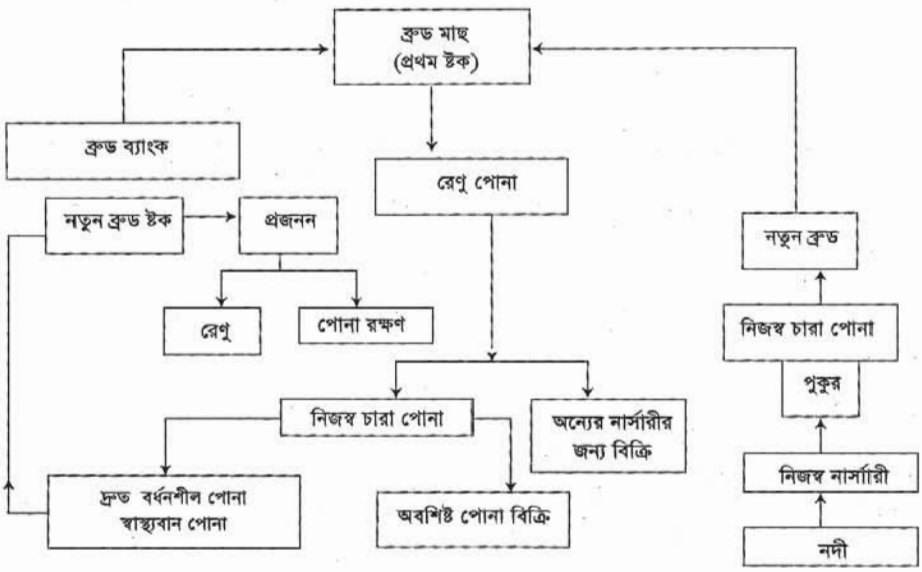

চিত্র : হ্যাচারিতে ব্রুড ব্যবস্থাপনা ছক

২০২০

প্রজনন জন্য ব্রুড মাছ নির্বাচনের কৌশল :

ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর কৃত্রিম প্রজননে সফলতা নির্ভর করে। প্রজনন কার্যক্রম শুরুর আগে মাছ প্রজনন উপযোগী হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার দরকার। আমাদের দেশে যেসব প্রজাতির মাছ প্রজননের জন্য হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের প্রজনন কাল সাধারণত মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক সময় ক্যাথেটারের সাহায্যে ডিম্বাশয় থেকে ডিম সংগ্রহ করে। পরিপক্ব স্ত্রী মাছ শনাক্ত করা গেলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে পুরুষ ও স্ত্রী ব্রুড মাছ শনাক্ত করা হয়। প্রজনন মৌসুমে প্রজননে প্রস্তুত মাছের লক্ষণাদি প্রায় সব প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে একই ধরনের হয়। লক্ষণগুলোর নিম্নরূপ :

স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
১। বক্ষপাখনা তুলনামূলক ছোট এবং পাখনার সর্ব বাহিরের রশ্মি খুব মোটা নয়।	১। বক্ষ পাখনা তুলনামূলক লম্বা এবং সর্ব বাহিরের রশ্মি মোটা ও বড়।
২। বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক মসৃণ ও পিচ্ছিল হবে।	২। বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক খসখসে হবে।
৩। পেট স্ফীত ও নরম হবে।	৩। পেট চিকন হবে।
৪। পায়ু ফোলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল।	৪। পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের হবে।
৫। তলপেটে সামান্য চাপ দিলে ডিম বের হবে।	৫। তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দুধের মতো তরল (মিল্ট) বেরিয়ে আসে।

চিত্র : পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ কাতলা মাছ

মৎস্য পরিকল্পনা :

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে অতীতে মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য ছিল বিধায় মৎসচাষি এবং সাধারণ জনগণ আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কিন্তু ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাছের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন ও মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন কমছে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদিত হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মাছের বর্তমান উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে মৎস্য খামার স্থাপন অতীব জরুরি। এর জন্য সফলভাবে মৎস্য খামার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি মৎস্য প্রকল্পের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড কখন ও কীভাবে করা হবে, কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মালামাল কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে ইত্যাদি বিষয় ঠিক করার নামই হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা। মৎস্য খামার পরিকল্পনার উদেশ্য হলো কী ধরনের খামার স্থাপন করা হবে, কত আয়তনের কতটি পুকুর নির্মাণ করা হবে, এসব পুকুরের কি কি কার্যক্রম থাকবে, এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন পর্যায়ে কতজন দক্ষ কর্মী প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা।

সঠিক পরিকল্পনার শর্ত :

সুষ্ঠু পরিকল্পনার যেকোনো প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। শর্তগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. বাজরের অবস্থা যাচাই
২. ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ
৩. শ্রমিকের পরিমাণ নির্ণয়
৪. পরিবহন ব্যবস্থা মূল্যায়ন
৫. প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন

এই সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্যই বাস্তব ভিত্তিক হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অতি উৎসাহী হওয়া ঠিক হবে না। সঠিক পরিকল্পনার জন্য ঝুঁকি এবং অসুবিধাসমূহ গণনায় আনতে হবে।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য : একটি কর্ম পরিকল্পনার কতগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যেমন :

১. **কর্ম পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি :** এই স্তরে একটি খামারের বিভিন্ন অঙ্গ সমূহের বিন্যাস, কী কী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা কতদূর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এসব তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা।
২. **কর্ম পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ :** একটি কর্মপরিকল্পনার ব্যাপ্তি কত সময় ধরে থাকবে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমসমূহ কত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে, তা উল্লেখ থাকবে।
৩. **কর্ম পরিকল্পানা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ সমূহের উল্লেখ :** কর্ম পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যেসব উপাদান বা কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে তার ধারাবাহিক বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা।

৪. **কর্মপরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় লোকবলের উপস্থিতি :** পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ অনুসারে কে কখন এবং কোন সময়ে কী কী কাজ সমাধান করতে পারে তার পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ থাকে।

একটি আদর্শ খামার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অধ্যায়ের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১. সার সংক্ষেপ :

ক) ব্যবসায়ের ধরণ :

ক. উৎপাদিত দ্রব্য
খ. সম্ভাব্য বাজার
গ. প্রতিযোগিতা

খ) অর্থ সংক্রান্ত তথ্য :

ক. প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ
খ. অর্থের প্রয়োজনের কারণ
গ. কীভাবে ব্যয়কৃত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

২. ব্যবসায়ের বর্ণনা :

ক. ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম
খ. প্রতিষ্ঠানের ভৌতিক অবস্থার বর্ণনা
গ. উৎপাদিত পণ্য এবং তার মূল্যমান বা দর নির্ধারণ
ঘ. ঐ প্রতিষ্ঠানের ইতিকথা
ঙ. ব্যবসায়ের লক্ষ্য

৩. বাজার গবেষণা এবং পরিকল্পনা

ক. সম্ভাব্য ক্রেতা
খ. বাজার জরিপ
গ. বাজারের বিস্তৃতি
ঘ. প্রতিযোগিতার উৎসসমূহ
ঙ. বিক্রয় এবং সরবরাহ
চ. বিজ্ঞাপন ও গণসংযোগ

৪. পরিচালনা :

ক. উৎপাদনের পদ্ধতি
খ. শ্রমিক জোগান
গ. সরবরাহকারী
ঘ. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি
ঙ. সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা

৫. প্রধান ব্যক্তি বর্গ :

ক. ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা পরিষদ
খ. শ্রমদানকারী
গ. আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী।
ঘ. বহিরাগত পরামর্শ দাতা ও সম্প্রসারণ কর্মী

৬. আর্থিক কর্মসূচি :

ক. অর্থলগ্নির কারণ
খ. লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ
গ. ঋণ পরিশোধ পরিকল্পনা

৭. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :

ক. বাজেট
খ. আয়ের সম্ভাব্যতা ও পরিমাণ নির্ধারণ।

৮. সঠিক কর্মসূচি
৯. দুর্বলতা এবং ঝুঁকি

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ :
যে কোনো বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা হয়।
১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ।
২. নির্ধারিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা।
৩. বর্তমানে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
৪. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়ক বিষয়গুলো এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করা।
৫. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক বিকল্প পদক্ষেপ নির্ধারণ করা।

১। উদ্দেশ্য নির্ধারণ :
যে কোনো প্রকল্পের উদ্দেশ্যর মধ্যেই তার সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে। উদ্দেশ্য যত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হবে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তত সহজ ও সাবলীল হবে। মাছ চাষের প্রকল্প বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন : পুকুরে মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, বিল, বাঁওড়ে মাছ চাষ, নার্সারি ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারি স্থাপন, সমন্বিত মৎস্য চাষ, যেমন : ধান ক্ষেতে মৎস্য চাষ, মাছের সাথে হাঁসের চাষ, মাছের সাথে মুরগি চাষ, পেন কালচার, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি। তবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই সামর্থ্য ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যেমন : বাড়ির পাশে বা রাস্তার পাশে যদি ছোট জলাশয় থাকে, যেখানে ৩-৬ মাস পানি থাকে সেখানে পাঙ্গাশ বা রুই, কাতলার চাষ না করে তেলাপিয়া বা রাজপুঁটির চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আবার পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়া হঠাৎ করে মাছের পোনার চাষ ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য সঠিক উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্পের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

২। নির্ধারিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ :
সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প নির্ধারণের পর এর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে। নির্ধারিত জলাশয়ে মাটি, পানি, অবস্থান ব্যবস্থাপনার ধরন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আয়, ব্যয় ও উৎপাদনের হিসাব করতে হবে যা, যে কোনো খামার পরিচালনার জন্য এটি খুবই জরুরি বিষয়।
সমতল ভূমির বন্যামুক্ত যে কোনো এলাকায় মিঠা পানির মৎস্য খামার স্থাপন করা যায়। মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে দো-আঁশ এবং এঁটেল মাটি উত্তম এবং উৎপাদনশীলতা বেশি। পিট মাটি এবং বেলেমাটি পরিহার করা উচিত। লাল মাটি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের শক্ত মাটির পুকুরের উৎপাদনশীলতা কম। মিঠা পানির মৎস্য চাষের খামার নির্বাচনে পানির উৎস হিসেবে লোনামুক্ত এবং বিভিন্ন গ্যাস মুক্ত ও দূষণমুক্ত পানি উত্তম।

৩। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা :
এ পর্যায়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন : সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের সাথে মুরগি চাষ করা হলে পরবর্তীতে এর সাথে গাভী বা হাস পালন করা যায় কিনা অথবা মৌসুমি পুকুরে তেলাপিয়া বা রাজপুঁটি চাষ করার পর পরবর্তীতে একে আরও গভীর করে বার্ষিক পুকুরে রূপান্তরিত করে রুই, কাতলা, পাঙ্গাশের চাষ করা যায় কিনা বা আশপাশে আরও মাছ চাষের জলাশয়

পাওয়া যায় কিনা, এসব ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বাজারে কোন মাছের চাহিদা কেমন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন, এছাড়া বিনিয়োগের জন্য মূলধন জোগান কতটুকু আছে, ঋণ নিতে হলে কোন কোন ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৪। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়ক বিষয়গুলো এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করা :

এ প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পের সুবিধার দিক ও দুর্বল এবং ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়। যেন সুবিধা থেকে বেশি লাভ নেয়া যায়, আবার দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ দিক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে ক্ষতির ভাগ কমানো যায়। যেমন : সুবিধার দিক হতে পারে প্রকল্পের কাছেই ব্রুড ব্যাংক বা পোনা ব্যাংক-এর অবস্থান যেখান থেকে খুব সহজেই মাছ বা পোনা সংগ্রহ করা যায়। আবার উৎপাদিত মাছ সহজেই বাজারে বিক্রি করা যায়। এ ধরনের সুবিধা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পক্ষান্তরে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থানে হঠাৎ বন্যার আশঙ্কা থাকা, সামাজিক কোন্দোল বা দলাদলির কারণে মাছ চুরি বা মাছের রোগের কারণে মাছ কমে যাওয়া, নাশকতামূলকভাবে বিষ প্রয়োগের আশঙ্কা থাকলে তা প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করতে হবে।

৫। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক বিকল্প পদক্ষেপ নির্ধারণ করা :

এ পর্যায়ে প্রকল্পের সহায়ক বিষয়গুলো থেকে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়ার জন্য লাভজনক বিকল্প প্রস্তাব চিহ্নিত করা হয়। যেমন : সরকারি হ্যাচারির সহায়তার উন্নত পোনার জোগান পেলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। কিন্তু দেখা গেল দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে ব্র্যাক হ্যাচারি বা ভালো উন্নত গুণসম্পন্ন ব্রুড থেকে পোনা তৈরি করে কিন্তু দাম তুলনামূলকভাবে কম, এমন স্থান থেকে পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে দেখা গেল, যে বাজারে এতদিন মাছ বিক্রি হতো তার চেয়ে পাশের অন্য বাজারে আরও বেশি দাম পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সেখানেই বিক্রি করতে হবে। আবার আকস্মিক বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাড় ভালো ভাবে তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োজনে পাড়ের উপর দিয়ে বাড়তি জালের ব্যবস্থা করতে হবে যেন মাছ বাইরে যেতে না পারে। চুরি রোধের জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে, পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুকুরের মধ্যে বাঁশ, কঞ্চি, পাতা ছাড়া ডাল পুঁতে রাখতে হবে।

মৎস্য খামার পরিকল্পনা ও নির্মাণ :

মৎস্য খামার নির্মাণের পূর্বেই কিছু মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। খামার নির্মাণের স্থান নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি খামারের পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খামারের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাফল্যের অনেকটাই খামারের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। মৎস্য খামারের এমন কোনো (design) নেই যা সর্বত্রই ব্যাবহার করা যায়। সে কারণে এক একটি মৎস্য খামারের (design) এক এক রকম হয়। তবে কোনো স্থানের ভূ-সংগঠনের জন্য design-এর মৌলিক কতকগুলো বিষয়ের উপর কিছু বলে দেওয়া যায়। যেমন পানির উৎস, পানি সরবরাহের প্রকৃতি (nature of water supply) চাষের প্রজাতি ও তাদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব।

১। খামারের ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত :

এখনও অধিকাংশ মৎস্য খামার স্থলভাগেই নির্মাণ করা হয় এবং নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য এগুলো মিঠা পানি ও লোনা পানির খামার হিসেবে ভাগ করা হয়।

কোনো স্থানে খামার নির্মাণ করতে হলে মৌলিক তথ্য হিসেবে মাসিক গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন,আর্দ্রতা, সূর্যালোক, বাতাসের গতি ও দিক ইত্যাদি জানা দরকার। তাছাড়া স্থানের বন্ধুরতা ও মসৃণতার মানচিত্র মৎস্য খামারের ডিজাইনের জন্য খুবই সহায়ক। এগুলো জানা থাকলে কোন দিক থেকে খামারের পানি সরবরাহ করতে হবে এবং কোন দিকে নিষ্কাশন করতে হবে তার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

২ মাটি :

খামার নির্মাণের আগেই মাটির নমুনা সংগ্রহ করে নিতে হবে। যদি খামারের স্থানের মাটি সমরূপী হয় তাহলে প্রতি ২-৫ হেক্টরের জন্য একটি বা দুটি নমুনা সংগ্রহ করলেই চলে। যদি বৈচিত্র্য বেশি থাকে তাহলে অধিক নমুনার প্রয়োজন হয়। মাটির নমুনা সংগ্রহের জন্য ২ মিটার বা ৬-৭ ফুট গভীরে যাওয়া উচিত। পানির জন্য বড় টাওয়ার বা অন্য কোনো ধরনের বড় ধরনের কিছু নির্মাণ করতে হলে আরও বেশি গভীরের মাটির নমুনা পরীক্ষা করা উচিত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রয়োজনে মাটির নমুনা পরীক্ষা করা উচিত।

১. চুয়ানোর হার নির্ণয়।
২. (Under seepage) অবস্থা
৩. খামারের মাটি দিয়ে তৈরি করা পুকুরের পাড় ও বাঁধের স্থায়িত্ব।
৪. মাটিকে কী পরিমাণে (compact) (দৃঢ়) করতে হবে তা জানা।
৫. পুকুরের কাঁচা/পাকা নালা দিয়ে সরবরাহকৃত পানির প্রবাহ গতি কত হবে।
৬. অন্যান্য নির্মাণ কাজের ভিত (foundation) কীভাবে করতে হবে।

আমাদের দেশে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পুকুর খননের সময় পুকুরের ভিতর থেকে যে মাটি পাওয়া যায় সে মাটি দ্বারাই পুকুরের পাড় বাঁধা হয়। কিন্তু যদি পুকুরের স্থান বেশি উচু হয় বা বিল বা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল হয় তাহলে পুকুরের ভিতরের মাটি দিয়ে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পাড় বাঁধতে হলে পুকুরের গভীরতা অনেক বেড়ে যাবে যা মাছ চাষের জন্য কাম্য নয়। এমন ক্ষেত্রে অন্য স্থানের মাটি এনে পুকুরের পাড় বাঁধা উচিত। মাছের পুকুরের পাড়ের জন্য এঁটেল মাটি সবচেয়ে ভালো, কারণ এ মাটির পাড় সহজে ভাঙে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৩) পানি সরবরাহ :

মাছের পুকুরের পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পানির গুণাগুণ মাছের উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুকুরের পানির উৎস বৃষ্টি ও গভীর নলকূপ। কিন্তু বর্তমানে যেসব নতুন নতুন মৎস্য খামার হচ্ছে, সেসব খামারের পুকুরের পানির উৎস নদী ও হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে যে, নদীর পানি দূষিত কিনা। আজকাল নদীর পানিতে কলকারখানা থেকে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ যোগ হচ্ছে। সেজন্য দূষণের বিষয়টি খুব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। কোনো অঞ্চলে পুকুর তৈরি করার সময় পুকুরে বছরে কী পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে তা জেনে নিতে হবে। পুকুর হতে চুয়ানো ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি হারিয়ে যায়। বছরের কোন সময়ে কী পরিমাণ পানি হারায় তা বের করা সম্ভব। আমাদের দেশে একটি আদর্শ পুকুর থেকে বছরে ৩ ফুটের মতো পানি কমতে পারে। তবে

সাধারণভাবে বলা যায় এটেল মাটির পুকুর হলে এবং পুকুরের গভীরতা ১০ ফুটের মতো হলে শুষ্ক মৌসুমে বাহির থেকে পানি সরবরাহের প্রয়োজন নেই। অন্য দিকে খামারের পুকুরের পানির জন্য যদি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয় তাহলে পুকুরের গভীরতা ৫-৭ ফুটের মতো রাখলেই চলে। শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে গেলে গভীর নলকূপ থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। পুকুরে দীর্ঘদিন মাছের চাষ করলে অত্যধিক কাদা হয়ে পুকুরের তলা ভরাট হয়ে গভীরতা কমে যায়। সেজন্য মাঝে মধ্যে এসব পুকুর থেকে কাদা সরাতে হয়। কাদা সরানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পুকুরের তলার আদি মাটি উন্মুক্ত না হয় কারণ আদি মাটি উন্মুক্ত হলে আবার পানির চুয়ানো বেড়ে যাবে এবং তা ঠিক হতে কয়েক বছর লেগে যাবে।

৪. খামারের আকার :

কোনো খামারের আকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে :

(ক) ভূমি ও পানির প্রাপ্যতা;

(খ) চাষের জন্য কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যাবহার হবে। (বিস্তৃতি, আধা নিবিড়, নিবিড় চাষ পদ্ধতি);

(গ) কোন আকারের খামার অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি লাভজনক;

(ঘ) উৎপাদিত মাছের বাজার;

(ঙ) জনবল ও যন্ত্রপাতি;

কোনো কোনো খামারের মাছ বাজারজাত করার আগেই জমা করে রাখার জন্য খামারের ভেতরে আলাদা পুকুর বা বড় বড় চৌবাচ্চা করা হয়। তবে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করার স্বার্থে খামারের একটি পুকুর বা পাকা চৌবাচ্চা এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। খামারে যদি নিবিড় চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাহলে পুকুরগুলো ১-৫ হেক্টরের ভিতর হলে ভালো হয়। অন্যদিকে বিস্তৃত চাষের পুকুরসমূহ ৩-১০ হেক্টর হতে পারে।

৫. পরিকল্পনামাফিক খামার তৈরি :

প্রচলিত নিয়মে মাছের পুকুরের design-কে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা। এই তিনটি শ্রেণি হচ্ছে :

i) বাঁধের পুকুর (Barrage Ponds)

ii) ঢালু পাড়ের পুকুর (contour-Ponds)

iii) ধানক্ষেতের পুকুর (paddy-Ponds)

নিচে এসব পুকুর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো :

i) বাঁধের পুকুর :

সাধারণত দুই পাহাড় বা টিলার মাঝে বিদ্যমান সমতল বা অল্প ঢালুযুক্ত ভূমিতে বা মরা নদীর সুবিধাজনক স্থানে বাঁধ দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের পুকুরে পানি সরবরাহ করা ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে।

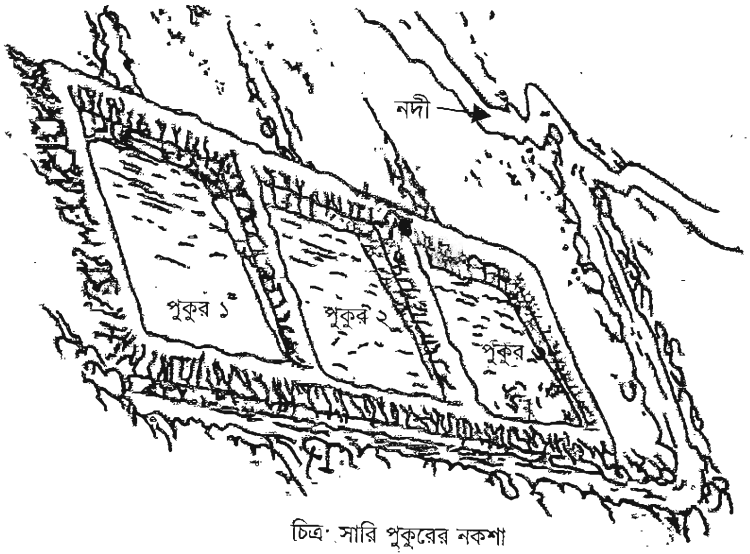

চিত্র: সারি পুকুরের নকশা

ii) ঢালু পাড়ের পুকুর :

কিছুটা বাঁধের পুকুরের মতই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুকুরের তলদেশ সমতল না হয়ে ঢাল যুক্ত হয়।

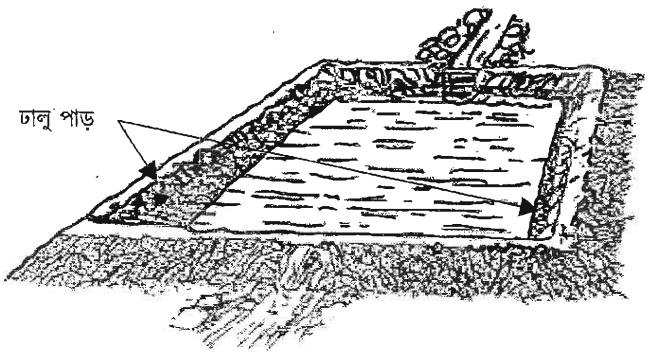

চিত্র: ঢালু পাড়ের পুকুর

iii) ধান ক্ষেতের পুকুর :

ধান ক্ষেতের সমতল ভূমিতে পাড় বেঁধে তৈরি করা হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুকুর এ ধরনের।

৬. চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচন : খামার প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হলে চাষের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। যে সব প্রজাতির উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সহজ, উৎপাদন বেশি এবং বাজারমূল্য বেশি সেসব মাছ চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দেশে রুই-কাতলা জাতীয় মাছ, পাঙ্গাশ, তেলাপিয়া, থাই সরপুঁটি, মাগুর ও শিং মাছের চাষ লাভজনক বর্তমানে মনোসেক্স তেলাপিয়া ও পাঙ্গাশের চাষ সবচেয়ে লাভজনক।

৭. খামারের ব্যবস্থাপনা :

উৎপাদনের পুকুরের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সার ও খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। মাছের রোগ হলে চিকিৎসা করতে হবে।

৮. মাছ আহরণ ও বিক্রি :

যখন কাঙ্ক্ষিত আকারে বড় হবে, বাজারে যখন ভালো মূল্য পাওয়া যাবে, মাছ ধরে তখন বিক্রি করতে হবে। বাজারে যে পরিমাণ মাছ বিক্রি হবে ঠিক সেই পরিমাণ মাছ ধরতে হবে। মাছ ধরার পর যথা সম্ভব টাটকা অবস্থায় বাজারজাত করতে হবে। তাতে মাছের মূল্য বেশি পাওয়া যায়।

৯. আয়-ব্যায়ের হিসাব :

বছর শেষে খামারে সর্বমোট কত বিনিয়োগ হলো এবং মাছ বিক্রি করে কত আয় হলো তার হিসাব করতে হবে। যদি কোথাও ব্যবস্থাপনার ভুল ধরা পড়ে সেগুলো সংশোধন করে আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্রুড মাছ পালনের কর্ম পরিকল্পনা :

ব্রুড মাছ বলতে প্রজননে ব্যবহৃত পরিপক্ক বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে বুঝায়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত মাছের পোনা উৎপাদনে ব্রুড মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর তাই বিভিন্ন ধরনের মধ্যে মাছ চাষের মধ্যে ব্রুড মাছ পালন খুবই লাভজনক ব্যবসা। ব্রুড মাছ সাধারণত ২-৩ বছরে প্রজনন যোগ্য হয়। সেক্ষেত্রে তাদের থেকে দ্বিতীয় বছরে আয় আসে। প্রথম বছরে আয় পেতে হলে বড় ব্রুড সংগ্রহ করতে হয়। সেক্ষেত্রে আবার খরচ বেশি পড়ে।

নিম্নে ১ একর বা ১০০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে ব্রুড মাছ পালনের কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হলো :

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা/কেজি)	মোট টাকা
পুকুর	--------	----------	নিজস্ব
পুকুর শুকানো রোটেনন	৭ কেজি	৩৫০/-	২৪৫০/-
চুন	২০০ কেজি	১২ /-	২৪০০/-
গোবর/কম্পোষ্ট	১০০০০ কেজি	১/-	১০০০০/-
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	১৬/-	২৮৮০/-
টিএসপি	১০০ কেজি	৩২/-	৩২০০/-
সরিষার খৈল	১২০০	৩০/-	৩৬০০০/-
চালের কুঁড়া	১০০০	১০/-	১০০০০/-
গমের ভুসি	৫০০	২৫/-	১২৫০০/-
ফিশমিল	৩০০	৬০/-	১৮০০০/-
ব্রুড মাছ খামারে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা ও বন্য উৎস থেকে সংগ্রহ	১২০০	৫০/- টি	৬০০০০/-
ভিটামিন/প্রিমিক্স	----	----------	৩০০০/-
জালটানা ও শ্রমিক	------	----------	৩০০০/-
মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ	-------	----------	৩০০০/-
ডিপটারেক্স/সুমিথিয়ন	------	---------	১০০০/-
বিবিধ	-------	----------	২০০০/-
		মোট :	১৬৯৪৩০/-

আয় :

ব্রুড মাছ থেকে বিভিন্নভাবে আয় করা সম্ভব। বিভিন্ন হ্যাচারি মালিকের কাছে সরাসরি বিক্রি করে। মোট মাছ ১২০০ এর ৯০% আহরণ হার = ১০৮০ টি

প্রতিটি ব্রুড মাছের দাম ২৫০ হলে

১০৮০ ,, ,, ,, ১০৮০× ২৫০ /- = ২,৭০,০০০/= টাকা

খরচ বাদে নিট লাভ (২,৭০,০০০/= - ১৬৯,৪৩০/=) = ১,০০৫৭০/=

আবার হ্যাচারি মালিকের সাথে ব্রুড বিনিময় করে রেণু চুক্তিতে এবং পরবর্তীতে ধানী ও চারা পোনা উৎপাদন করে আরো বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব।

কার্প জাতীয় মাছের কর্মপরিকল্পনা

কৃষির যেকোনো সেক্টরের মধ্যে মাছ চাষ অধিকতর লাভজনক। দেশে প্রায় সাড়ে আঠারো লক্ষ ছোট-বড় পুকুর দীঘি রয়েছে যেখানে মাছ চাষ কার্যক্রম গ্রহণ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে।

নিম্নে ৫০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হলো :

উপকরণ	পরিমাণ	দর/কেজি	মোট টাকা
পুকুর	------	------	নিজস্ব
রোটেনন	৭ কেজি	৩৫০/-	২৪৫০/-
চুন	১০০ কেজি	১২/-	১২০০/-
গোবর/কম্পোষ্ট	৫০০০ কেজি	১.০০	৫০০০/-
ইউরিয়া	৯০ কেজি	১৬/-	১৪৪০/-
টি.এস.পি	৫০ কেজি	৩২/-	১৬০০/-
খৈল	৫০০ কেজি	৩০/-	১৫০০০/-
কুঁড়া	৫০০ কেজি	১০/-	৫০০০/-
বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা	২০০০ টি	১০/-	২০,০০০/-
জাল টানা ও অন্যান্য শ্রমিক	গুচ্ছ	গুচ্ছ	৫০০০/-
মাছ ধরা ও বাজার জাত করা	গুচ্ছ	গুচ্ছ	৫০০০/-
বিবিধ	গুচ্ছ	গুচ্ছ	৫০০০/-
		মোট :	৬৬৬১০/-

আয় :

প্রাকৃতিক খাদ্য বজায় রাখার পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য পরিমাণ মতো প্রয়োগ করলে প্রতি শতাংশে ২৫ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে মোট মাছের উৎপাদন - ৫০×২৫ = ১২৫০ কেজি

১ কেজি মাছের দাম ১৫০ টাকা হলে

১২৫০ ,, ,, ,, ১২৫০×১৫০ টাকা = ১৮৭৫০০ টাকা

উৎপাদন খরচ বাদে লাভ (১৮৭৫০০-৬৬৬৯০) টাকা = ১২০৮১০ টাকা

অর্থাৎ এক বছরে ৫০ শতাংশ পুকুর থেকে ১২০৮১০ টাকা নিট আয় হবে।

পোনা উৎপাদন পরিকল্পনা :

মাছ চাষ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন : পুকুরে বড় মাছ উৎপাদন, বিল বা হাওরে মাছ চাষ, সমন্বিত মৎস্য চাষ, মাছের পোনা উৎপাদনের মধ্যে পোনা উৎপাদন অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্প। তবে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লাভবান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা একান্ত দরকার। নিম্নে নমুনা হিসেবে পোনা উৎপাদনের কর্ম পরিকল্পনা দেওয়া হলো :

(ক) এক ধাপ পদ্ধতিতে পোনা উৎপাদন : ২০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে শতাংশপ্রতি ২৫ গ্রাম হারে রেণু মজুত এবং শতকরা ৬০% রেণু বেঁচে থাকার হিসাবে পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে :

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা/কেজি)	মোট টাকা
পুকুর	--------	---------	নিজস্ব
পুকুর শুকানো/ সংস্কার	--------	---------	৪০০০/-
চুন	৪০ কেজি	১২/-	৪৮০/-
গোবর/কমপোস্ট	৩০০ কেজি	১/-	৩০০/-
ইউরিয়া	১০ কেজি	১৬/-	১৬০/-
টিএসপি	৫ কেজি	৩২/-	১৬০/-
খৈল	২০০ কেজি	৩০/-	৬০০০/-
মুরগির ডিম	৮ টি	৭/-	৫৬/-
মিহি চালের কুঁড়া	২০০ কেজি	২০/-	৪০০০/-
সুমিথিন/ডিপটারেক্স	-------	---------	৪০০/-
রেণু	৫০০ গ্রাম	১৬০০/কেজি	৮০০/-
ময়দা	১ কেজি	৩০	৩০/-
জালটানা/শ্রমিক	----------	---------	৫০০০/-
বিবিধ	---------	---------	৫০০০/-
মোট :			= ২৯০৮৬/-

আয় :

সাধারণত ১ গ্রাম ৪০০টি পোনা হয়। উক্ত পোনার বাঁচার হার ৬০% হলে মোট পোনা = ২৪০টি। সুতরাং ৫০০ গ্রাম রেণুতে কাঙ্ক্ষিত পোনা ৫০০ × ২৪০ = ১২০০০০ টি ধানী পোনা।

৩ বা ৪ সপ্তাহ পর প্রতি হাজার ৩০০ টাকা করে ১০০০০০ পোনার বিক্রয় মূল্য= ৩০০০০/-

বাকি ২০০০০ পোনা আড়াই থেকে তিন মাস পালন করার পর প্রতি পোনা ২ টাকা হারে বিক্রয় মূল্য

(২০০০০ এর ৮০ % বাঁচার হার)

= ১৬০০০ × ২ টাকা করে

= ৩২০০০ টাকা

মোট = ৩০০০০ + ৩২০০০

= ৬২০০০/-

উৎপাদন বাদে খরচ লাভ (৬২০০০ - ২৯০৮৬)

= ৩২৯১৪/-

সুতরাং নিট লাভ ৩২৯১৪ টাকা।

যে সমস্ত পুকুর মালিকের একাধিক পুকুর রয়েছে তারা দুই ধাপ পদ্ধতি পোনা উৎপাদন করে অধিক লাভবান হতে পারে।

(খ) দুই ধাপ পদ্ধতিতে পোনা উৎপাদন : প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ শতাংশ পুকুরে, প্রতি শতাংশে ৩০ গ্রাম হারে রেণু মজুদ এবং শতকরা ৭০% রেণু বেঁচে থাকার হিসাবে পরিকল্পনা দেখানো :

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা/কেজি)	মোট টাকা
পুকুর	--------	---------	নিজস্ব
পুকুর শুকানো/ সংস্কার	--------	---------	২০০০/-
চুন	৪০ কেজি	১২/-	৪৮০/-
গোবর/কমপোস্ট	৩০০ কেজি	১/-	৩০০/-
ইউরিয়া	১৫ কেজি	১৬/-	২৪০/-
টিএসপি	৫ কেজি	৩২/-	১৬০/-
খৈল	১০০ কেজি	৩০/-	৩০০০/-
মুরগির ডিম	১২ টি	৭/-	৮৪/-
মিহি চালের কুঁড়া	১০০ কেজি	২০/-	২০০০/-
সুমিথিন/ডিপটারেক্স	-------	---------	২০০/-
রেণু	৬০০ গ্রাম	১৫০০/কেজি	৯০০/-
ময়দা	২ কেজি	৩০	৬০/-
জালটানা/শ্রমিক	----------	---------	৫০০০/-
বিবিধ	---------	---------	৫০০০/-
মোট :.....			= ১৯৪২৪/-

২০২০

আয় :

প্রতি গ্রাম রেণুতে ৪০০টি পোনা ৭০% বাচার হার হলে ২৮০টি ধানী পোনা ৬০০ গ্রাম রেণু থেকে ২৮০×৬০০ = ১৬৮০০০টি পোনা।

প্রতি হাজার ধানী পোনার বিক্রয় মূল্য ২০০ টাকা হিসেবে ১৩০০০০ পোনার দাম

=২৬০০০ টাকা।

উৎপাদন খরচ বাদে লাভ ২৬০০০-১৯৪২৪

= ৬৫৭৬/-

বাকি ৩৮০০০ পোনা কাটাই করে অন্য পুকুরে ছাড়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় : ৩০ শতাংশ পুকুরে প্রতি শতাংশে ১০০০টি ধানী মজুদ করে এবং ৮০% বেঁচে থাকার হিসেবে উৎপাদন পরিকল্পনা দেখানো হলো :

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা/কেজি)	মোট টাকা
পুকুর	------	------	নিজস্ব
পুকুর শুকানো/সংস্কার	------	------	৩০০০/-
চুন	৬০	১২/-	৭২০/-
গোবর/কম্পোস্ট	৪০০	১/-	৪০০/-
ইউরিয়া	২০	১৬/-	৩২০/-
টিএসপি	১০	৩২/-	৩২০/-
খৈল	১৫০	৩০/-	৪৫০০/-
চালের কুঁড়া	১০০	১০/-	১০০০/-
গমের ভুসি	৫০	৩০/-	১২৫০/-
ধানী পোনা	৩০০০০	৩০০/হাজার	৯০০০/-
জাল টানা/শ্রমিক	-----	------	৫০০০/-
বিবিধ	------	------	৫০০০/-
মোট			৩০৫১০/-

আয় :

৩০ হাজার ধানী পোনার ৮০% বাঁচার হার হলে ২৪ হাজার চারা পোনা পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ১টি পোনার দাম ২ টাকা হলে ২০ হাজার পোনার দাম–

২০০০০ × ২

= ৪০০০০ টাকা

অবশিষ্ট ৪ হাজার পোনা আরও তিন মাস পালন করলে প্রতি পোনার দাম ৫ টাকা হিসেবে ৪ হাজার পোনার দাম–

৪০০০×৫

= ২০০০০ টাকা

মোট বিক্রয় মূল্য ৪০০০০+২০০০০=৬০০০০ টাকা
উৎপাদন খরচ বাদে লাভ = (৬০০০০–৩০৫১০)
= ২৯৪৯০ টাকা

রাজপুঁটির চাষের কর্মপরিকল্পনা :

বর্তমানে চাষীদের মধ্যে রাজপুঁটির চাষ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ এটা মৌসুমি পুকুর, ছোট জলাশয় এবং ঘোলা পানিতেও চাষ করা যায়, ধান ক্ষেতের অল্প পানিতে চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।

এখানে ছোট পুকুর হিসেবে ২৫ শতাংশের পুকুরে থাই পুঁটি চাষের কর্মপরিকল্পনার বিবরণ দেওয়া হলো :

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা/কেজি)	মোট টাকা
পুকুর সংস্কার	থোক	থোক	১০০০/-
চুন	৫০ কেজি	১২	৬০০/-
গোবর/কম্পোস্ট	৩০০	১	৩০০/-
পোনা	২৫০০	১	৫০০০/-
ক্ষুদিপানা/অ্যাজোলা/ উৎপাদন/সংগ্রহ	থোক	থোক	৫০০০/-
ইউরিয়া	২০	১৬	৩২০/-
টিএসপি	১০	৩২	৩২০/-
কুঁড়া	১৫০০	১০	১৫০০০/-
জালটানা/শ্রমিক	থোক	থোক	২০০০/-
বিবিধ	------	------	২০০০/-
মোট :			৩১৫৪০/-

আয় :

রাজপুঁটি মাছের প্রধান খাদ্য ক্ষুদি পানা, এজোলা ও চালের কুঁড়া নিয়মিত পরিমাণ মতো দিতে পারলে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পায়।

১ শতাংশে মাছের উৎপাদন ২৫ কেজি হলে
২৫ ,, ,, ,, ২৫×২৫ = ৬২৫ কেজি
১ কেজি মাছের দাম ১০০ টাকা হলে
৬২৫ ,, ,, ,, ১০০×৬২৫ = ৬২৫০০ টাকা
উৎপাদন খরচ বাদে লাভ (৬২৫০০-৩১৫৪০) = ৩০৯৬০ টাকা

ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ চাষের কর্মপরিকল্পনা :

ক্যাটফিশ জাতীয় মাছের মধ্যে থাই পাঙ্গাশের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। কারণ এই মাছ অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। এর রোগ-বালাই কম হয় এবং জীবিত বিক্রি করা যায়। তবে অন্য মাছের চেয়ে পাঙ্গাশের খাদ্য খরচ বেশি লাগে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আংশিক অর্থাৎ ২০-২৫% পানি বদল করে দিতে হয়। এখানে নমুনা হিসেবে ৫০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে পাঙ্গাশ চাষের কর্ম পরিকল্পনা দেওয়া হলো :

উপকরণ	পরিমাণ	দর (টাকা/কেজি)	মোট টাকা
পুকুর	-----	-----	নিজস্ব
পুকুর শুকানো/রোটেনন	৭ কেজি	৩৫০	২৪৫০/-
চুন	১০০ কেজি	১২	১২০০/-
জৈব সার /কম্পোষ্ট	৩০০০ কেজি	১	৩০০০/-
ইউরিয়া	১০০ কেজি	১৬	১৬০০/-
টি.এস.পি	৫০ কেজি	৩২	১৬০০/-
খৈল	২০০০ কেজি	৩০	৬০০০/-
কুঁড়া	১০০০ কেজি	১০	১০০০০/-
ভুসি (গমের)	১০০০ কেজি	২৫	২৫০০০/-
ফিশমিল	৮০০ কেজি	৬০	৪৮০০০/-
পাঙ্গাশের পোনা	৪০০০ টি	১০	৪০০০০/-
শ্রমিক	-----	-----	নিজস্ব
মেশিন খরচ	-----	-----	১০০০/-
মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ	-----	-----	৫০০০/-
বিবিধ	------	-----	৫০০০/-
মোট :			২০৩৮৫০/-

আয় :

প্রতি শতাংশে ৭০ কেজি মাছ উৎপাদন হলে

৫০ ,, ৫০×৭০ ,, ,, ,, ,,

= ৩৫০০ কেজি

১ কেজি মাছের বাজার মূল্য ৮০ টাকা হলে

৩৫০০ ,, ,, ,, ,, ৩৫০০×৮০

= ২৮০০০০ টাকা

উৎপাদন খরচ বাদে লাভ (২৮০০০০-২০৩৮৫০) টাকা

= ৭৬১৫০ টাকা

নিট লাভ = ৭৬১৫০ টাকা।

ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে পাঙ্গাশের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্রুড মাছ বলতে কী বুঝায়?
২। ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন কী?
৩। ব্রুড মাছের ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৪। ব্রুড মাছের পুকুরের আয়তন কতটুকু হলে ভালো হয়?
৫। ব্রুড মাছের পুকুরে অতিরিক্ত কাদা থাকলে মাছের কী ক্ষতি হয়।
৬। ব্রুড মাছ কোথা থেকে সংগ্রহ করা যায়?
৭। ব্রুডের মজুদ ঘনত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?
৮। ব্রুড মাছের ঘনত্ব কত হওয়া উচিত?
৯। সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?
১০। ব্রুড মাছের পুষ্টির অভাবে কী লক্ষণ দেখা যায়?
১১। ব্রুড মাছের খাদ্যে কী পরিমাণ ভিটামিন দিতে হয়?
১২। গ্রাস কার্পের বৃদ্ধির জন্য বাড়তি কী খাদ্য দেওয়া হয়?
১৩। ব্রুড মাছের সম্পূরক খাদ্যে আমিষের ভাগ কত হওয়া উচিত?
১৪। ব্রুড মাছের পুকুরে তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?
১৫। হ্যাচারি মালিকরা ছোট ব্রুড মাছ থেকে পোনা উৎপাদনে আগ্রহী কেন?
১৬। ব্রুড মাছে কোন রোগ বেশি হয়?
১৭। মাছের উকুনের নাম কী?
১৮। আরগুলাস দমনের জন্য কী ঔষধ ব্যবহৃত হয়?
১৯। আহত মাছকে ইনজেকশন দেওয়ার জন্য কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়।
২০। ব্রুড মাছ অবচেতনের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের নাম লেখ।
২১। ব্রুড মাছের পুকুরে পানির স্বচ্ছতা কী হওয়া উচিত?
২২। কতভাবে ব্রুড মাছ পরিবহন করা যায়?
২৩। ব্রুড মাছের পুকুরে প্রতিদিন কত ঘণ্টা রোদ হলে ভালো হয়?
২৪। ব্রুড মাছের পুকুরে কী কী সার দিতে হয়?
২৫। টেকসইকরণ কী?
২৬। ব্রুড ব্যাংক কাকে বলে?
২৭। ব্রুড পালনের পুকুরের পানি কোন কোন গুণাগুণ লক্ষ্য রাখা জরুরি?
২৮। স্বল্প দূরত্বে ব্রুড পরিবহনে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়?
২৯। ব্রুড মাছ প্রতিস্থাপনের দরকার হয় কেন?
৩০। ছোট জলাশয়ে কোন মাছ চাষ লাভজনক?

৩১। সঠিক পরিকল্পনার শর্তগুলো লেখ?
৩২। মৌসুমি পুকুরে কোন কোন মাছ চাষ করা যায়?
৩৩। বাঁধের পুকুর কাকে বলে?
৩৪। পুকুর তৈরির ক্ষেত্রে মাটির নমুনা কেন পরীক্ষা করা উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পুরুষ ও স্ত্রী মাছ নির্বাচনের কৌশল লেখ।
২। ব্রুড মাছের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা কী কী?
৩। ব্রুড মাছের মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা কী কী?
৪। ব্রুড মাছের মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কী কী?
৫। ব্রুড মাছের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতীর মাছ কী অনুপাতে রাখা হয়?
৬। সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব লেখ।
৭। একই পুকুরের বিভিন্ন প্রজাতীর ব্রুড মাছের মজুদের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত?
৮। ব্রুড মাছের পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ কী কী?
৯। ব্রুড মাছের বিশেষ পুষ্টি উপাদানের নাম ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
১০। ব্রুড মাছের পুকুর প্রস্তুতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
১১। বর্তমানে হ্যাচারি পোনার সমস্যা কী?
১২। ব্রুড পরিবহনে চেতনানাশক কেন করা হয়?
১৩। মৎস্য কর্ম পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?
১৪। কর্ম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২। ব্রুড মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বর্ণনা কর।
৩। ব্রুড মাছের সম্পূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বর্ণনা দাও।
৪। ব্রুড পালন পুকুরের পানি গুণাগুণ রক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।
৫। ব্রুড মাছের পরিবহন কৌশল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬। মৎস্য পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
৭। মৎস্য পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর।
৮। ক্যাটফিশ জাতীয় মাছের কর্ম পরিকল্পনার নমুনা হিসাব দাও।
৯। পোনা উৎপাদনের পরিকল্পনার নমুনা হিসাব দাও।
১০। রাজপুঁটি মাছ চাষের পরিকল্পনার নমুনা হিসাব দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাছের কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়ন ও ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এই জলাশয়সমূহে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছের আবাস, যার মধ্যে রুই জাতীয় মাছের চাষের ব্যাপকতা বেশি। বাংলাদেশের মৎস্য চাষের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলেও প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈচিত্র্যময় মৎস্য প্রজাতি তার বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে চলছে। কালের বিবর্তনে এই ধারার কিছুটা বিচ্যুতি ঘটলেও বাংলাদেশের স্বাদুপানির মাছের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে যার মধ্যে রুই জাতীয় মাছের অবদানই সর্বাধিক। বর্তমানে চাষকৃত মাছের সামগ্রিক উৎপাদনের প্রায় ৯৯.৫% ভাগই আসছে হ্যাচারিতে উৎপাদিত কৃত্রিম রেণু পোনা থেকে এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.৫% পোনা নদী উৎস থেকে প্রাপ্ত। ফলে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার বংশগত গুণাবলি প্রাকৃতিক উৎসের পোনার অনুরূপ না হওয়ায় খামারী পর্যায়ের উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে যা ভবিষ্যতে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতীতে প্রাকৃতিক উৎস থেকেই রুই জাতীয় মাছের রেণু সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন করা হতো। কিন্তু নানাবিধ কারণে এ উৎস থেকেই মালিকগণ নিম্নমানের পোনা তৈরির দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যা মাছচাষের ক্ষেত্রে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের গুরুত্ব :

ব্রুড মাছ বলতে প্রজননে ব্যবহৃত বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে বুঝায়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পোনা উৎপাদনে ব্রুড মাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রুড ব্যাংক হলো এমন একটি স্থান যেখানে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ বা উন্নত জাতের পোনা উৎপাদনের জন্য বিপুল সংখ্যক মাছকে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে পুকুরে বা হ্যাচারিতে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত স্থান বা কেন্দ্র থেকে অন্যান্য হ্যাচারিতে ব্রুড মাছ সরবরাহ করা হয় বা পোনা উৎপাদন করে তা বিতরণ করা হয়।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা বিমোচন, কর্মসংস্থান, প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাবনাময় এ খাতের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উন্নতমানের বীজ বা পোনা উৎপাদন এবং তা মাছ উৎপাদনকারীদের সরবরাহ করা। বীজ ভালো না হলে যেমন ফসলের ফলন ভালো হয় না, তেমনি পোনা গুণগতমান সম্পন্ন না হলে পুকুর বা জলাশয়ে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ পাওয়া যায় না। অতীতে প্রাকৃতিক উৎস থেকে রুই জাতীয় মাছের রেণুপোনা সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন করা হতো। কিন্তু নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট কারণে এ উৎস থেকে আহরণ কমে গেছে। অপর দিকে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ

কার্যক্রমের ব্যাপকতার জন্য মাছ চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় রেণু পোনার চাহিদা বেড়েছে। এ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দেশে সরকারি এবং বেসরকারি হ্যাচারি মিলিয়ে নয় শতাধিকের ঊর্ধ্বে হ্যাচারি গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননের কেন্দ্র ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনই হলো পোনা প্রাপ্তির প্রধান উৎস। কৃত্রিম প্রজননের জন্য উন্নতমানের গুণসম্পন্ন ব্রুডই হলো ভালো পোনা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। মাছের কৃত্রিম প্রজনন দেশে রেণু ও পোনা প্রাপ্তিতে বিশেষ অবদান রাখছে। রেণু পোনা উৎপাদনে পরিমাণগত অগ্রগতি হলেও এর গুণগত মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। গুণগত বৈশিষ্ট্যের অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ব্রুড মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক নির্বাচন ও পরিচর্যার অভাব, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অধিক মুনাফা লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত সংকরায়ণ সহ অপরিপক্ব মাছের কৃত্রিম প্রজনন। ফলে পোনার কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অবনতি হওয়ায় মৎস্য চাষিরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা মাছ-চাষের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইদানীং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, দৈহিক বিকৃতি, রোগ-বালাই এবং ব্যাপক পোনা মৃত্যুহার সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে ধারণা করা হচ্ছে পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন, প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাইয়ে অসচেতনতা (অর্থাৎ ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা) এবং অপরিকল্পিত সংকরায়ণজনিত কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি/ বেসরকারি হ্যাচারিগুলোতে উৎপাদিত পোনার গুণগত মান দিন দিন কমে যাওয়ার পিছনে মৎস্য বিজ্ঞানীরা যে কারণকে বিশেষভাবে দায়ী করছেন তার মধ্যে অন্তঃপ্রজনন হলো অন্যতম। বংশগতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রজননকে অন্তঃপ্রজনন বলা হয়। হ্যাচারিতে এ সমস্যা দু'ভাবে হতে পারে।

* বংশগত ভাবে অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছের প্রজনন ঘটানোর মাধ্যমে।
* একই ব্রুড থেকে উৎপাদিত ভাই-বোন সম্পর্ক পোনা বড় করে এদের মধ্যে প্রজনন ঘটানো।

অন্তঃপ্রজননের ফলে কৌলিকতাত্ত্বিক সমসত্ত্বতার মাত্রা (Degree of Homozygosity) বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৌলিতাত্ত্বিক অসমসত্ত্বতার (Degree of Homozygosity) মাত্রা কমতে থাকে। কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ভাই-বোন সম্পর্কের মাছের মধ্যে প্রজননে এক জেনারেশনেই সব গুণাগুণের শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পায় এবং জেনারেশন থেকে জেনারেশনে অবক্ষয়ের এ ধারা চলতে থাকে। অনুরূপভাবে মা ও ছেলে এবং মেয়ে ও পিতা সম্পর্কের মাছের মধ্যে প্রজনন ও কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় দেখা দেয় অর্থাৎ পিতা-মাতা বংশগতভাবে যতটা ঘনিষ্ঠ হবে পরবর্তী বংশধরের উপর কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের প্রভাবের মাত্রা তত বেশি হবে। ফলে মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস, বিকলাঙ্গতা, রোগ-বালাইয়ের সমস্যা, ডিমের সংখ্যা (Facundity) কমে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় । তাছাড়া ব্রুড মাছের ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা (Negative Selection), অপরিকল্পিত সংকরায়ণ, অপরিণত (Immature)

মাছের প্রজনন ইত্যাদি কারণে ও উৎপাদিত পোনা শারীরিকভাবে দুর্বল হয় যা অধিক হারে পোনা মৃত্যুর কারণসহ কাঙ্ক্ষিত ফলন দিতে ব্যর্থ হয়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশে ৬টি বিভাগের ১২টি হ্যাচারি/ খামারে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু সংগ্রহ করে উন্নতমানের ব্রুড উৎপাদনপূর্বক সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের নিকট স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে।

ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পের আওতাধীন হ্যাচারি/খামারের তালিকা :

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	হ্যাচারি/ খামারের নাম ও অবস্থান
১.	রাজশাহী	নাটোর	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, নাটোর সদর, নাটোর।
২.		জয়পুরহাট	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৩.	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।
৪.		কিশোরগঞ্জ	কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ।
৫.	খুলনা	মাগুরা	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাগুরা সদর, মাগুরা।
৬.		ঝিনাইদহ	কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
৭.	চট্টগ্রাম	বি-বাড়ীয়া	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বি-বাড়িয়া সদর, বি-বাড়িয়া।
৮.		কুমিল্লা	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
৯.	সিলেট	হবিগঞ্জ	কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কুর্শি, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
১০.		সুনামগঞ্জ	কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
১১.	বরিশাল	পটুয়াখালী	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।
১২		ঝালকাঠি	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।

ব্রুড ব্যাংকের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে :

i. নদীর উৎস থেকে বন্য জাতের মাছ (Wild Palsm) (রুই জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে হালদা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ নদী) সংগ্রহ করে সংগৃহীত স্টকের মধ্যে নির্বাচিত প্রজনন (Selective Breeding) বা লাইন ক্রসিং (Line Breeding) কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত জাতের ব্রুড মাছ উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ii. যথাসম্ভব সকল সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারিসমূহকে উন্নত জাতের ব্রুড স্টক সংরক্ষণ, ব্যবহার ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা।

iii. আগ্রহী উদ্যোক্তা, হ্যাচারি মালিক/হ্যাচারি অপারেটর ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপকদের উন্নতমানের মাছের পোনা উৎপাদনের কলাকৌশল ও কারিগরি পরামর্শ প্রদানের উৎস হিসেবে কাজ করা।

iv. বিলুপ্তপ্রায় (Endangered) দেশিয় রুই জাতীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন ও দেশের বিভিন্ন হ্যাচারিতে তা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

v. ব্রুড স্টক ও সার্বিক হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দেশের সরকারি হ্যাচারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারি অপারেটরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

রুই জাতীয় মাছের কৌলিতাত্ত্বিক তথা বংশগতিধারা যে সমস্ত কারণে বিনষ্ট হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান অনুঘটক হচ্ছে–

অন্তঃপ্রজনন :

বংশগতভাবে নিকট সম্পর্কের স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রজননকে অন্তঃপ্রজনন বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিগুলোতে উৎপাদিত পোনার গুণগতমান দিন দিন কমে যাওয়ার পেছনে অন্তঃপ্রজনন হলো অন্যতম। এই অন্তঃপ্রজননের ফলে কৌলিতাত্ত্বিক সমস্বত্বতার মাত্রা (Degree of Homozygosity) বৃদ্ধি পেতে থাকে। হ্যাচারিতে অন্তঃপ্রজনন দুই উপায়ে ঘটতে পারে। যেমন–

১. বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটানো।

২. একই ব্রুড মাছ থেকে উৎপাদিত ভাই-বোন সম্পর্কীয় মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটানো।

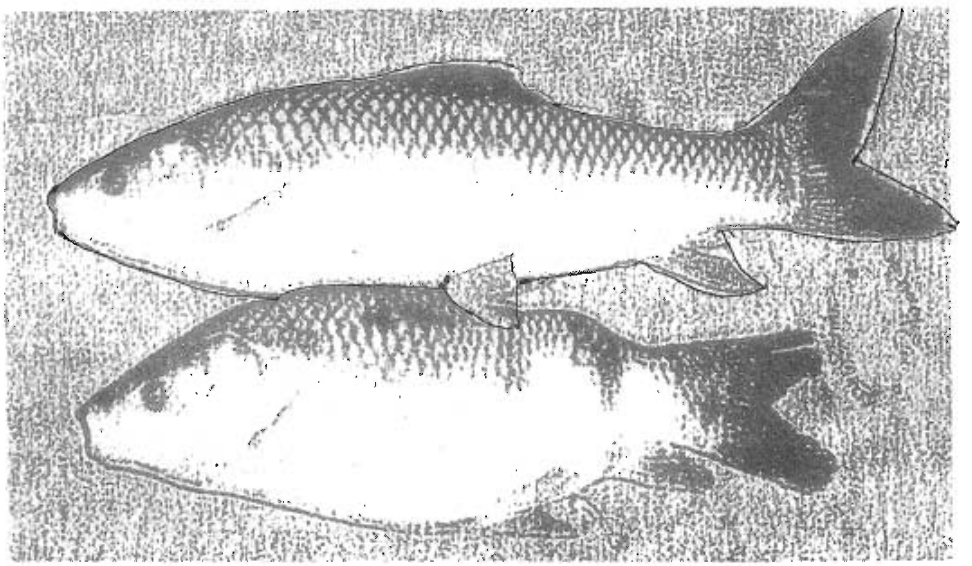

চিত্র : সুস্থ সবল ব্রুড এবং অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যায়ন পতিত

কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণা করে দেখা গেছে যে, ভাই-বোনের প্রজননের ফলে উৎপাদিত মাছ প্রতিটি বংশধারায় তার মূল বৈশিষ্ট্যের শতকরা ২৫ ভাগ হারিয়ে ফেলে, এই ক্রসকে সিব ক্রস (Sib Cross) বলে। সিব ক্রসের ফলে

উৎপাদনশীলতা হ্রাস, বিকলাঙ্গতা, রোগবালাইয়ের সমস্যা, ডিমের সংখ্যা কমে যাওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উন্মেষ ঘটে। অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করতে হবে।

১). প্রজননের জন্য উপযুক্ত বয়স ও ওজনের ব্রুড মাছ ব্যবহার করা : প্রজননের জন্য ছোট আকারের ব্রুড মাছ ব্যবহার পরিহার করতে হবে। প্রজননক্ষম ব্রুড মাছ নির্বাচনে প্রতিটি মৎস্য প্রজাতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত বয়স ও ওজনের জন্য সুনির্দিষ্ট মান অনুসরণ করা উচিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন হ্যাচারিতে নানা প্রজাতির ব্রুড মাছ ব্যবহার করা হয়। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির প্রজননোপযোগী বয়স ও ওজনের একটি ছক নিচে দেওয়া হলো :

প্রজাতির নাম	সর্বনিম্ন ওজন (কেজি)	বয়স (বছর)
কাতলা	৪+	৩+
রুই	১.৫+	২+
মৃগেল	১.৫+	২+
কালবাউস	১+	২
সিলভার কার্প	২+	২+
গ্রাসকার্প	৩+	২+
কমন কার্প	১.৫+	১+
ব্লাককার্প	৬	৫+
সরপুঁটি	.৫+	১

হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদনে কৌলিতাত্ত্বিক সমস্যা ও প্রতিকার

২) হ্যাচারি সমূহের মধ্যে ব্রুড মাছ বিনিময় : সম্ভব হলে প্রতি বছর বা প্রতি দুই/তিন বছর অন্তর অন্তর এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে এক হ্যাচারির পুরুষ মাছ অন্য হ্যাচারির স্ত্রী মাছের সাথে বিনিময়ই উৎকৃষ্ট পন্থা। এটিও নিশ্চিত হতে হবে যে, বিনিময়যোগ্য ব্রুড মাছ যেন হ্যাচারিসমূহের নিজস্ব উৎপাদন হয়।

৩) দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরি করা : হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা থেকে ব্রুড মাছ তৈরি করতে হলে যতটা সম্ভব প্রজাতিভেদে বেশি লট উৎপাদন করা প্রয়োজন। প্রত্যেক জোড়া ব্রুড থেকে প্রাপ্ত পোনার সংখ্যাকে একটি করে লট ধরা যেতে পারে। এ থেকে দ্রুত বর্ধনশীল অল্প সংখ্যক আঙ্গুলী পোনা বাছাই করতে হবে। অনেকগুলো লট থেকে বাছাইকৃত পোনাগুলোকে একসাথে করে আলাদা পুকুরে ব্রুড স্টক হিসেবে পরিচর্যা করতে হবে। তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের মাছ থেকে ব্রুড তৈরি করা মোটেই সমীচীন হবে না।

৪) প্রাকৃতিক উৎস থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা : প্রতি তিন বছর বা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বা হালদা প্রভৃতি নদী থেকে পোনা সংগ্রহ করে ব্রুড স্টক তৈরি করা সম্ভব হলে খুব ভালো হয়। এসব স্টক থেকেও দ্রুত বর্ধনশীল পোনা আলাদা করে ব্রুড মাছ তৈরি করা আবশ্যক। এসব ব্রুড থেকে উৎপাদিত মাছের পোনা স্বাভাবিকভাবে উৎপাদনে সহায়ক হতে পারে।

৫) অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছ ব্যবহার না করা : অতি ঘনিষ্ঠ বলতে বংশগতভাবে অত্যন্ত কাছাকাছি অর্থাৎ একই জোড়া ব্রুড মাছ থেকে প্রাপ্ত ভাই-বোন সম্পর্কের পোনা বা এসব পোনা বড় করে মা/বাবা সম্পর্কীয় ব্রুডের সাথে প্রজনন ঘটানোর কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। এই ব্যাপারে হ্যাচারি অপারেটরদের অবশ্যই পোনা বা ব্রুডের স্টক শনাক্ত করে অন্তঃপ্রজনন প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬) সংকরায়ণের উদ্যোগ পরিহার করা : ভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে অপরিকল্পিত সংকরায়ণে যেহেতু বংশপর্যায়ে স্টক নিম্নমানের হয়ে কম উৎপাদনশীলতার সমস্যা বা এদের প্রভাবে দেশীয় স্টকের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাই ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারি অপারেটরদের এই প্রচেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

৭) হ্যাচারির সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা : উল্লেখিত বিষয়সমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি হ্যাচারি অপারেটরগণ তাদের হ্যাচারির ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বিশেষ নজর দেবেন। কেননা আদর্শ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার দ্বারাই হ্যাচারির সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সকল হ্যাচারি অপারেটরদের মেনে চলা অত্যাবশ্যক-

i. পরিমিত সংখ্যক ব্রুড মাছ মজুদকরণ;
ii. ব্রুড মাছের পুকুরে নিয়মিত পানি সরবরাহকরণ;
iii. ব্রুড মাছের পুকুরে সুষম খাদ্য প্রয়োগ;
iv. ব্রুড মাছের রোগ-বালাই শনাক্তকরণ ও চিকিৎসাকরণ;
v. পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া;
vi. ইনকিউবেশন পুল বা জারে পরিমিত পরিমাণ ডিম মজুদকরণ;
vii. ইনকিউবেশন পুল বা জার নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
viii. নার্সারি পুকুরে পরিমিত সংখ্যক রেণুপোনা মজুদকরণ এবং তার ব্যবস্থাপনা।

৮) চক্রক্রমিক লাইন ক্রসিং পদ্ধতি ব্যবহার : চক্রক্রমিক লাইন ক্রসিং পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্তঃপ্রজনন দূর করা যায়।

৯. কুলনামা (Pedigree) : কুলনামা হলো ফ্যামিলি পরিচিতি, যার মাধ্যমে আমরা মাছের বংশপরম্পরায় যাবতীয় তথ্য যেমন– মাছের পূর্ব ইতিহাস, উৎস, সংগ্রহের সময়কাল, বয়স, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সহজে জানা যায়।

কুলনামা সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ :

i) মাছের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। যেমন : উৎস / প্রাপ্তি, সংগ্রহের তারিখ, বয়স, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

ii) মাছগুলো ব্রুড হিসাবে কতবার হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

iii) কোনো কোনো স্টক এর মাছ প্রজনন অক্ষয় তা সহজেই নিরূপণ।

iv) পরিবেশগত কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল কি না তা জানা।

v) কোনো প্রজাতির মাছ নতুন করে ব্রুড হিসেবে প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।

iv) অন্তঃপ্রজনন ঘটানোর সুযোগ কম থাকে।

নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ দূষণের ফলে জলাশয়গুলোতে আজ অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বিরাজমান। এর ফলে, মাছের রোগ-বালাই বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক বন্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্লাবনভূমি ও উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, নদী-নালার গভীরতা হ্রাস, ধানক্ষেতে বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগ, বিভিন্ন জলাশয়ে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নিধনের প্রবণতা ইত্যাদি কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ে দেশের মৎস্য উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এই অবস্থায় মৌসুমি ও মেয়াদি পুকুর, দীঘি, ডোবা, ছোটখাটো বিল ও অন্যান্য প্লাবনভূমিতে প্রযুক্তিনির্ভর চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে হ্যাচারিতে মাছের কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহারযোগ্য ব্রুড মাছ ও উৎপাদিত পোনার স্টকে সম্ভাব্য কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়জনিত সমস্যা এই সম্ভাবনার পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের মূল্যবান মৎস্যসম্পদকে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্যে উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ ও রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা এই সম্পদ রক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

জেনেটিক ড্রিফ্‌ট (Genetic Drift)

জেনেটিক ড্রিফ্‌ট হচ্ছে বংশগতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা কার্যোপযোগী ব্রুড সংখ্যার কার্যক্রম। এটি হচ্ছে কোনো একটি জনতার জিন বা এলিলের পরিবর্তন ঘটানো অর্থাৎ কোনো জীবের প্রকৃত জিন-এর ঘটন সংখ্যার পরিবর্তন যা ব্রুড স্টকের ঋণাত্মক নির্বাচন কিংবা অসম প্রজনন প্রক্রিয়ায় (অন্তঃপ্রজনন, নির্বাচন, নমুনায়ন) ঘটে থাকে। এটি শুধু জিনের ঘটন সংখ্যার পরিবর্তনই করে না তার সাথে জিন বা এলিল জনতা থেকে হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জেনেটিক ড্রিফটের ফলে কোনো জীবের তথা মৎস্যকুলের নিম্নোক্ত ক্ষতিসাধিত হয়ে থাকে :

১। জেনেটিক ড্রিফ্‌ট জনতার বাঁচার সামর্থ্যকে কমিয়ে দেয়;

২। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

অন্যদিকে হ্যাচারিতে এটি সাধারণত এক বংশধর থেকে অন্য বংশধরের জন্য নির্বাচন অর্থাৎ বাছাই করলে তখন নমুনায়ন ত্রুটিজনিত কারণে জেনেটিক ড্রিফ্‌ট ঘটে থাকে। এটি নিম্নলিখিত উপায়ে দূর করা যায় :

১। কার্যোপযোগী ব্রুডের সংখ্যা বাড়িয়ে অর্থাৎ কোনো হ্যাচারিতে যদি কার্যোপযোগী ব্রুডের সংখ্যা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে প্রজননের মাত্রা বাড়বে এবং পাশাপাশি জিনের হ্রাসের প্রবণতা কমবে।
২। বিভিন্ন বাছাইকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে জেনেটিক ড্রিফ্‌ট কমানো যায়।

ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা (Negative Selection)

আমাদের দেশের বেশিরভাগ হ্যাচারি অপারেটর নিজেদের নার্সারি বা খামারের উৎপাদিত মাছের পোনার সিংহভাগ বিক্রয়ের পর অবিক্রিত পোনা নিজস্ব পুকুরে লালন-পালন করে থাকে। আবার এসব পোনার মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল পোনাগুলো বেশি লাভের আশায় বিক্রি করে দেয়। আর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের কম বর্ধনকিল পোনা নিজের পুকুরে ব্রুড হিসেবে তৈরি করে পরবর্তীতে প্রজনন ঘটানো হয়। ব্রুড মাছ বাছাইয়ে এই অসচেতনতামূলক কার্যক্রমকে বলে ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা। ঋণাত্মক নির্বাচনের ফলে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনায় নিম্নোক্ত বৈসাদৃশ্যগুলো পরিলক্ষিত হয়:
১. উৎপাদিত পোনাসমূহ বংশগত কারণেই অনুন্নত ও নিম্নমানের হয়।
২. মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা দেয়।

ঋণাত্মক নির্বাচন নিম্নোক্ত উপায়ে দূর করা যায়–
১. সে সমস্ত হ্যাচারিতে উন্নত জাতের ব্রুড মাছ রয়েছে সে সমস্ত হ্যাচারি হতে ব্রুড বিনিময় করা;
২. দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরি করা।
৩. ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত ব্রুড মাছ সংগ্রহ/উৎপাদন করা।

সংকরায়ণ (Hybridzation)

দুইটি প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে পিতা-মাতার চেয়ে ভালো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরায়ণ বলে এবং নতুন জাতটিকে বলা হয় সংকর বা হাইব্রিড। সংকরায়ণের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবন একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। সংকরায়ণ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা পিতা-মাতার তুলনায় উন্নত বৈশিষ্ট্যের বংশধর সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। পরিকল্পনাহীন সংকরায়ণের ফলে শুদ্ধ জাতের বিপর্যয় ঘটাই স্বাভাবিক। সেজন্য তা থেকে বেসরকারি হ্যাচারি মালিক/অপারেটরদের বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে আইন প্রনয়ণ করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের হ্যাচারিগুলোকে সংকরায়ণ একটি সাধারণ পদ্ধতি যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অধিক মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে সংকর জাতের মাছের পোনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিপক্ব মাছ হয়ে প্রজনন কার্যক্রম অংশগ্রহণ করালে জিনের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য তখনই যখন পিতা-মাতার তুলনায় উন্নত বৈশিষ্ট্যের বংশধর সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পরিকল্পনাহীন সংকরায়ণের ফলে শুদ্ধজাতের বিপর্যয় ঘটে থাকে। কাজেই পরিকল্পনাহীন সংকরায়ণ বেসরকারি হ্যাচারি মালিক বা অপারেটর কর্তৃক সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে, প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। রুই জাতীয় মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বাংলাদেশের হ্যাচারিগুলো পোনা তৈরিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক উৎসের প্রজনন ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উপর এ দেশের মৎস্য চাষ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

জিন ইনট্রোগ্রেশন (Gene Introgression)

দু'টি প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণের ফলে উৎপাদিত পোনা উভয় প্রজাতির জিনই বহন করে থাকে। এভাবে ক্রমাগত উভয় প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণের ফলে একটি প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতিতে অনুপ্রবেশ হওয়াকে জিন ইন্ট্রোগ্রেশন বলে। জিন ইন্ট্রোগ্রেসড মাছ যদি উন্মুক্ত জলাশয়ে চলে যায় এবং সেখানে কোনো কারণে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, তাহলে একদিকে যেমন মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হারাবে, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশে মৎস্য জনতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। বংশগত অবক্ষয় (Genetic Erosion) নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নির্বাচিত জেনেটিক মার্কার (Selected Genetic Marker) তৈরি করা হলেও বাংলাদেশে এর উপর কোনো গবেষণা অদ্যাবধি করা সম্ভব হয়নি। প্রতি বছর বন্যার কারণে হ্যাচারি বা চাষের পুকুর থেকে প্রচুর সংখ্যক হাইব্রিড বা সংকর জাতের মাছ উন্মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক স্টকের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে রেণু/পোনা সংগ্রহ করে quality assisted marker দিয়ে পরীক্ষা করে জিন ইন্ট্রোগ্রেসড মাছের উপস্থিতি জানা প্রয়োজন।

উত্তরণের উপায়

১. হ্যাচারিতে রুই-এর সাথে কাতলা, রুই-এর সাথে মৃগেল ইত্যাদি সংকর জাতের মাছ তৈরি করা বন্ধ করতে হবে;
২. সংকর জাতের মাছ যাতে প্রাকৃতিক উন্মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত বা চলে যেতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে;
৩. হ্যাচারিতে ব্রুড পরীক্ষা করে বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

উন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনা

রুই জাতীয় মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য ব্রুড জাতীয় মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য ব্রুড ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত উপায়ে করা যায় :

i) প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ

প্রাকৃতিক উৎস যেমন হালদা, যমুনা, পদ্মা ইত্যাদি নদী থেকে রেণুপোনা সংগ্রহ করে সঠিকভাবে বাছাই ও প্রতিপালনের মাধ্যমে ব্রুড তৈরিপূর্বক কৃত্রিম প্রজনন ঘটানোর ফলে যে পোনা পাওয়া যায় সেগুলো দ্রুত বর্ধনশীল উন্নত গুণসম্পন্ন হয়। এসকল পোনা হতে উন্নত ব্রুড স্টক তৈরি করা যায়।

ii) পুকুর থেকে সংগ্রহ

অন্তঃপ্রজননমুক্ত ব্রুড হতে হ্যাচারিতে স্বাস্থ্যবান এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড স্টক তৈরির জন্য রাখা উচিত। এক্ষেত্রে রুই জাতীয় মাছের ওজন ও বয়স নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

প্রজাতি	বয়স	ওজন
রুই	২+	১.৫+ কেজি
কাতলা	৩+	৪.০+ কেজি
মৃগেল	২+	১.৫+ কেজি
কালবাউশ	২+	১.০+ কেজি

উৎস : মাছের কৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়ন ও ব্রুড স্টক ব্যবস্থাপনা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

ব্রুড মাছ পরিচর্যা :

পুকুর নির্বাচন : পুকুরের আয়তন ০.৫০ থেকে ১.০০ একর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এর পানির গভীরতা ৫-৭ ফুট হওয়া দরকার।

পুকুর প্রস্তুতি : এক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ও আমাছা মাছ নির্মূল করতে হবে। এরপর পুকুর শুকানোর পর প্রতি শতাংশে ১.০-১.৫ কেজি হারে পাথুরে চুন/ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। তারপর পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর সাত দিন পর প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৭৫-১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০ গ্রাম এমপি সার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রুড মজুদ : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়ার পর একর প্রতি ৬০০-৭০০ কেজি ব্রুড মজুদ করা যেতে পারে। এভাবে রুই জাতীয় মাছের ব্রুড ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

ব্রুড ব্যবস্থাপনা

ব্রুডের উৎস : কার্প জাতীয় মাছের ব্রুডের উৎস হলো হালদা, যমুনা ও পদ্মা। তবে উন্নত ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক সময় নদীর উৎসের পোনা হতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এছাড়া বিক্রেতারা অসাধু ব্যবসা ও অধিক লাভের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর সাথে হ্যাচারি হতে উৎপাদিত পোনা মিশিয়ে বিক্রি করে বলে চাষিরা কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পায় না। যদি প্রথমবার নদীর উৎস থেকে ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন পোনা থেকে ব্রুড তৈরি করা যায় তবে সেই ব্রুড থেকে পর্যায়ক্রমিক লাইন ক্রসিং এবং বিভিন্ন লাইনভিত্তিক জেনারেশন তৈরি করে ৫-৭ বছর উন্নত গুণগত সম্পন্ন পোনা উৎপাদন করা সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন একই মা-বাবা মাছের ভাই-বোনদের মধ্যে ক্রসিং না হয়।

ব্রুডের লালন ও মজুদ

বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছের পোনা তৈরির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রায় হ্যাচারিতেই সেজন্য প্রজননক্ষম ব্রুডের সংখ্যা দরকারের তুলনায় কম থাকে অথবা প্রজননক্ষম পুরুষের সংখ্যা অনেক কম থাকে। আবার কিছু কিছু হ্যাচারি মালিকগণ হ্যাচারি পরিচালনার ২-৩ মাস আগে বিভিন্ন অজানা উৎস থেকে অসুস্থ, পুষ্টিহীন বিভিন্ন আকারের ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে রেণু তৈরির কাজে ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে উৎপাদিত রেণু পরবর্তীতে মাছ চাষে তেমন একটি ভালো ফলন দিতে পারে না।

উন্নত ব্রুড প্রাপ্তির জন্য ব্রুড ব্যাংক স্থাপন

সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন ব্রুড, ব্রুডের ব্যবস্থাপনা ও সংকরজাত তৈরির বিষয়ে হ্যাচারির মালিকগণ কার্যত তেমন একটা খেয়াল বা গুরুত্ব দেয় না। বাংলাদেশে নয় শত এর অধিক সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি রয়েছে, যার মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক ২০-৩০টি হ্যাচারি/মৎস্য খামার যদি শুধুমাত্র ব্রুড মাছ উৎপাদন করে এবং কৌলিতাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ব্রুড হ্যাচারিতে সরবরাহপূর্বক রেণু উৎপাদন করে কেবলমাত্র তখনই পোনার গুণাগুণ ভালো থাকবে এবং কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশে মাছের উন্নত বংশগতিধারা বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক :

১. মাছের পোনা তৈরির জন্য হ্যাচারিগুলোর রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করা;
২. সরকারি এবং বেসরকারি হ্যাচারিতে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু/পোনা থেকে ব্রুড তৈরির ব্যবস্থা থাকা;
৩. বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য প্রজননক্ষম ব্রুডের সংখ্যা (Net) ৫০-৫০০ এর মধ্যে রাখতে হবে;
৪. হ্যাচারিতে ব্রুডের কুলনামার (Pedigreed) রেকর্ড রাখতে হবে;
৫. হ্যাচারিতে প্রথমে রেণু/পোনা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ব্রুড অবশ্যই প্রাকৃতিক উৎসের হতে হবে;
৬. হ্যাচারিতে ব্রুডের সংখ্যা কমে গেলে অন্য হ্যাচারি থেকে ব্রুড সংগ্রহের সময় ব্রুডের গুণগত বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেওয়া;
৭. পর্যায়ক্রমিক লাইন ক্রসিং-এর মাধ্যমে অন্তঃপ্রজননের মাত্রা ১২.৫% এর নিচে রাখতে হবে;
৮. প্রতি বছর হ্যাচারির ১০-২০% ব্রুড প্রাকৃতিক উৎসের রেণু/পোনা থেকে উৎপাদিত ব্রুড দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে;
৯. সংকর জাতের মাছ তৈরি করা বন্ধ করতে হবে; এবং
১০. উন্নত ব্রুড সরবরাহের জন্য স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করতে হবে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত রেণু পোনা থেকে ব্রুডমাছ উৎপাদন কার্যক্রম (Production of Breeders from Wild Collected Spawn) :

মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদনের নিমিত্তে প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাঁটি রেণু (Pure Wild Spawn) সংগ্রহ করতে হবে। উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদনের সফলতার প্রাথমিক শর্ত হলো প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহের গুরুত্বের উপর। রেণু থেকে প্রজননক্ষম উন্নত ব্রুডমাছ উৎপাদন করতে পাঁচটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহের পর মজুদের পূর্বে আঁতুড় পুকুর যথাযথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, যেমন পুকুর শুকানো, চুন প্রয়োগ, পুকুর থেকে সকল প্রকার মাছ অপসারণ, (হ্যাচারির পূর্বের মজুদের থেকে পৃথক রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি), সাবধানতার সাথে পানি দ্বারা পুকুরভর্তি, সার প্রয়োগ ও মাছের খাবার প্রদান ইত্যাদি। ব্রুড মাছ উৎপাদনের প্রতিটি ধাপের পূর্বে একই ভাবে প্রতিটি পুকুরের প্রস্তুতি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

ধাপ-১: প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন (Fry Production from Wild Collected Spawn)

পোনা উৎপাদনের এ ধাপে খুবই সাবধানতার সাথে সরাসরি প্রাকৃতিক উৎস থেকে পরিমাণমত রেণু পোনা সংগ্রহ করে খামারের নার্সারি পুকুরে ৩৫ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নসহকারে পালন করতে হবে। এ পর্যায়ে রেণুপোনা থেকে ধানী পোনা উৎপাদনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। রেণুপোনা মজুদের প্রথমদিকে পোনার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য বিশেষ করে প্রাণিকণা (Zooplankton) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন জৈব-অজৈব

সারের মিশ্রণ (গোবর-১০ কেজি, টিএসপি-৩০০ গ্রাম এবং ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া ৪০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতিবিঘা) ছিটিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া প্রথম পাঁচ দিন সয়াবিনের খৈল পানিতে মিশায়ে ২ কেজি/বিঘা/প্রতিদিন হারে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্যে অবশ্যই ৩০% আমিষ থাকা প্রয়োজন। এ খাদ্য নিম্নোক্ত খাদ্য উপাদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা যেতে পারে। যেমন: চালের কুঁড়া-১৮%, সরিষার খৈল-৪৬%, গমের ভুসি-১৪%, ফিশ মিল-২১% ও ভিটামিন প্রি-মিক্স-১%। প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োগের হার হবে শরীরের ওজনের ৫% থেকে ৮% যথাক্রমে ২ গ্রাম হতে ২০ গ্রাম পোনার ওজন পর্যন্ত। এবাবে ৩৫ দিন পর্যন্ত প্রতিপালন করতে হবে। ৩৫ দিন পর পুকুরের সকল পোনা মাছ আহরণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত পোনা হতে সবচেয়ে ভালো ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন (Best one) ২৪% পোনা মাছ (প্রতিটির গড় ওজন প্রায় ২ গ্রাম) বাছাই করতে হবে। অবশিষ্ট ৭৬% পোনা মাছ খামার থেকে সরিয়ে (Discard) ফেলতে হবে তবে প্রয়োজনে অন্য খামারসমূহে বিতরণ করা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নার্সারি পুকুর থেকে যদি ১০০০০টি পোনা আহরণ করা হয়ে থাকে তা'হলে সেখান থেকে সবচেয়ে ভালো মানের (Best one) ২৪০০টি পোনা মাছ বাছাই করে পুকুরে পরবর্তী ধাপের জন্য মজুদ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৬০০টি পোনা মাছ বাতিল (Discard) করতে হবে বা অন্য হ্যাচারিতে বিতরণ করতে হবে।

ধাপ-২ : আঙ্গুলে পোনা উৎপাদন (Fingerling production from fry)

ধাপ-১ হতে নির্বাচিত (Best one) পোনা (প্রতিটি গড়ে প্রায় ২ গ্রাম ওজন) লালন পুকুরে মজুদ করতে হবে এবং এ ধাপে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ধাপ-১ অনুযায়ী খাবার প্রয়োগ করে আরও ৬০ দিন পর্যন্ত পালন করতে হবে। এ পর্যায়ে ৬০ দিন পর পুকুরের সকল আঙ্গুলে পোনা আহরণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত পোনার মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো এবং সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন (Best one) ৫৮% পোনা মাছ (প্রতিটির গড় ওজন প্রায় ২০ গ্রাম) বাছাই করতে হবে। সাধারণত এ পর্যায়ে পোনার ওজন প্রায় ২০ গ্রাম ওজনের হতে পারে। অবশিষ্ট ৪২% মাছ খামার থেকে সরিয়ে (Discard) ফেলতে হবে তবে প্রয়োজনে অন্য খামারে বিতরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পূর্ববর্তী ধাপের (ধাপ-১ হতে) মজুদকৃত ২৪০০ টি পোনা পুনরায় ৬০ দিন পালন করার পর ১৯২০টি পোনা পাওয়া গেছে (সম্ভাব্য বাঁচার হার ৮০%)। আহরণকৃত ১৯২০ টি পোনা থেকে সবচেয়ে ভালো মানের (Best one) ১১১৪ টি পোনা মাছ বাছাই করে পুকুরে পরবর্তী ধাপের জন্য মজুদ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৮০৬ টি পোনা মাছ বাতিল (Discard) করতে হবে বা অন্য হ্যাচারিতে বিতরণ করতে হবে।

ধাপ-৩ : নলা মাছ তৈরি (Advance Fingerling Production)

ধাপ-২ থেকে নির্বাচিত (Best one) আঙ্গুলে পোনা (প্রতিটির গড় ওজন প্রায় ২০ গ্রাম) পালন পুকুরে মজুদ করতে হবে এবং এ ধাপে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আরও ১২০ দিন পালন করতে হবে। এ পর্যায়ে মাছের

শরীরের ৫% হারে ধাপ-১ বর্ণিত সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে। ১২০ দিন পর পুকুরের সকল নলা-মাছ আহরণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত মাছের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো এবং সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন (Best one) ৫০% নলা-মাছ (প্রতিটির গড় ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম) বাছাই করতে হবে। অবশিষ্ট ৫০% মাছ খামার থেকে সরিয়ে (Discard) ফেলতে হবে তবে প্রয়োজনে অন্য খামারে বিতরণ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক পূর্ববর্তী ধাপের (ধাপ-২ হতে) মজুদকৃত ১১১৪টি পোনা ১২০ দিন পালন করার পর ১০০২টি নলা মাছ পাওয়া গিয়েছে (সম্ভাব্য বাঁচার হার ৯০%)। আহরণকৃত ১০০২টি পোনা থেকে সবচেয়ে ভালো মানের (Best one) ৫০১ টি নলা-মাছ বাছাই করে পরবর্তী ধাপের জন্য পুকুরে মজুদ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৫০১ টি নলা মাছ বাতিল (Discard) করতে হবে বা অন্য হ্যাচারিতে বিতরণ করা যেতে পারে।

ধাপ-৪ : ব্রুড মাছের জন্য ১ কেজি ওজনের মাছ তৈরি (Brood Fish Candidate Production to 1 kg)

ধাপ ৩ থেকে নির্বাচিত (Best one) নলা মাছ (প্রতিটির গড় ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম) পালন পুকুরে মজুদ করতে হবে এবং এ ধাপে পূর্বের ন্যায় আরও ১৪০ দিন লালন করতে হবে। এ পর্যায়ে ১৪০ দিন পর পুকুরের সকল মাছ আহরণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত মাছের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো এবং সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন (Best one) ৬৫% মাছ (প্রতিটির গড় ওজন প্রায় ১ কেজি) বাছাই করতে হবে। অবশিষ্ট ৩৫% খামার থেকে সরিয়ে (Discard) ফেলতে হবে তবে প্রয়োজনে অন্য খামারে বিতরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পূর্ববর্তী ধাপ (ধাপ-৩ থেকে) বাছাই করা মজুদকৃত ৫০১টি নলা মাছ ১৪০ দিন পালন করার পর ৪৫১টি মাছ পাওয়া গেছে (সম্ভাব্য বাঁচার হার ৯০%)। আহরণকৃত ৪৫১টির মধ্য থেকে ১ কেজি ওজনের সবচেয়ে ভালো মানের (Best one) ২৯৩টি মাছ (৬৫%) বাছাই করে পুকুরে পরবর্তী ধাপের জন্য পুকুরে মজুদ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ১৫৮/ টি (৩৫%) মাছ বাতিল (Discard) বা অন্য হ্যাচারিতে বিতরণ বা সরবরাহ করতে হবে।

ধাপ-৫ : ব্রুড মাছের জন্য ২ কেজি ওজনের মাছ তৈরি (Brood Fish Candidate Production to 2 kg)

ধাপ-৪ থেকে নির্বাচিত (Best one) প্রতিটি ১ কেজি ওজনের মাছ পুকুরে মজুদ করতে হবে এবং এ-ধাপে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আরও ২৭৫ দিন পালন করতে হবে। এ পর্যায়ে ২৭৫ দিন মাছের শরীরের ওজনের ৫% হারে ২৫% আমিষ সম্পন্ন সম্পূরক খাবার প্রদান করতে হবে। উক্ত খাবার নিম্নোক্ত উপাদান দ্বারা তৈরি করা যাবে। ফিশ মিল-১৬%, সরিষার খৈল-১০%, সোয়াবিন খৈল-২৪%, চালের কুঁড়া-২০%, গমের ভুসি-১৯%, আটা-৫%, মোলাসেস-৫% ও ভিটামিন প্রি-মিক্স-১%। ২৭৫ দিন পর পুকুরের সকল মাছ আহরণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত মাছের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো এবং সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন (Best one) ৭৬% প্রতিটি

গড়ে প্রায় ২কেজির উপরের ওজনের মাছ বাছাই করতে হবে। অবশিষ্ট ২৪% মাছ খামার থেকে সরায়ে (Discard) ফেলতে হবে তবে প্রয়োজনে অন্য হ্যাচারির মাছে বিতরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পূর্ববর্তী ধাপ (ধাপ-৪) হতে বাছাই করা ২৯৩টি মজুদকৃত মাছ ২৭৫ দিন পালন করার পর ২৬৩টি মাছ পাওয়া গিয়াছে (সম্ভাব্য বাঁচার হার ৯০%) আহরণকৃত ২৬৩টির মধ্য থেকে ২ কেজি ওজনের সবচেয়ে ভালো মানের (Best one) ২০০টি মাছ বাছাই করে পুকুরে পরবর্তী প্রজননে অংশগ্রহণের জন্য ব্রুড মাছের জন্য মজুদ করতে হবে। অবশিষ্ট ৬৩টি মাছ বাতিল (Discard) করতে হবে বা অন্য হ্যাচারিতে বিতরণ করতে হবে।

এ পর্যায়ে পৌঁছতে অর্থাৎ গড়ে প্রায় দুই কেজি ওজনের ব্রুডমাছ তৈরি করতে প্রায় দুই বছরব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ করে ব্রুড তৈরির ক্ষেত্রে সতর্কতা সমূহ :

প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করার সময় অবশ্যই উৎসস্থলে উপস্থিত থেকে নদী থেকে আহরণের সময় সংগ্রহ করতে হবে। কোনোক্রমেই আহরণকারীদের পূর্বের সংগৃহীত রেণু নেয়া যাবে না কেননা প্রায়শই বিক্রেতাগণ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

প্রতিটি ধাপে ধাপে মাছ বাছাইয়ের জন্য খামার ব্যবস্থাপকগণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন, মাছ আহত না হয়। মাছ বাছাইয়ের সময় মাছকে যদি বেশি নড়াচড়া করা হয় তাহলে এদের দেহের বৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে। প্রতিটি পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পুকুর প্রস্তুতি, মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে। যারা প্রথম ধাপের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন না তাঁরা অবশ্যই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনাধীন কোনো খামারের সাথে যোগাযোগ করে প্রাকৃতিক উৎস থেকে মজুদকৃত রেণু থেকে উৎপন্ন ভালো পোনা সংগ্রহ করে ধাপ-২ থেকে কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন।

উপরে বর্ণিত ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট হারে পোনা এবং মাছ বাছাই করাই কৌলিতাত্ত্বিক উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদনের আদর্শ পদ্ধতি তবুও প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ বিষয় হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক উৎসের সকল পোনা মাছই কৌলিতাত্ত্বিক দিক থেকে বৈচিত্র্যময় এবং ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন মাছ। সেজন্য বাছাইকৃত মাছের পর অবশিষ্ট মাছগুলোকে বাতিল না করে অন্যান্য খামার/হ্যাচারিতে ব্রুড মাছের জন্য বিতরণ বা সংরক্ষণ করাই উত্তম কেননা উক্ত ব্রুড মাছ অবশ্যই হ্যাচারিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত ব্রুডের চেয়ে উন্নততর। তবে অবশ্যই বিকলাঙ্গ এবং তুলনামূলকভাবে খুব ধীর গতির বৃদ্ধির পোনাকে বাতিল করতে হবে।

১০০০টি পরিপক্ব ব্রুড মাছ উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্তভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে :
উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১০০০ টি ২ কেজি ওজনের উন্নত ব্রুডমাছ উৎপাদনের জন্য প্রথম ধাপে কমপক্ষে ৫০০০০ টি পোনা উৎপাদন করতে হবে। উক্ত পোনা উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে ২ থেকে ৩ কেজি রেণু পোনা সংগ্রহ করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে রেণু পোনার পরিমাণ বেশি মনে হলেও বাস্তবতার আলোকে অনেক সময়ই রুই জাতীয় মাছের পোনার হার খুবই নগন্য হতে পারে (অন্যান্য অবাঞ্ছিত মাছের পোনার উপস্থিতি বেশি এমনকি বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকণাসহ অন্যান্য প্রাণীও থাকতে পারে), তাছাড়া ওজনের তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথম ধাপে রেণু পোনা মজুদের ৩৫ দিন পর প্রাপ্ত ৫০০০০টি (বেশিও হতে পারে) পোনা হতে ২৪% অর্থাৎ ১২০০০টি সবচেয়ে ভালো পোনা দ্বিতীয় ধাপের জন্য বাছাই করতে হবে ও পুকুরে মজুদ করতে হবে।

ধাপ-১ হতে বাছাইকৃত ১২০০০টি পোনা দ্বিতীয় ধাপে ৬০ দিন পরিচর্যা করার পর সাধারণত ৯৬০০টি পোনা (সম্ভাব্য বাঁচার হার প্রায় ৮০%) পাওয়া যেতে পারে। উক্ত পোনা থেকে ৫৮% অর্থাৎ প্রায় ৫৫৭০টি সবচেয়ে ভালো পোনা তৃতীয় ধাপের জন্য বাছাই করতে হবে ও পুকুরে পুনরায় মজুদ করতে হবে।

ধাপ-২ থেকে বাছাইকৃত ৫৫৭০টি পোনা তৃতীয় ধাপে ১২০ দিন পরিচর্যা করার পর সাধারণত ৫০০০টি নলা মাছ (সম্ভাব্য বাঁচার হার প্রায় ৮০%) পাওয়া যেতে পারে। উক্ত নলা মাছ থেকে ৫০% অর্থাৎ প্রায় ২৫০০টি সবচেয়ে ভালো নলা-মাছ চতুর্থ ধাপের জন্য বাছাই করতে হবে ও পুকুরে পুনরায় মজুদ করতে হবে।

ধাপ-৩ হতে বাছাইকৃত ২৫০০টি পোনা চতুর্থ ধাপে ২৪০ দিন পরিচর্যা করার পর সাধারণত ২২৫০টি গড়ে ১ কেজি ওজনের মাছ (সম্ভাব্য বাঁচার হার প্রায় ৯০%) পাওয়া যেতে পারে। উক্ত নলা মাছ হতে ৬৫% অর্থাৎ ১৪৬২টি সবচেয়ে ভালো মাছ পঞ্চম ধাপের জন্য বাছাই করতে হবে ও পুকুরে পুনরায় মজুদ করতে হবে।

ধাপ-৪ থেকে বাছাইকৃত ১৪৬২টি পোনা পঞ্চম ধাপে ২৭৫ দিন পরিচর্যা করার পর সাধারণত ১৩১৬টি গড়ে ২ কেজি ওজনের মাছ (সম্ভাব্য বাঁচার হার প্রায় ৯০%) পাওয়া যেতে পারে। উক্ত মাছ হতে ৭৬% অর্থাৎ ১০০০টি সবচেয়ে ভালো মাছ বাছাই করতে হবে ও ব্রুডমাছের পুকুরে পুনরায় মজুদ করতে হবে। এই ১০০০টি মাছই হবে কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণসম্পন্ন উন্নত ব্রুড মাছ। এদের ব্রুডমাছ হিসাবে পরবর্তী বছর থেকে প্রজননে অংশ গ্রহণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত বন্য স্টক এবং জিন পুল পৃথকভাবেক সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ :
নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের অপারেটরদের নিকট উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-১

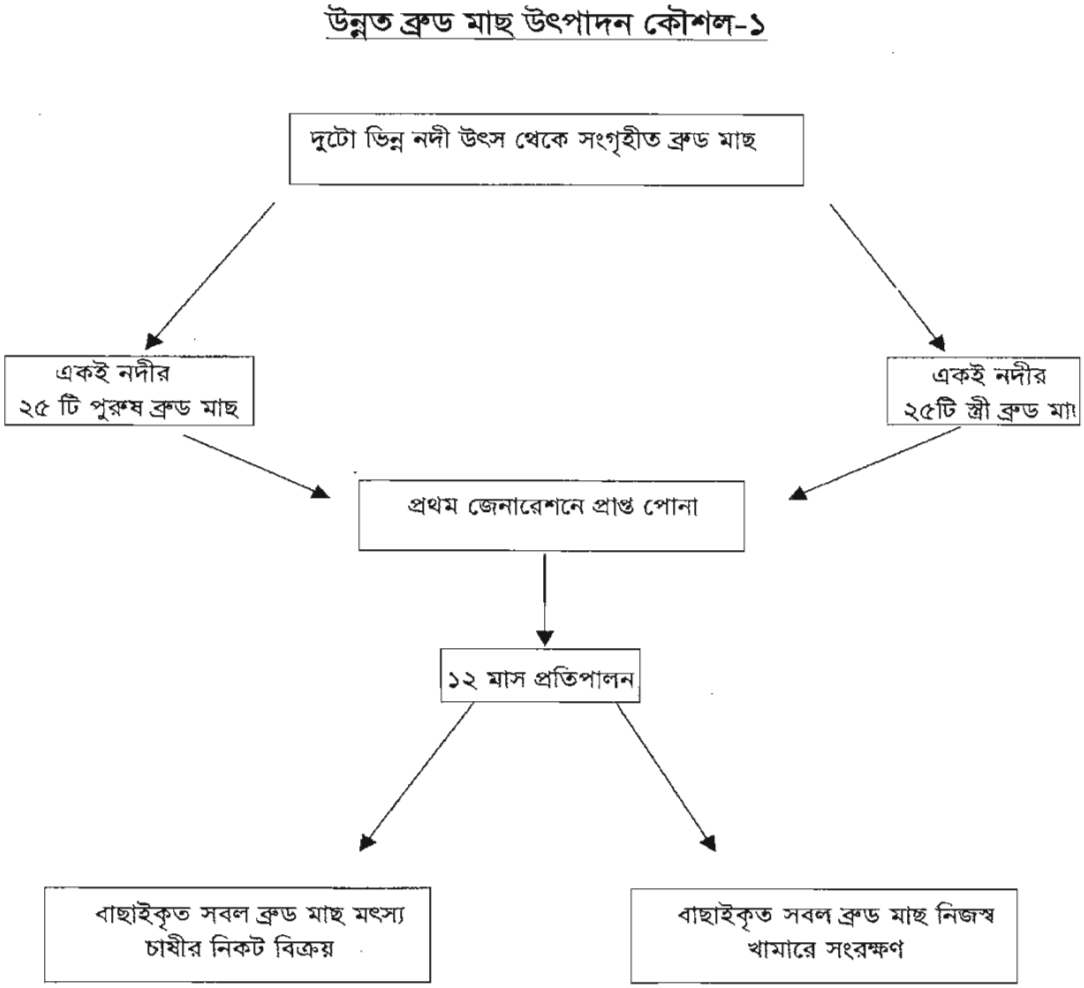

চিত্র -উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-১

উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-২

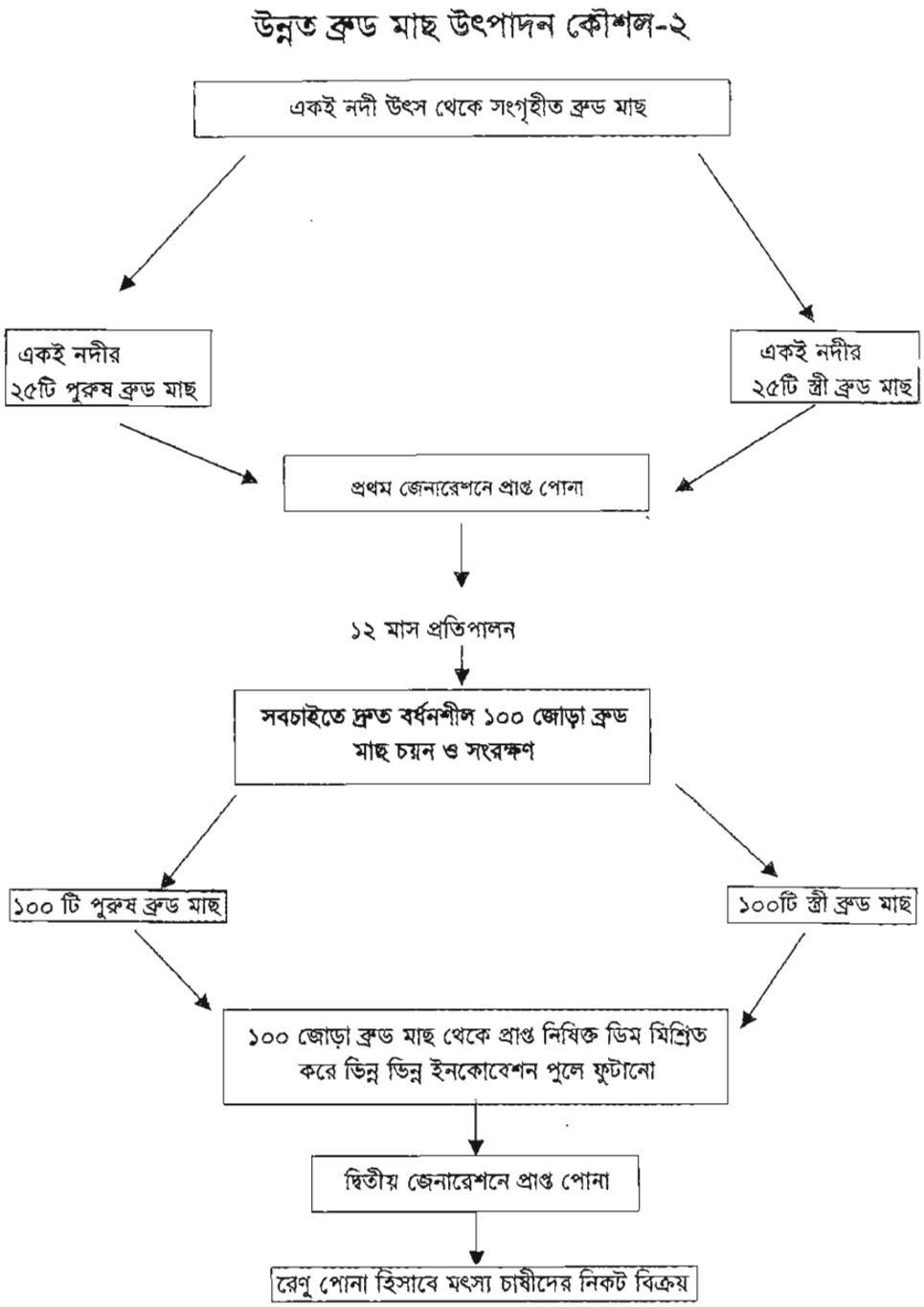

চিত্র : উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-২

২০২০

উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-৩

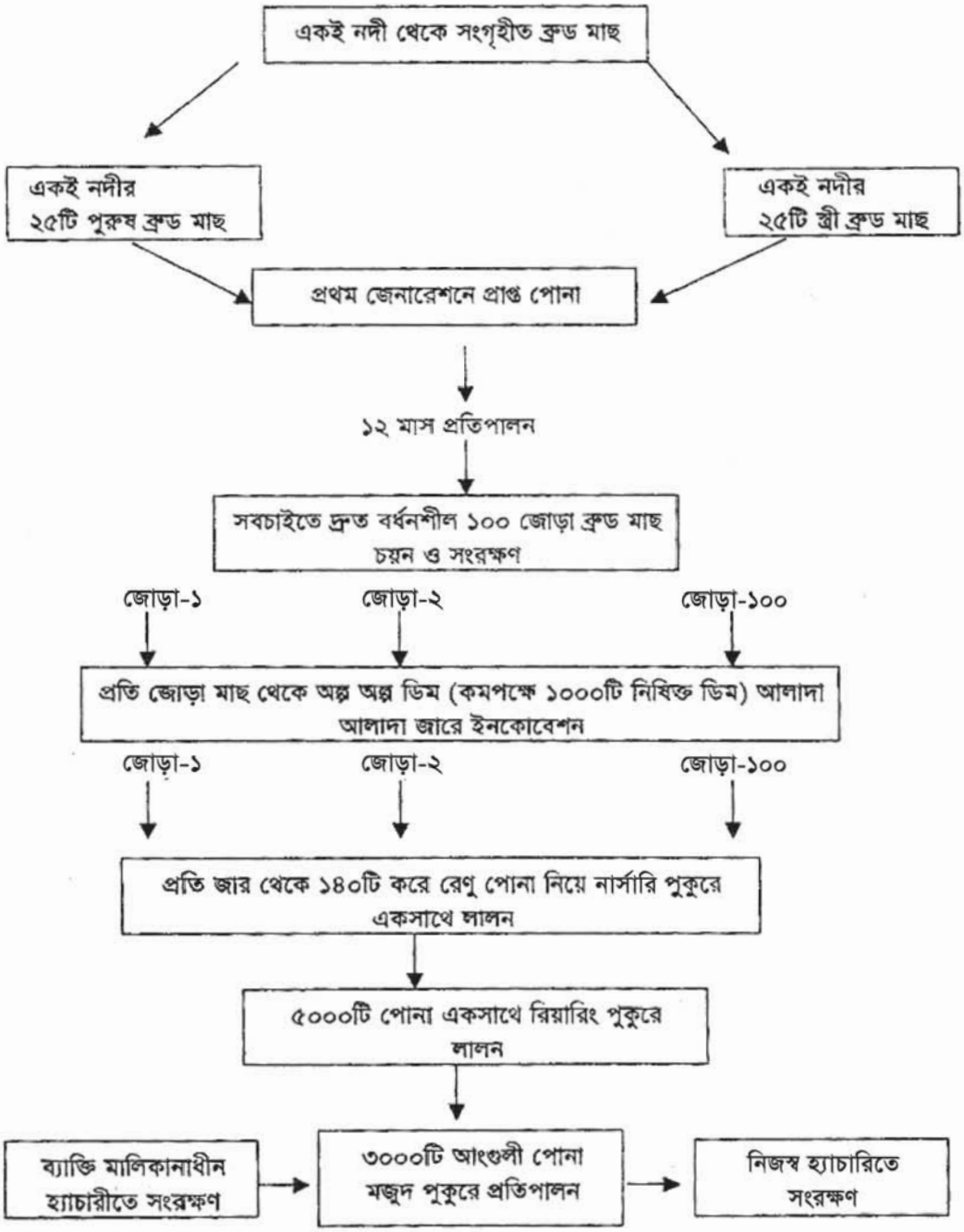

চিত্র : উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-৩

উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-৪

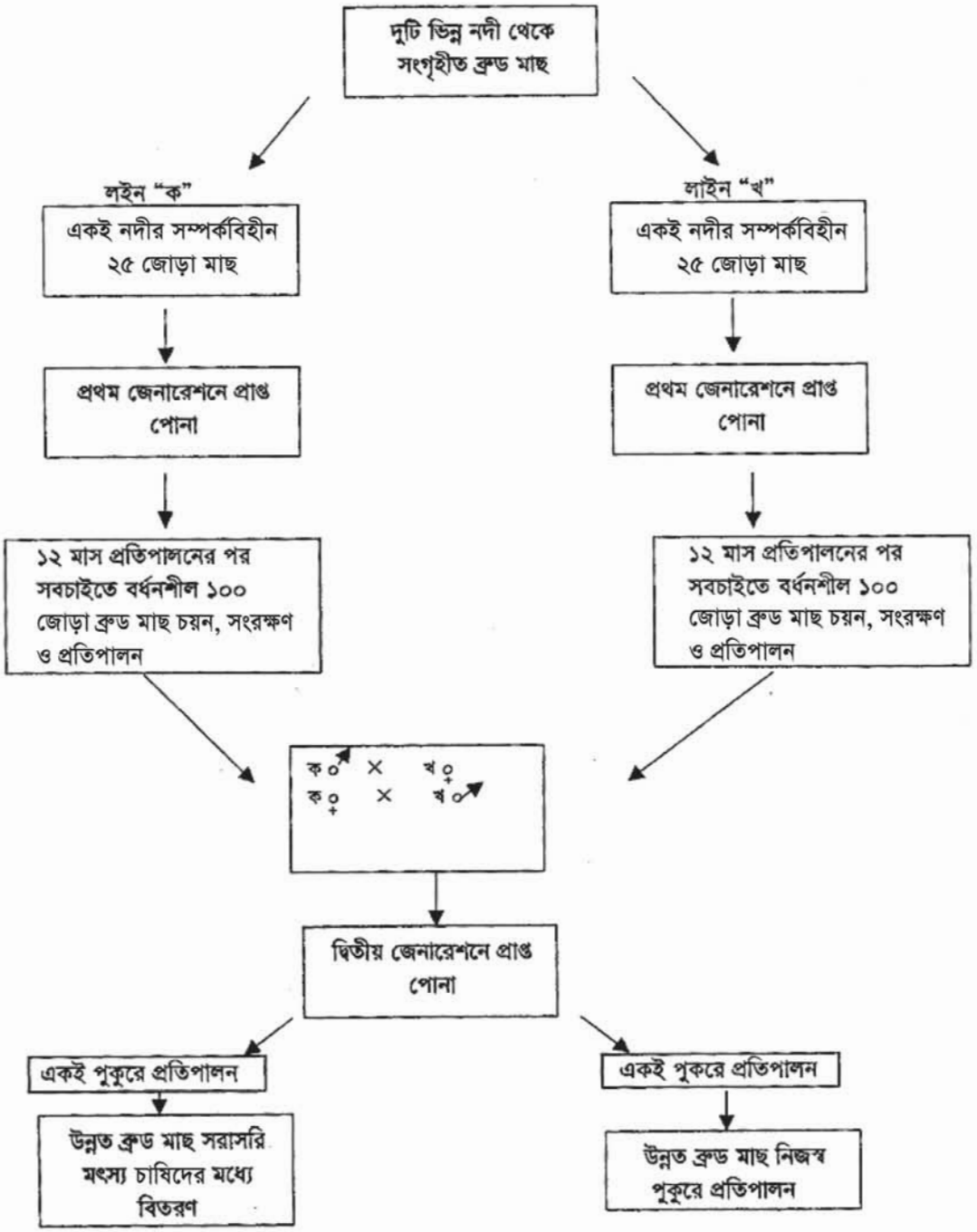

চিত্র : উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন কৌশল-৪

২০২০

প্রশ্নমালা-২

এক কথায় উত্তর দাও

১। ব্রুড মাছ কাকে বলে?

২। ব্রুড ব্যাংক কাকে বলে?

৩। অন্তঃ প্রজনন কী?

৪। সংকরায়ণ পরিহার করা জরুরি কেন?

৫। সিবক্রস কী?

৬। ঋণাত্মক নির্বাচন বলতে কী বুঝায়?

৭। বাংলাদেশের কয়টি হ্যাচারি আছে?

৮। কূলনামা কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্রুড ব্যাংকের স্থাপনের গুরুত্ব লেখ।

২। ব্রুড ব্যাংকের স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

৩। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে কীভাবে ব্রুড মাছ তৈরি করা যায়?

৪। জেনেটিক ড্রিফট কী? এর ফলে মাছের কী ক্ষতি হয়?

৫। মাছের জাত উন্নয়নে হাইব্রিডাইজেশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৬। সংকরায়ণ বা হাইব্রিডাইজেশন কাকে বলে? এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অন্তঃপ্রজননের ফলে মাছের কী সমস্যা দেখা যায়? এর সমাধানের উপায়গুলো লেখ।

২। রেণু থেকে উন্নত ব্রুড মাছ তৈরিতে কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয় বর্ণনা কর?

৩। প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ করে ব্রুড তৈরির ক্ষেত্রে কী কী সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়?

৪। ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা কাকে বলে? এর ফলে কি হয়? সমাধানের উপায় লিখ।

৫। জিন ইনট্রোগেশন কাকে বলে? এ ফলে কী হয়? সমাধানের উপায় লেখ।

৬। উন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৭। মাছের উন্নত বংশগতি ধারা বজায় রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

তৃতীয় অধ্যায়
পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছ পরিপক্বতা লাভ করে ও ডিম দেয়। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। হরমোন প্রয়োগে মাছের কৃত্রিম প্রজনন করা হচ্ছে। কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত হরমোন বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি অন্যতম উৎস। পিটুইটারি গ্লান্ড বা গ্রন্থিকে সংক্ষেপে পিজি (PG) বলা হয়।

পিজি সংগ্রহের জন্য মাছ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহের পূর্বে যে মাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে সে মাছ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জেনে নিতে হবে।

দাতা মাছের বৈশিষ্ট্য :

যে মাছ থেকে পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয় তাকে দাতা মাছ বলে। ব্রুড মাছকে প্রজননে প্রণোদিত করার ক্ষমতা অনেকাংশে দাতা মাছ নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। আর সে কারণেই দাতা মাছ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে হবে।

ক) দাতা মাছের পরিপক্বতার ধাপ (Stage of maturity of the donor fish) :

কৃত্রিম প্রজননের জন্য সম্পূর্ণ যৌন পরিপক্ব মাছ থেকে পিজি সংগ্রহ করতে হবে কারণ প্রজনন ঋতুতে একটি প্রজননক্ষম মাছের পিজি সব চাইতে বেশি কার্যকর বা কর্মক্ষম। প্রজননের পরে পিজির কার্যক্ষমতা কমে যায়। যে মাছ ডিম ছেড়ে দিয়েছে বা মাছের যৌনতা পরিপক্বতা নয় সে মাছের পিজির ক্ষমতা খুবই কম। দেশি কার্প জাতীয় মাছ যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদির পিজি মে-জুলাই মাসের মধ্যে সংগ্রহ করলে অধিক শক্তিশালী পিজি পাওয়া যায়। কমন কার্প বা কার্পিও মাছ একটি উল্লেখযোগ্য দাতা মাছ কারণ এরা প্রায় সারা বছর যৌন পরিপক্ব থাকে। এ মাছে পিজির আকারও তুলনামূলকভাবে বড়।

খ) দাতামাছের অবস্থা (Condition of donor fish) :

জীবিত বা সদ্য মেরে ফেলা হয়েছে এরকম মাছ থেকে পিজি সংগ্রহ করা অধিক ভালো। তাজা জীবিত মাছ অপর্যাপ্ত হলে যে সকল মাছ তাজা অবস্থায় কোল্ড স্টোরেজ রাখা হয়েছিল সে রকম মাছ থেকেও পিজি সংগ্রহ করা যাবে। যে মৃত মাছকে ১-৩° সে. তাপমাত্রায় ২৫ ঘণ্টা রাখা হয়েছিল সে রূপ মাছ থেকে কার্যকর পিজি সংগ্রহ করা যায়।

গ) পিজির উৎস (Source of pituitary gland) :

পুরুষ অথবা স্ত্রী যে কোনো মাছ থেকেই পিজি সংগ্রহ করা যায়। যে মাছের পিজি ব্যবহার করা হবে ঐ একই প্রজাতির মাছ থেকে সংগৃহীত পিজি বেশি কার্যকর। একই প্রজাতির না হলেও সমগোত্রীয় যে কোনো মাছ থেকে ও পিজি সংগ্রহ করা যেতে পারে। এমনকি মাছ ছাড়াও অন্যান্য শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীর পিজি ও মাছে প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্যাটফিশ বা মাগুর জাতীয় মাছের পিজি কার্প জাতীয় মাছের প্রজননে ব্যবহার করা যেতে পারে আবার তার বিপরীত ভাবেও সম্ভব। দূরসম্পর্কীয় মাছ থেকে সংগৃহীত পিজির ইনজেকশনের ডোজ বা মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিতে হয়।

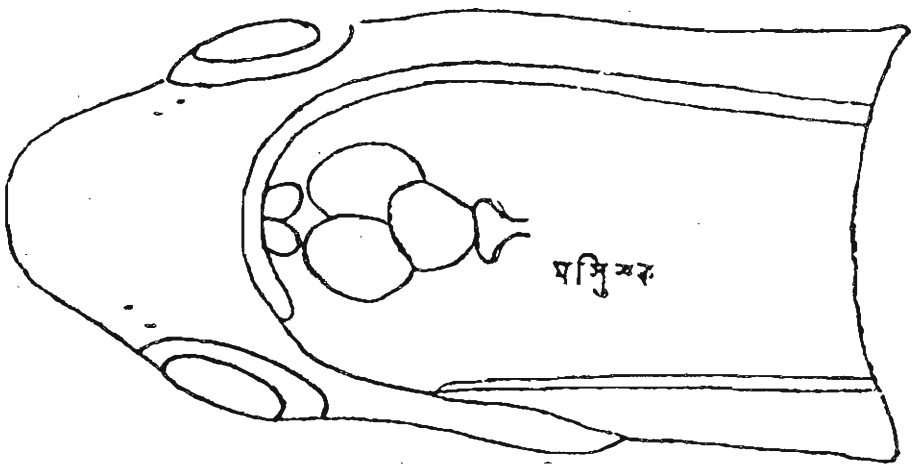

চিত্র : মাছের মস্তিষ্ক

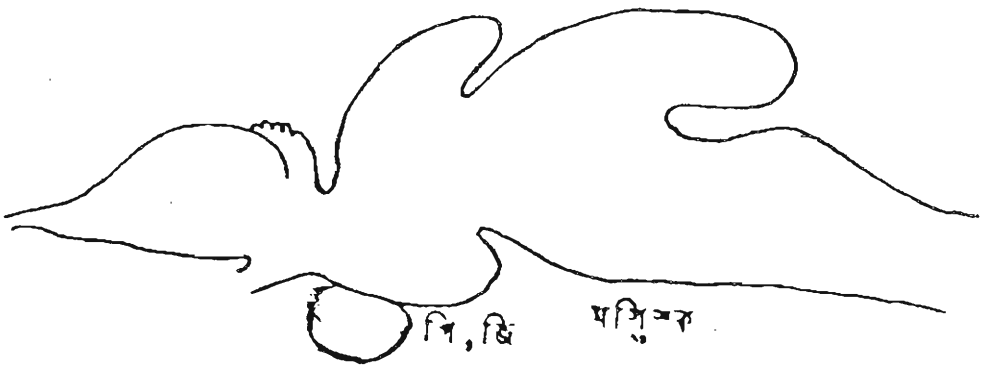

চিত্র : মস্তিষ্কের নিচে পিজির অবস্থান
(লম্বচ্ছেদ দেখানো হয়েছে)

২০২০

পিজি সংগ্রহ পদ্ধতি :

পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহের জন্য মাছকে উপুড় করে অর্থাৎ পিঠ উপরে ও পেট নিচ অবস্থায় ধরে রাখতে হবে। এজন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে। মাথার খুলির কিছু অংশ উপর থেকে হাত করাত দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। ছোট মাছের ক্ষেত্রে হাড় কাটার (bone cutter) দিয়েও খুলি তুলে ফেলা যায়। খুলি তুলে ফেলতেই মস্তিষ্কের উপর ধূসর চর্বি জাতীয় পদার্থ দেখা যাবে। তুলা দিয়ে ধূসর পদার্থ পরিষ্কার করতে হবে। ইহাতে মস্তিষ্কের উপর পৃষ্ঠ পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। মস্তিষ্কের সামনের দিকে অবিস্থত অলফ্যাকটরি (নাসিকা) নার্ভ ও অপটিকা (চক্ষু) নার্ভ চিমটা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এখন মস্তিষ্কটিকে উঠিয়ে পিছনের দিকে ফেলে দিতে হবে। পিজি মস্তিষ্কের নিচের অপটিক কায়জমার (দুটি চক্ষু স্নায়ু একে অপরের বিপরীতে দিতে চলে যায় ফলে সেগুলো এক জায়গায় মিলিত হয়। যাকে অপটিক কায়জমা বলে) পিছনে অপস্থিত। কোনো কোনো মাছের ক্ষেত্রে পিজি মস্তিষ্কের সাথে লেগে থাকে ফলে মস্তিষ্ক উঠানোর সময় ব্রেইনের সাথে পিজি ও উঠে আসে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্ক উঠালে পিজি তার অবস্থানেই থেকে যায়। কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে পিজি একটি পাতলা পর্দা দ্বারা মস্তিষ্ক থেকে পৃথক থাকে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মস্তিষ্ক ওঠানোর সময় পর্দাসহ পিজি ব্রেইনের সাথে মিশে না যায়। চিমটা দিয়ে পর্দাটি সাবধানে পিছনের দিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এর ফলে পিজি উন্মুক্ত হবে পিজিটিকে সুক্ষ্ম চিমটা বা সুচের সাহায্যে খুব সাবধানে গর্ত থেকে তুলে কোনো পেট্রিডিশে ১০০% ইথানলে রাখতে হবে। পিজিটিকে অক্ষত রেখে এর গায়ে লেগে থাকা মাংসপেশি বা রক্ত পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষতপ্রাপ্ত পিজির কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

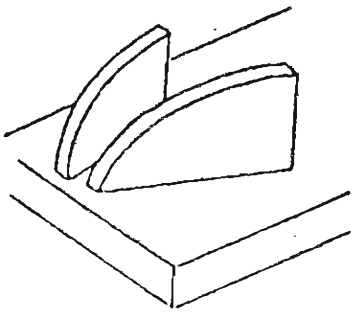

চিত্র : ক. মাছের মাথা বসাবার জন্য কাঠের ফ্রেম

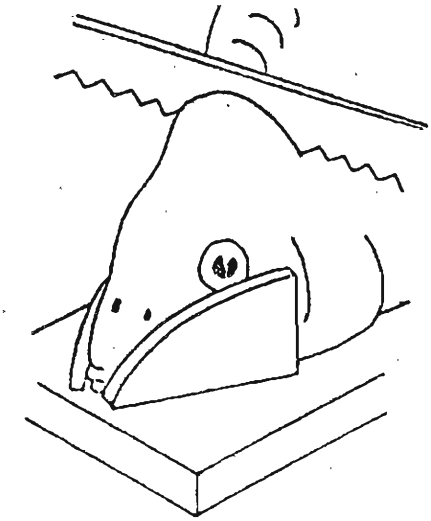

খ. পিজি সংগ্রহের জন্য হাড় করাত দিয়ে মাছের মাথা কাটা হচ্ছে

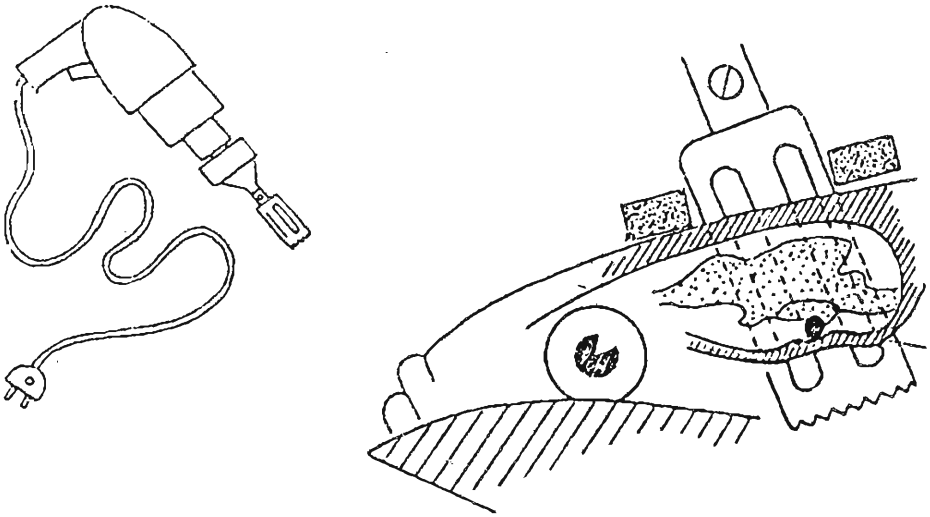

চিত্র : বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে পিজি সংগ্রহ

চিত্র : মাছের মাথার খুলির অংশের নিচে পি. জি.-এর অবস্থান দেখানো হচ্ছে

বাণিজ্যিকভাবে এক সময়ে অনেক বেশি সংখ্যক মাছের মাথা থেকে পিজি সংগ্রহর জন্য বিদ্যুৎচালিত করাত ব্যবহার করা সুবিধাজনক। গর্ত করার জন্য গোলাকার করাত দিয়ে মাছের মাথার খুলির নির্দিষ্ট অংশ কেটে বের করে আনা হয়। মাছের মাথার সঠিক জায়গায় গর্ত করার সুবিধার জন্য একটি তক্তায় আগে ছিদ্র করে নিতে হয়। মাছের মাথাকে আটকাবার জন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার করা হয়। ফ্রেমে মাছের মাথা রেখে ছিদ্র করা তক্তা মাথার উপর চেপে ধরে তক্তার ছিদ্র অনুসারে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে গর্ত করলে মাথার খুলি পিজিসহ গোলাকার টুকরা আকারে উঠে আসে। করাতের সাহায্যে মাছের মাথা হতে পিজি বের করে আনার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বড় মাছের জন্য বড় আকারের করাত এবং ছোট মাছের জন্য ছোট আকারে করাত ব্যবহার করা হয়। এক কেজি ওজনের মাছের জন্য ২.৫ সে.মি., ৩-৪ কেজি ওজনের মাছের জন্য ৪ সে.মি. এবং ৫-৬ কেজি ওজনের মাছের জন্য আরও বড় আকারের গোলাকার করাত ব্যবহার করা হয়। গোল করে কাটা টুকরা থেকে সহজেই কাঁচি ও চিমটা ব্যবহার করে পিজি পৃথক করা যায়।

পিজি সংরক্ষণ :

পিজি অথবা পিজির নির্যাস কার্যকারিতাসহ বিভিন্ন সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। পিজি সংরক্ষণের জন্য তিনটি প্রধান পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. এবসোলিউট অ্যালকোহলে সংরক্ষণ
২. এসিটোন সংরক্ষণ
৩. তড়িৎ ফ্রিজিং-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ

১) এবসোলিউট (১০০%) অ্যালকোহলে পিজি সংরক্ষণ :

পিজি সংগ্রহের সাথে সাথে এবসোলিউট অ্যালকোহলে রাখতে হয়। প্রতিটি গ্রন্থি শনাক্তকারী চিহ্নসহ আলাদা আলাদা ভায়াল (Vial) এ রাখতে পারলে ভালো হয়। তবে বেশি ভায়াল না থাকলে একসাথে রাখা যায়। ২৪ ঘণ্টা পর গ্রন্থি এবসোলিউট অ্যালকোহলে ধুয়ে আবার নতুন অ্যালকোহলে কোনো ঠাণ্ডা এবং ছায়াযুক্ত জায়গায় কক্ষ তাপমাত্রায় অথবা রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করার পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হবে। ভায়ালের মুখ অবশ্যই নিশ্চিদ্রভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। ভায়ালে জলকণা প্রবেশ রোধকল্পে এগুলোকে একটি ডেসিকেটরে (Desiccator) রাখা যায় যেখানে পানিগ্রাহী পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আছে। ডেসিকেটর কোনো ঠাণ্ডা কক্ষে অথবা রেফ্রিজারেটরে রাখাই উত্তম। এবসোলিউট অ্যালকোহল পিজিকে পানিশূন্য ও চর্বিমুক্ত করে ১০০% বিশুদ্ধ অ্যালকোহলে ব্যবহার করতে হবে কারণ হরমোন পানিতে দ্রবণীয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য পিজি সংরক্ষণ করতে গেলে অ্যালকোহল মাঝে মধ্যে পরিবর্তন করে নতুন অ্যালকোহল দিতে হবে।

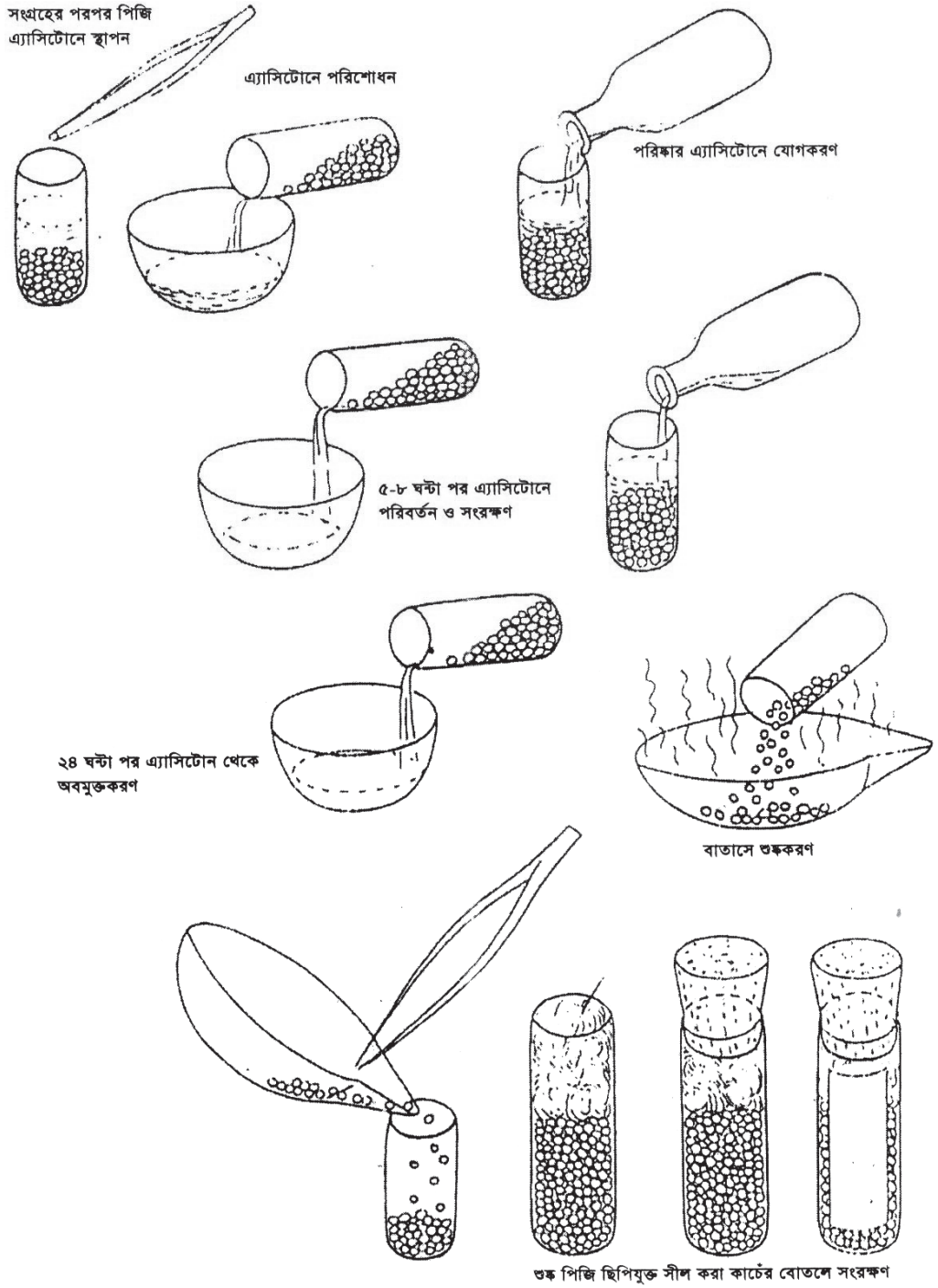

চিত্র : এসিটোন সহযোগে পিজি শোধন, শুষ্ককরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

২) এসিটোন পিজি সংরক্ষণ :

এসিটোনেও পিজি সংরক্ষণ করা যেতে পারে তবে এতে রেফ্রিজারেটরের প্রয়োজন হয়। তাই যেখানে রেফ্রিজারেটরের নেই সেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

মাছের মাথা থেকে পিজি সংগ্রহের সাথে সাথেই একে বিশুদ্ধ এসিটোন বা বরফশীতল এসিটোন রাখা হয়। ভায়ালগুলোতে এরপর কোনো রেফ্রিজারেটরে ৩৬-৪৮ ঘণ্টার জন্য রাখা হয়। সম্পূর্ণ পানিশূন্য ও ফ্যাটশূন্য করার জন্য এ সময়ের মধ্যে ৮-১২ ঘণ্টার পর পর এসিটোন পরিবর্তন করতে হবে। এরপর পিজিকে ভায়াল থেকে বের করে ফিল্টার কাগজে শুকানো হয় এবং ওজন করে অন্য একটি স্টেরাইল ভায়ালে এসিটোন দিয়ে স্থানান্তর করা হয়। ভায়ালটিকে পরে রেফ্রিজারেটর ব্যবহার পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

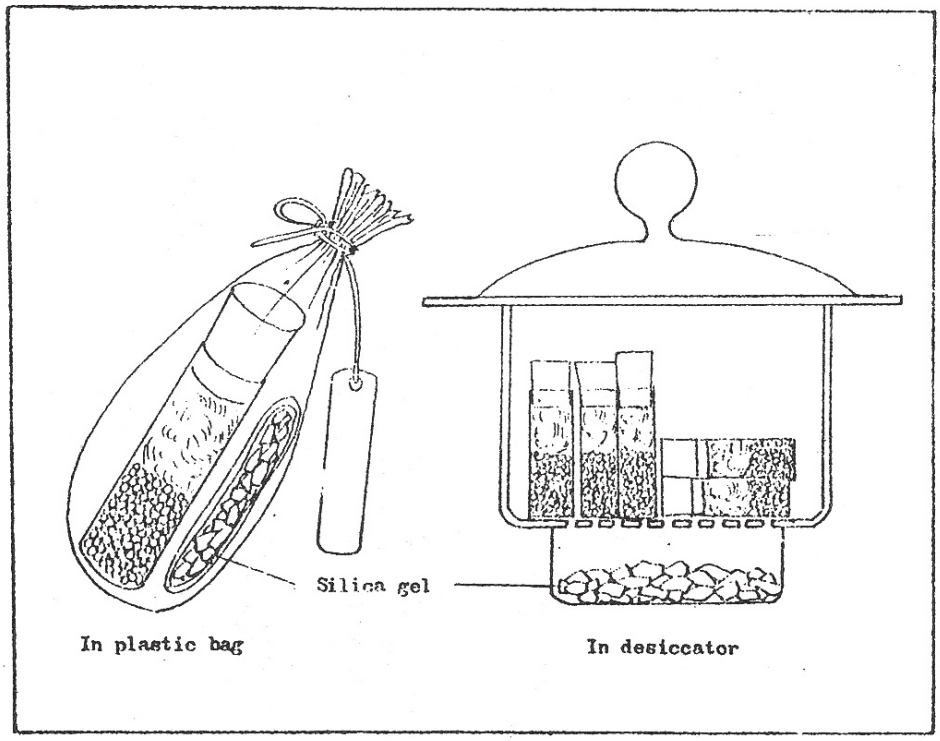

চিত্র : এসিটোন ধৌত পিজি সংরক্ষণ কৌশল

৩) ত্বরিত ফ্রিজিং-এর মাধ্যমে পিজি সংরক্ষণ :

সদ্য সংগৃহীত পিজি সরাসরি ডিপফ্রিজে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সতর্কতা :

i) শুধুমাত্র পরিপক্ব মাছ থেকেই গ্লান্ড সংগ্রহ করা উচিত।

ii) পচনশীল মাছ থেকে গ্লান্ড সংগ্রহ করা উচিত নয়।

iii) গ্লান্ড সাবধানে তুলে আনতে হবে যাতে পিজি না ছিঁড়ে যায়।

iv) গ্লান্ড কোনোভাবেই যেন পানির সংস্পর্শে না আসে।

প্রশ্নমালা-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পিজি কী?

২. পিজি কোথায় থাকে?

৩. পিজিতে কোন হরমোন থাকে?

৪. পিজি দ্রবণ থিতানোর জন্য কী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?

৫. পিজি কীভাবে সংরক্ষরণ করা হয়?

৬. পিজি পেষার জন্য কী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?

৭. পিজি চর্বিমুক্ত করার জন্য কী কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়?

৮. অ্যালকোহলে সংরক্ষিত পিজি কত দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়?

৯. এবসলিউট এলকোহল বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহের জন্য মাছ নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?

২. পিজি সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ।

৩. পিজি দ্রবণ তৈরি সম্পর্কে লেখ ।

৪. পিজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

৫. প্রণোদিত প্রজননে হরমোনের ভূমিকা কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পিজি সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর?

২. পিজি সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর?

চতুর্থ অধ্যায়
কৃত্রিম প্রজননের জন্য পিজি দ্রবণ তৈরি ইনজেকশন প্রয়োগ ও প্রণোদিত প্রজনন

হরমোন দ্রবণ তৈরি ও ইনজেকশন প্রয়োগ

মাছের ইনজেকশন দেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পিজি দিয়ে হরমোন দ্রবণ তৈরি করতে হয়। প্রথমে ব্রুড মাছের ওজন অনুপাতে কী পরিমাণ পিজি দরকার হবে তা হিসাব করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ/সংখ্যক পিজি ভায়াল থেকে বের করে একটি ফিল্টার কাগজের উপর ১-২ মিনিট রাখা হয় যাতে অ্যালকোহল শুকিয়ে যায়। এসিটোনে সংরক্ষিত পিজি সরাসরি ভায়াল থেকে টিস্যু হোমাজিনাইজারে স্থানান্তর করা হয়। সামান্য পাতিত পানি বা ০.৩% সাধারণ লবণ দ্রবণসহ পিজিকে একটি টিস্যু হোমাজিনাইজারে নেয়া হয়।

পরিষ্কার নদী বা পুকুরের পানি যার পিএইচ নিরপেক্ষ তাকে ও দ্রবণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। টিস্যু হোমাজিনাইজারে পিজিকে একটি দণ্ডের সাহায্যে পেষণ করা হয় যাতে পিজি যতটুকু সম্ভব ব্যবহৃত মাধ্যমে মিশে যায়। পেষণকৃত পিজিতে প্রয়োজনীয় ঘনত্ব পাওয়ার জন্য দরকার হলে আরও পানি দ্রবণ যোগ করতে হতে পারে। কী পরিমাণ মাছকে ইনজেকশন দেওয়া হবে তার উপর নির্ভর করবে কতটুকু দ্রাবক ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে দ্রবণ যেন খুবই ঘন বা খুবই পাতলা না হয়।

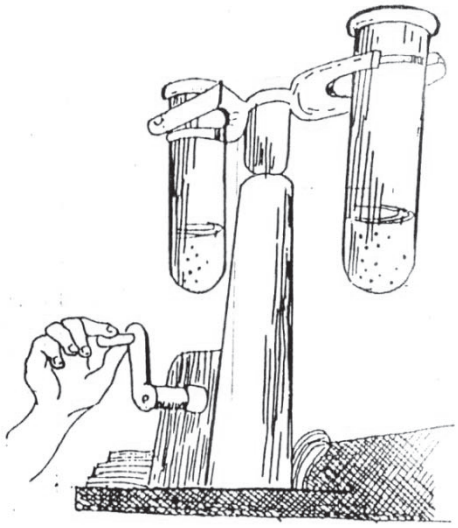

চিত্র : হস্তচালিত সেন্ট্রিফিউজ মেশিন

সাধারণ ২-৩ মি. গ্রাম পি.জি ০.১ মি.লি দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়। অর্থাৎ প্রতি মি. লি দ্রবণে ২০-৩০ মি. গ্রাম পিজির দ্রবীভূত করা হয়। এ মাত্রা প্রয়োজনে কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। মাছের আকারের উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ ১ মি.লি. এবং সর্বনিম্ন ০.১ মি.লি. দ্রবণে ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ একটি প্রজননকারী মাছেকে ৪৫ মিলিগ্রাম পিজি ইনজেকশন দিতে হবে। যদি প্রতি ০.১ মিলি লিটারে ৩ মিলিগ্রাম পিজি দ্রবীভূত করা হয়, তাহলে ৪৫ মি. লি. গ্রাম পিজির জন্য ১.৫ মি. লি দ্রাবকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যেহেতু পূর্বে বলা হয়েছে যে একটি মাছের জন্য সর্বোচ্চ ১ মি. লি গ্রাম দ্রবণ ব্যবহার করা উচিত সেক্ষেত্রে প্রতি ০.১ মি. লি. এ ৫ মি. লি গ্রাম পিজির দ্রবণ তৈরি করতে হবে। ফলস্বরূপ মোট হরমোন দ্রবণের পরিমাণ হবে ০.৯ মি.লি. পিজির সাসপেনসহ হোমোজিনাইজার থেকে একটি সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের টিউবে স্থানান্তর করা হয়। ঢালার পূর্বে হোমোজিনাইজার ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে যাতে করে থিতানো গ্রন্থিকণা ভালোভাবে দ্রবণে মিশে যেতে পারে। এরপর দ্রবণসহ টিউবটি একটি হস্তচালিত অথবা বিদ্যুৎচালিত সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে স্থাপন করা হয়। মেশিন চালনা করলে অদ্রবণীয় কণা টিউবের তলার জমা হবে এবং পরিষ্কার দ্রবণ উহার উপর অবস্থান করবে। ইনজেকশন দেওয়ার জন্য একটি পরিষ্কার সিরিজের সাহায্যে টিউবের উপরিভাগের স্বচ্ছ দ্রবণ সেন্ট্রিফিউজ টিউব হতে তুলে নেয়া হয়।

পিজি ইনজেকশনের ডোজ বা মাত্রা :

পিজি দ্রবণের সঠিক ডোজ নির্ধারণ করা কৃত্রিম প্রজননের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প মাত্রা কোনো কোনো সময় কার্যকরী নাও হতে পারে আবার অধিক মাত্রা অপ্রাপ্ত ডিম ছাড়তে বাধ্য করে যার ফলে ডিম পরিষ্কার পরিস্ফুটনের অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। হরমোনের মাত্রা নির্ধারণী সেসব অনুঘটক বিদ্যমান তার মধ্যে মাছের বয়স, আকার এবং যৌন পরিপক্বতার অবস্থা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে একই প্রজাতির একই বয়সে এবং একই আকারের মাছের মধ্যেও যৌন পরিপক্বতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার যে সমস্ত পিজি ব্যবহার করা হবে সেগুলোর কার্যকারিতার মধ্যে ও পার্থক্য থাকতে পারে বা থাকাই স্বাভাবিক।

যে প্রজননকারী মাছকে ইনজেকশন দেওয়া হবে তার ওজনের উপর ভিত্তি করে ইনজেকশনের পিজির পরিমাণ হিসাব করা হয়। অনেক সময় যৌন পরিপক্বতার মধ্যে তারতম্য হেতু একই আকারের মাছকে একই পরিমাণ ইনজেকশন দিলে ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

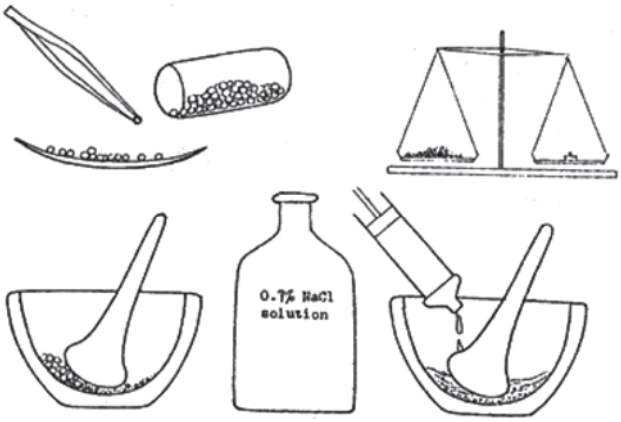

চিত্র : পিজি দ্রবণ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম

হরমোন প্রয়োগ মাত্রা (প্রতি কেজি মাছের জন্য)

প্রজাতি	স্ত্রী/পুরুষ ব্রুড মাছ	১ম ইনজেকশন (প্রতি কেজির জন্য)	বিরতিকাল (ঘন্টা)	২য় ইনজেকশন (প্রতি কেজির জন্য)	ডিম ছাড়ার সময় (ওভুলেশন পিরিয়ড)/ ঘন্টা/ ২য় ইনজেকশনের পর
রুই	স্ত্রী	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	৬	পিজি ৬ মিঃ গ্রাম	৪-৬ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
কাতলা	স্ত্রী	পিজি ১.৫-২ মিঃ গ্রাম	৬	পিজি ৫-৬ মিঃ গ্রাম	৫-৬ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ১.৫-২ মিঃ গ্রাম	
মৃগেল	স্ত্রী	পিজি ১-১.৫ মিঃ গ্রাম	৬	পিজি ৫-৬ মিঃ গ্রাম	৪-৬ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ১-১.৫ মিঃ গ্রাম	
কালিবাউস	স্ত্রী	পিজি ১-১.৫ মিঃ গ্রাম	৬	পিজি ৪-৫ মিঃ গ্রাম	৫-৬ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ১.৫-২ মিঃ গ্রাম	
গ্রাস কার্প	স্ত্রী	পিজি ১.৫-২ মিঃ গ্রাম	৬-৮	পিজি ৪-৬ মিঃ গ্রাম	৫-৭ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
সিলভার কার্প/ হিগহেড কার্প	স্ত্রী	ক) পিজি ২ মিঃ গ্রাম খ) এইচসিজি ২০০-২৫০ আইইউ	৬-৯ ৯-১২	ক) পিজি ৬ মিঃ গ্রাম খ) এইচসিজি ৫০০ আইইউ+পিজি ৩ মিঃ গ্রাম	৬-৮ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
মিরর/ কমনকার্প	স্ত্রী	পিজি ১ মিঃ গ্রাম	৬	পিজি ৪ মিঃ গ্রাম	৬ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
রাজপুঁটি/ দেশী সরপুঁটি	স্ত্রী	-	-	পিজি ৪ মিঃ গ্রাম	৬
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
পাংগাস	স্ত্রী	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	৯	পিজি ৬ মিঃ গ্রাম	৮-৯ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
ব্লাক কার্প	স্ত্রী	পিজি ১.৫-২ মিঃ গ্রাম	৮-১০	পিজি ৪-৫ মিঃ গ্রাম	৬-৮ ঘন্টা
	পুরুষ	-	-	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	
পাবদা	স্ত্রী	পিজি ৬ মিঃ গ্রাম	৬	পিজি ১৫-১৭ মিঃ গ্রাম	৭-৮ ঘন্টা
	পুরুষ	পিজি ৬ মিঃ গ্রাম	-	পিজি ৭-৮ মিঃ গ্রাম	
চিতল	স্ত্রী	পিজি ১০০ মিঃ গ্রাম	-	-	১২-১৬ ঘন্টা
	পুরুষ	পিজি ২৫ মিঃ গ্রাম	-	-	
মাগুর দেশী	স্ত্রী	পিজি ৫০ মিঃ গ্রাম	৬-৮	পিজি ১০০ মিঃ গ্রাম	৯-১২ ঘন্টা স্ট্রীপিং পদ্ধতি
	পুরুষ	-	-	পিজি ৫০ মিঃ গ্রাম	
শিং মাছ	স্ত্রী	পিজি ৫০ মিঃ গ্রাম	৬-৮	পিজি ৫০ মিঃ গ্রাম	৮-১০ ঘন্টা স্ট্রীপিং পদ্ধতি
	পুরুষ	-	-	পিজি ২৫ মিঃ গ্রাম	
কৈ মাছ	স্ত্রী	পিজি ৩-৪ মিঃ গ্রাম	-	-	৯-১২ ঘন্টা
	পুরুষ	পিজি ২ মিঃ গ্রাম	-	-	

সূত্র : মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য ব্রুড মাছ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পুস্তিকা।

২০২০

ডিম যদি পরিপক্ব না হয় অথবা ডিম যদি ডিম্বথলিতে মিশে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে তাহলে অধিক মাত্রায় ইনজেকশন দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায় না বা মাছ কখনো ডিম ছাড়ে না। অভিজ্ঞতার আলোকে ব্রুড মাছ নির্বাচন করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ইনজেকশন দিলে ৬০-৭০% ক্ষেত্রে মাছ প্রজনন করে থাকে। দেখা গেছে যে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে একটি স্বল্পমাত্রার ইনজেকশন এবং ৪-৬ ঘণ্টার পর অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রার ইনজেকশন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। শুধুমাত্র স্ত্রী মাছে ২টি ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে পুরুষ মাছে তলপেটে চাপ দিলে যদি ভালো মিল্ট (শুক্রাণু) না বের হয় তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রেও ২টি ইনজেকশন দিতে হবে।

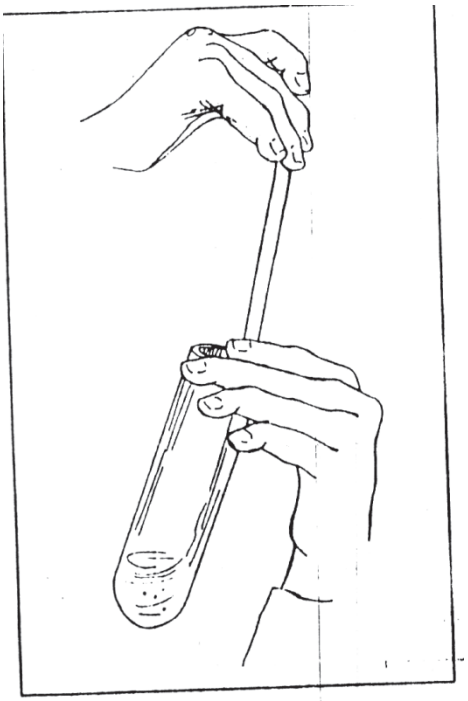

চিত্র : টিস্যু হোমোজিনাইজার

যদি পিজি ওজন করার জন্য কোনো নিখুঁত ব্যালেন্স না থাকে তাহলে সংখ্যা হিসাবে ও পিজি ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে একই প্রজাতির একই আকারের পরিপক্ব মাছ থেকে সংগৃহীত ১-৩টি পিজি এক জোড়া ব্রুড মাছকে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি :

সাধারণত অন্তঃমাংসপেশীয় ইনজেকশন দ্বারা হরমোন ব্রুড মাছে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া অন্তঃগহবরীয় ইনজেকশনের মাধ্যমেও হরমোন প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ইনজেকশন শ্রেণী পাখনা বা বক্ষ পাখনার গোড়ায় দেওয়া হয়। তবে এ পদ্ধতিতে মাছের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে যখন স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয় অতিরিক্ত পরিপক্ব ডিম ধারণের জন্য বর্ধিত হয়। এছাড়া পরপর প্রয়োগকৃত ইন্ট্রোপেরিটোনিয়াল ইনজেকশন বিশেষ করে যখন পিজি দ্রবণ ছাঁকা হয় না, তখন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

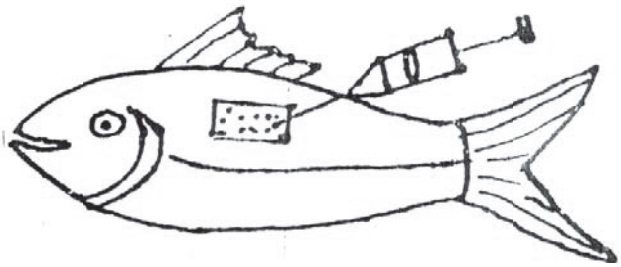

চিত্র : পৃষ্ঠ পাখনার নিচে এবং মাংসপেশির ভিতরে।

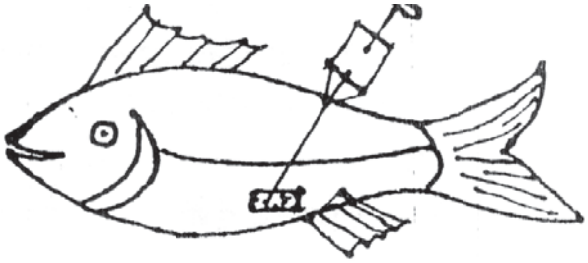

চিত্র : দেহগহ্বরে বা পাখনার নিচে।

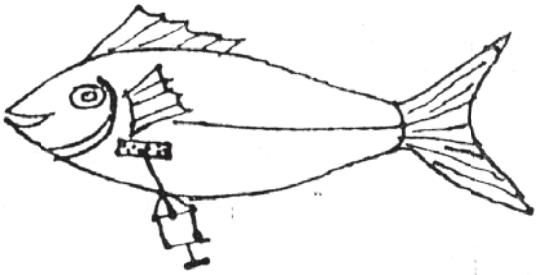

চিত্র : পেক্টোরাল ফিন বা শ্রোণী পাখনার গোড়ায় যেখানে আঁইশ নেই এবং একটু উঁচু থাকে।

চিত্র : লেজের কাছে মাংসপেশির ভিতরে

২০২০

অন্যদিকে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি সহজতর ও বেশি কার্যকর। এ ইনজেকশন সাধারণত লেজের অঞ্চলে অথবা পৃষ্ঠ পাখনার নিচে এবং পার্শ্বরেখার উপরের অংশে প্রয়োগ করা হয়। দুটো ইনজেকশন ক্ষেত্রে উভয় পার্শ্বে ১টি করে দেওয়া হয়। ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশনের জন্য একটি আঁইশের নিচে প্রথমে দেহের সমান্তরাল এবং পরে ৪৫° কোণে সূচ প্রবেশ করানো হয়। ২ সিসি মাপের হাইপোভা সিরিঞ্জ হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য সহজতর/উপযোগী। B.D.H সূচ নং ২২ দ্বারা ১-৩ কেজি ওজনের মাছকে, ছোট আকারের মাছকে ১৯ নং সূচ দিয়ে সহজেই ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে।

চাষযোগ্য মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

মৎস্য চাষ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নিয়মিতভাবে সঠিক মানের পোনা সরবরাহ করা। হ্যাচারিতে প্রণোদিত উপায়ে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করে উন্নত ও সঠিক মানের পোনা উৎপাদন করেই মৎস্য চাষের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। আর সঠিক মানের পোনা উৎপাদনের জন্য প্রধান কাজই হলো প্রত্যেকটি হ্যাচারিতে সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন প্রচুর পরিমাণে জেনেটিকভাবে বিশুদ্ধ ব্রুড মাছ মজুদ এবং পরিচর্যা করা। আমাদের দেশে বর্তমানে ৮৯টি সরকারি হ্যাচারি আছে যেখানে ১৪৭৭৫ কেজি রেণু উৎপাদন হয় এবং ৮১৩টি বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি আছে যেখানে ৫৯৪৮৩৯ কেজি রেণু উৎপাদন হচ্ছে। চাষযোগ্য বিভিন্ন মাছের প্রণোদিত প্রজনন কৌশল নিম্নে দেওয়া হলো।

রুই, কাতলা, মৃগেল, মাছের প্রণোদিত প্রজনন :

বর্তমানে দেশে রুই জাতীয় মাছের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই মৎস্য চাষে রুই জতীয় মাছের উন্নতমানের পোনা সঠিক আকার ও সময় মতো জোগান দেওয়ার জন্য মাছের প্রণোদিত প্রজনন করা হয়। মার্চের শুরু থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত রুই ও মৃগেল মাছের প্রণোদিত প্রজনন করা হয়। মার্চের আগেই এসব মাছ দৈহিক ভাবে প্রজনন উপযোগী হয়ে যায়। তবে কাতলা একটু বিলম্বে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে প্রজনন উপযোগী হয়। রুই জাতীয় মাছের প্রণোদিত প্রজনন কৌশল নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

১. ব্রুড মাছ সংগ্রহ

i) প্রাকৃতিক উৎস হতে অর্থাৎ নদ-নদী, প্লাবন ভূমি প্রভৃতি জলাশয় থেকে বন্য জাতের রুই জাতীয় মাছ সংগ্রহ করা হয়।

ii) হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করতে হয়।

iii) ব্রুড ব্যাংক হতে রুই জাতীয় মাছের ব্রুড সংগ্রহ করা হয়।

iv) এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড আদান-প্রদান অর্থাৎ ব্রুড বিনিময় করে।

২. ব্রুড মাছ পালন

i) ব্রুড মাছ মজুদের পূর্বেই মজুদ পুকুরটি শুকিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করে অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে। শতাংশ প্রতি ১-১.৫ কেজি হারে চূন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর, টিএসপি ২০০ গ্রাম ও ইউরিয়া ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে ব্রুড মজুদ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ii) মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হলে ভালো হয়। মজুদ কালে পুকুরের তিনটি স্তরের মাছই মজুদ করলে খাদ্যের অপচয় হয় না। সুযোগ থাকলে প্রজাতি অনুযায়ী বা পুরুষ-স্ত্রী মাছ আলাদা পুকুরে পালন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

iii) প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে ২০-২৫% আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য দৈনিক দুইবার প্রয়োগ করতে হবে।

iv) ব্রুড মাছের রোগ-বালাই যাতে না হয় সে জন্য মাঝে মাঝে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. ব্রুড মাছ বাছাই

i) ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর প্রণোদিত প্রজননের সফলতা নির্ভর করে। মাছ বাছাইয়ের ব্যাপারটি মূলত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বাছাইয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। পুকুরে মজুদ সব মাছ একত্রে পরিপক্ব হয় না। এজন্য ব্রুড বাছাই এর সময় পুকুরে জাল টেনে একটা একটা করে মাছ পরীক্ষা করা হয়। স্ত্রী মাছের পেট যথেষ্ট স্ফীত ও নরম, পায়ু পথ স্ফীত, কিছুটা সম্প্রসারিত, লাল বা গোলাপি বর্ণের হলে বুঝতে হবে ব্রুডটি যথেষ্ট পরিপক্ব হয়েছে। পুরুষ ব্রুড মাছের পেট চিকন থাকে। তবে পেটে হালকা চাপ দিলে সাদা দুধের মত শুক্র বা মিল্ট বেরিয়ে আসে। নিচের ছকে প্রজনন উপযুক্ত ব্রুড মাছের বৈশিষ্টসমূহ দেওয়া হলো :

ছক : ব্রুড বাছাইয়ের জন্য পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ মাছের বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক নং	স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
১।	বক্ষ পাখনা তুলনামূলক ছোট এবং পাখনার সর্ব বাহিরের রশ্মি খুব মোটা নয়।	বক্ষ পাখনা তুলনামূলক লম্বা এবং সর্ব বাহিরের রশ্মি মোটা ও বড়।
২।	বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক মসৃন ও পিচ্ছিল হবে।	বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক খসখসে হবে।
৩।	পেট স্ফীত ও নরম হবে।	পেট চিকন হবে।
৪।	পায়ু ফোলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল হবে।	পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের হবে।
৫।	তল পেটে সামান্য চাপ দিলে ডিম বের হবে।	তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দুধের মতো তরল (মিল্ট) বেরিয়ে আসে।

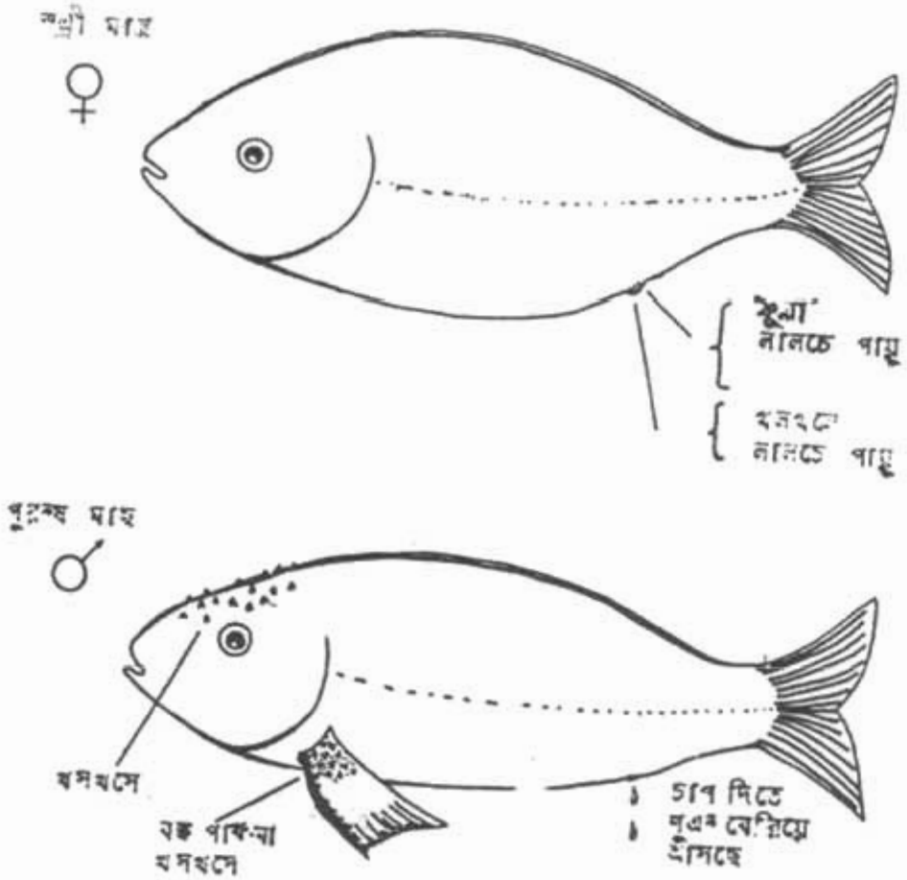

চিত্র : প্রজননযোগ্য স্ত্রী ও পুরুষ মাছের বৈশিষ্ট্য

ব্রুড বাছাইয়ের সময় জাল টানা, মাছ ধরা এবং পুকুর থেকে হ্যাচারির চৌবাচ্চায় আনার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার যাতে মাছ কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। যে মাছগুলো পরীক্ষা করার পর আবার ছেড়ে দেওয়া হয় তখনও খুব সতর্ক থাকতে হয়। যাতে মাছ কোনো কষ্ট না পায়। অনেক সময় জালের মাছ একত্র করার সময় খুব লাফালাফি শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় খুব ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হবে। লাফ মেরে ওঠা মাছের আঘাতে জাল টানায় নিয়োজিত মানুষ যেন আহত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। ব্রুড মাছের পুকুর হতে প্রজননের জন্য বাছাইকৃত মাছ হ্যাচারির চৌবাচ্চা পর্যন্ত আনার জন্য কাপড়ের বা জালের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার সুবিধাজনক। দূরবর্তী পুকুর হতে ব্রুড আনয়নের সময় অবচেতন করে আনতে হবে। অবচেতন করার জন্য প্রতি লিটার পানিতে একফোঁটা ক্লোভ অয়েল (Clove Oil) মিশিয়ে ব্রুড মাছ পরিবহন করা যেতে পারে। তবে ওষুধ প্রয়োগের মাত্রা প্রজাতি ভেদে ও পানির তাপমাত্রার উপর কম বা বেশি হতে পারে। বাছাইয়ের সময় বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী মাছের জন্য দ্বিগুণ সংখ্যায় পুরুষ মাছ

নেওয়া হয়। তবে ওজনের দিক থেকে স্ত্রী মাছের ওজনের দেড় গুণ পরিমাণ পুরুষ মাছ হলে ভালো হয়। অর্থাৎ ২ কেজি ওজনের স্ত্রী মাছের জন্য ১.৫ কেজি ওজনের ২টি পুরুষ মাছে ৩ কেজি ওজনের হতে হবে। প্রজননের জন্য মাছ বাছাই করার ১-২ দিন পূর্বে ব্রুড মাছের পুকুরে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হয় এবং জাল টেনে মাছকে অভ্যস্ত করে নিতে হয়। মাছ বাছাই করে হ্যাচারির চৌবাচ্চায় ৫-৮ ঘণ্টা রেখে দিতে হয় যাতে হ্যাচারির পানিতে ব্রুড মাছ অভ্যস্ত হতে পারে।

১. হরমোন প্রয়োগ

প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত হরমোন বিভিন্ন উৎস হতে পাওয়া যায় এবং এগুলো বাজারে বিভিন্ন নামে প্রচলিত যেমন :

i) মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি বা পিজি

ii) এইচসিজি (H.C.G) যেমন সুমাছ (ভারত), কোরোলন (হল্যান্ড)

iii) ওভাপ্রিম

iv) এলআরএইচএ (LRHA) ইত্যাদি

মৎস্য প্রজননে হরমোনের প্রয়োগ মাত্রা বিভিন্ন প্রজাতির জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো মাছে শুধু পিজি আবার কোনো কোনো মাছে পিজি এবং এইচসিজি দুটোই প্রয়োগ করতে হয়। প্রজনন কাল, আবহাওয়া, তাপমাত্রা, ব্রুড মাছের পরিবর্তন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হরমোন প্রয়োগ কম বা বেশি হতে পারে। তবে রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোনের উৎস হিসেবে পিজি ব্যবহার করা হয়। পিটুইটারি গ্লান্ড বা পিজিতে গোনাডোট্রপিন হরমোন বিদ্যমান থাকে যা মাছের প্রজননকে প্রভাবিত করে।

৫. হরমোনের মাত্রা

রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোনের উৎস হিসেবে পিজি ব্যবহার করা হয়। হ্যাচারি পরিচালনার জন্য পিজি সংগ্রহ করা একটি ব্যয়বহুল খাত, সে কারণে সঠিক মাত্রায় পিজি ব্যবহার করলে একদিকে যেমন মাছের প্রজনন ভালোভাবে সম্পন্ন হবে অন্যদিকে পিজির অপচয়ও রোধ হয়।

পিজি বা হরমোনের মাত্রা নির্ভর করে ব্রুড মাছের ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতা এবং পানির তাপমাত্রার উপর। অপরিপক্ব ব্রুড মাছও তুলনামূলক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ক্ষেত্রে হরমোন বা পিজি একটু বেশি মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়। তাই মাছের পরিপক্বতা ও আবহাওয়াগত কারণে প্রজনন মৌসুমের বিভিন্ন মাসে পিজি বা হরমোনের মাত্রা কম বেশি হয়ে থাকে। সাধারণভাবে রুই, কাতলা মাছের প্রণোদিত প্রজননের জন্য স্ত্রী মাছের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৮-১৬ মিলিগ্রাম এবং পুরুষ মাছের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১-৪ মিলিগ্রাম পিজি ব্যবহার হয়ে থাকে। স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে মোট হরমোনের পরিমাণকে তিন ভাগে ভাগ করে মোট দুইবারে হরমোন প্রয়োগ করা হয়। প্রথম ইনজেকশনের ৬ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় বা শেষ মাত্রা প্রয়োগ করা

হয়। পুরুষ মাছকে এসময়ে অর্থাৎ স্ত্রী মাছের দ্বিতীয় ইনজেকশনের সময় ১-৪ মিলিগ্রাম পিজি প্রতি কেজি ওজনের জন্য একমাত্র ডোজ হিসেবে দেওয়া হয়। প্রণোদিত প্রজননে হরমোন মাত্রার ভিন্নতা কম বেশি হওয়া নির্ভর করে ব্রুড মাছের পরিপক্বতা, আবহাওয়া এবং হ্যাচারি পরিচালকের অভিজ্ঞতার নিম্নে পরবর্তী দুটি ছকে ব্রাক বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক সুপারিশকৃত রুই জাতীয় মাছের প্রজননে মাস ওয়ারী পিজি প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো :

ছক : ব্রাক কর্তৃক সুপারিশকৃত মাসওয়ারি রুইজাতীয় মাছের পিজি প্রয়োগের মাত্রা

প্রজাতি	মাস	১ম ইনজেকশন	ব্যবধান	২য় ইনজেকশন	
মৃগেল	ফেব্রুয়ারি-মার্চ /ফাল্গুন-চৈত্র	২	৬	৬	
মৃগেল	এপ্রিল-মে বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	২	৬	৫.৫	২য় ইনজেকশন ৪-৮ ঘণ্টার মধ্যে মাছ ডিম দিতে শুরু করে
রুই		২	৬	৬	
কালবাউস		২	৬	৫.৫	
কাতলা		২	৬	৬	
মৃগেল	জুন-জুলাই বা আষাঢ়-শ্রাবণ	১	৬	৫	
রুই		২	৬	৫	
কাতলা		১	৬	৫	
কালবাউস		১.৫	৬	৫	
মৃগেল	আগস্ট-সেপ্টেম্বর বা ভাদ্র-আশ্বিন	১	৬	৫.৫	
রুই		১.৫	৬	৬	
কালবাউস		১	৬	৫.৫	

দ্রষ্টব্য : স্ত্রী মাছের ২য় ইনজেকশনের সময় মাছকে ২ মিলি গ্রাম/কেজি মাত্রায় একমাত্র ইনজেকশন দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য : পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের প্রথম মাত্রার সমান হরমোন স্ত্রী মাছের দ্বিতীয় ডোজের সমান ইনজেকশন দিতে হয়।

ছক : মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশকৃত রুই জাতীয় মাছের জন্য মাস ওয়ারি পিজি ব্যবহারের পরিমাণ

প্রজাতি	মাস	১ম ইনজেকশন	ব্যবধান ঘণ্টা	২য় ইনজেকশন	মন্তব্য
কাতলা	এপ্রিল-মে বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১	৬	৪	ব্রুড যথেষ্ট পরিপক্ব হলে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে হরমোনের মাত্রা সামান্য কম বা বেশি হলে প্রজননের কোনো অসুবিধা হয় না।
মৃগেল		২	৬	৬	
রুই		২	৬	৮	
কালবাউস		২	৬	৬	
কাতলা	মে-জুন বা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১	৪-৬	৪	
মৃগেল		১-২	৪-৬	০-৪	
রুই		২	৪-৬	৬-৮	
কালবাউস		১-২	৪-৬	০-৩	
কাতলা	জুন-জুলাই বা আষাঢ়-ভাদ্র	০.৫-১.০	৪-৬	৪	
মৃগেল		০-১.০	৪-৬	০-৪	
রুই		০-২.০	৪-৬	০-৪	
কালবাউস		০-১.০	৪-৬	০-৪	

দ্রষ্টব্য : ২য় ইনজেকশনের সময় পুরুষ মাছকে ২-৪ মিলি গ্রাম /কেজি মাত্রায় পিজি দিয়ে ইনজেকশন দিতে হবে।

৬. দ্রবণ তৈরি

বাছাই করা ব্রুড মাছের প্রজাতি অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের ওজন একটি খাতায় লিখে রাখা হয়। এই হিসাব থেকে প্রতিটি মাছের কতটুকু পিজি প্রয়োজন তা নির্ণয় করা হয়। পূর্বে সংগৃহীত এবং এলকোহল/অ্যাসিটোনে সংরক্ষিত পিজি হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক পিজি নিয়ে টিস্যু পেপার দিয়ে চেপে চেপে শুকিয়ে নিতে হবে। এসিটোন সংরক্ষিত পিজি সরাসরি সূক্ষ্ম পাল্লা দিয়ে মেপে নিতে হয়। এবারে পিজিকে টিসু হোমোজিনাইজার বা হামান দিস্তা (মর্টার) দিয়ে ভালোভাবে পিষতে হবে। পেষার সময় সামান্য পরিমাণে ডিস্টিলড ওয়াটার বা পরিশ্রুত পানি দিতে হবে। পানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে প্রতি কেজি ব্রুড মাছের দেহে ০.৩ মিলি গ্রামের বেশি দ্রবণ প্রবেশ না করে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিশ্রুত পানি দিয়ে ভালোভাবে দ্রবণ তৈরি করে ৩০ মিনিট ধরে একটি টেস্টটিউবে রেখে দিতে হবে। ভালোভাবে থিতানোর জন্য সেন্ট্রিফিউজ মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে। থিতানো দ্রবণ থেকে তলানিটুকু বাদ দিয়ে পরিষ্কার দ্রবণ ইনজেকশনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি

সূক্ষ্ম সুচ ব্যবহার করে সিরিঞ্জের সাহায্যে মাছকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। ২০-২২ নম্বর সুচ ব্যবহার সুবিধা জনক। মাছের দেহে বিভিন্ন স্থানে মাংসপেশিতে বা দেহ গহ্বরে ইনজেকশন দিতে হয়। রুই, কাতলা মাছের

ক্ষেত্রে বক্ষ পাখনার গোড়ার নিচের দিকে নরম স্থানে ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশন দেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে সুচ দ্বারা মাছের শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। ব্রুড মাছকে আলতো করে ধরে ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে স্পঞ্জের প্যাডে রেখে সাবধানতার সাথে ইনজেকশন দেওয়া হয়। অনেকে মাছকে পানির মধ্যে রেখেই ইনজেকশন দিয়ে থাকেন।

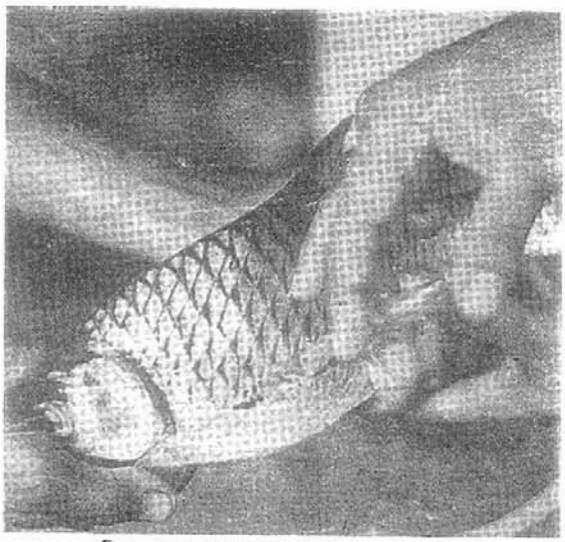

চিত্র ব্রুড মাছকে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

৮. ইনজেকশনের সময়

ইনজেকশন দেওয়ার সময় এমন ভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে প্রজনন পরিচালনাকারীর সুবিধা হয়। সাধারণত সকাল ৯টার মধ্যে জাল টেনে মাছ বাছাই করে হ্যাচারির চৌবাচ্চায় বিশ্রামের জন্য রেখে দিতে হবে। ৬-৭ ঘন্টা হ্যাচারির পানিতে অভ্যস্তকরণের পর বিকাল ৪টার দিকে প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হয়। সাধারণত স্ত্রী মাছকে ২টি ইনজেকশন এবং পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের ২য় ইনজেকশনের সময় একটি মাত্র ইনজেকশন দেওয়া হয়। স্ত্রী মাছকে ১ম ইনজেকশন দেওয়ার ৬ ঘন্টা পর অর্থাৎ রাত ১০টার দিকে ২য় ইনজেকশন দেওয়া হয়। এসময় পুরুষ মাছকে একমাত্র ইনজেকশনটি দেওয়া হয়।

৯. প্রজনন পদ্ধতি

হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয়ের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং ডিম ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ হ্যাচারির চৌবাচ্চায় সহজেই ডিম ছেড়ে দেয়। আবার বিদেশি কার্প যেমন : সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প এরা সহজে ডিম ছাড়ে না। তাই এরা ২য় ইনজেকশনের পর যখন ডিম ছাড়ার উপযুক্ত হয়, তখন এসব ব্রুড মাছের পেটে সামান্য চাপ প্রয়োগ করলে ডিম ও শুক্রাণু বেড়িয়ে আসে। তাই এদের প্রজনন আচরণ অনুসারে হ্যাচারিতে ২ পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটানো হয় যথা :

i) সহজাত প্রক্রিয়া

ii) চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া

i) সহজাত প্রক্রিয়া :

স্ত্রী ব্রুড মাছকে ২য় ইনজেকশন এবং পুরুষ মাছকে ১ম ইনজেকশন দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে একত্রে প্রজনন হাপায় রাখা হয়। বড় হ্যাচারিতে সার্কুলার ট্যাংকে অনেকগুলো ব্রুড মাছ একত্রে রাখা হয়। প্রতিটি স্ত্রী মাছের জন্য ২টি করে পুরুষ মাছ রাখা হয়। এভাবে রাখার পর তাদের প্রজনন উপযোগী পরিবেশ যেমন পানির প্রবাহ সৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (২৫ সে- ৩১.৫ সে) পর্যাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেনসমৃদ্ধ পরিষ্কার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। পরিপক্ব ব্রুড মাছ এবং উপযুক্ত পরিবেশ হলে এ প্রক্রিয়ায় প্রজনন ভালো হয় এবং ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। স্ত্রী মাছকে ২য় ইনজেকশন দিয়ে পুরুষ মাছের সাথে রাখার ৪-৮ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছ ডিম দিতে শুরু করে, স্ত্রী মাছ ডিম দেওয়ার সময় হলে পুরুষ মাছ তাদের তাড়া করে, এভাবে পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্ত্রী মাছের ডিম দেওয়ার সাথে সাথে পুরুষ মাছ ডিমের উপর শুক্রাণু ছাড়ে। ডিম ছাড়ার ঘণ্টাখানেক পরে ব্রুড মাছকে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রজননকৃত মাছকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা এক্রিফ্লাবিন ১-২ মি.গ্রাম / লিটার দ্রবণে গোসল করিয়ে পৃথক পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিষিক্ত ডিম ফুলে সাগু দানার মতো দেখায়। এবার হাপা থেকে নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে ডিম ফুটানো জারে বা বোতলে দেওয়া হয়। সার্কুলার ট্যাংকে প্রজনন ঘটালে ব্রুড মাছ ফেলার পর এখানেই ডিম ফুটানো হয়। এই ক্ষেত্রে ব্রিডিং ট্যাংকই ইনকুবেশন ট্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া : চাপ প্রয়োগ করে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যেসব মাছ সহজাত প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে না বা প্রজনন করানো সম্ভব হয় না তাদের জন্য চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সিলভারকার্প, বিগহেড কার্প বা অনেক সময় রুই, কাতলা মাছকেও চাপ প্রয়োগ দ্বারা প্রজনন ঘটানো হয়। অনেক সময় পুরুষ ব্রুড কম থাকলেও চাপ প্রয়োগ প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ইনজেকশনের পর স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে আলাদা আলাদা হাপা বা চৌবাচ্চায় রাখা হয়। অক্সিজেনসমৃদ্ধে পানিরপ্রবাহ ও তাপমাত্রা ঠিক থাকলে ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছ ডিম দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। এজন্য ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে কিনা তা ২য় ইনজেকশনের ৪ ঘণ্টা পর থেকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। স্ত্রী মাছ ২-৪ টা ডিম দিলেই বুঝতে হবে যে, এখনই চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আলাদা করে মাছ ধরে প্লাস্টিকের শুকনা গামলা বা ট্রের উপর ধরে পেটে হালকা চাপ দিলে সহজেই ডিম বের আসে। এমনভাবে চাপ দিতে হবে যাতে মাছ না মারা যায়। একই সময় দ্রুততার সাথে ইনজেকশন দেওয়া পুরুষ মাছকে ধরে পেটে চাপ দিলে শুক্র বের হয়ে আসবে। এই শুক্র সংগৃহীত ডিমের উপর নিতে হবে এবং পরিষ্কার পালক বা নরম তুলি দিয়ে শুক্র ডিমের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হয়। মিনিটখানেক মিশানোর পর ডিম পরিষ্কার পানিতে কয়েকবার ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়ার পর নিষিক্ত ডিম ঘণ্টাখানেক রেখে দেওয়া হয় যখন ডিমগুলো পানির সংস্পর্শের ফলে প্রায় ৩০-৪০ গুণ পর্যন্ত বড় হয়ে যায়। এবার ডিমকে ডিম ফুটানোর জার বা বোতলে দিয়ে দেওয়া হয়।

ডিম ফুটানো

নিষিক্ত ডিম ঘণ্টাখানেক পানিতে ধোয়ার পর হ্যাচিং বোতল বা ইনকুবেশন ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হয়। এর আগে অবশ্যই হ্যাচিং বোতল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা মিথিলিন ব্লু দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। চার ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার ২ ফুট ব্যাসের প্রতিটি হ্যাচিং বোতল এক থেকে দেড় কেজি নিষিক্ত ডিম ফোটানো যায়। বোতলে ডিম দেওয়ার প্রথম ঘণ্টা দুয়েক একটু বেশি মাত্রায় পানির প্রবাহ দেওয়া হয়। এ সময় প্রতি মিনিটে ১২-১৫ লিটার পানি প্রবাহিত করা হয়। দ্রুত প্রবাহের ফলে যাবতীয় ময়লা পদার্থ ধুয়ে যায়। দুই ঘণ্টা পরে পানির প্রবাহ কমিয়ে দেওয়া হয় এবং মিনিটে ৮-১০ লিটার মাত্রায় রাখা হয়। ২৭° সে. ৩১° সে. তাপমাত্রায় ৭-৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিমের ভ্রূণ নড়াচড়া করতে দেখা যায় এবং ১২-১৬ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে রেণু বের হয়। এ সময়ে প্রতি মিনিটে ১২-১৫ লিটার পানি প্রবাহ ডিমের খোসা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় হ্যাচিং জারের মুখে লাগানো জাল মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দিতে হয়। কারণ স্রোতের ফলে ডিমের খোসা সব জালে আটকে থাকে। ডিম ফুটা শেষ হলে পানির প্রবাহ আবার কমিয়ে ৭-৮ লিটার প্রতি মিনিটে করা হয়। ডিম ফুটানোর পর রেণুকে আরও ২০-৩০ ঘণ্টা বোতলে রাখা হয়।

চাইনিজ কার্পের প্রণোদিত প্রজনন

সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প ও বিগহেড কার্প কে চাইনিজ কার্প বলা হয়। আমাদের দেশি অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের ন্যায় চাইনিজ কার্পও পুকুরে ডিম দেয় না। তাই হ্যাচারিতে এদের প্রণোদিত প্রজনন করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাইনিজ কাপের প্রণোদিত প্রজনন করা যায়। সিলভার কার্প বিগহেড কার্প ও গ্রাস কার্প এর প্রণোদিত প্রজননের উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১। ব্রুড মাছ সংগ্রহ :

i) প্রাকৃতিক উৎস হতে অর্থাৎ নদ-নদী বা প্লাবন ভূমি প্রভৃতি হতে বন্য জাতের রুই জাতীয় মাছ সংগ্রহ করা হয়।

ii) হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করে।

iii) ব্রুড ব্যাংক হতে রুই জাতীয় ব্রুড সংগ্রহ করে।

iv) এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারিতে ব্রুড আদান প্রদান অর্থাৎ ব্রুড বিনিময় করে।

২। ব্রুড মাছ পালন :

i) ব্রুড মাছ মজুদের পূর্বেই মজুদ পুকুরটি শুকিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করে অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে। শতাংশ প্রতি ১-১.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর, টিএসপি ২০০ গ্রাম ও ইউরিয়া ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে ব্রুড মাছ মজুদ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ii) মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হলে ভালো হয়। মজুদকালে পুকুরের তিনটি স্তরের মাছই মজুদ করলে খাদ্যের অপচয় হয় না। সুযোগ থাকলে প্রজাতি অনুযায়ী বা পুরুষ ও স্ত্রী মাছ আলাদা পুকুরে পালন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

iii) প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে ২০-২৫% আমিষযুক্ত উন্নত মানের সুষম খাদ্য দৈনিক ২ বার প্রয়োগ করতে হবে। গ্রাস কার্পের জন্য নরম ঘাস, ক্ষুদিপানা, তরিতরকারির বর্জ্য, পাতা কুচিকুচি করে কেটে মাছের দৈহিক ওজনের শতকরা ২০-২৫ ভাগ দৈনিক পুকুরে দেওয়া আবশ্যক।

iv) ব্রুড মাছের রোগবালাই যাতে না হয় সে জন্য মাঝে মাঝে জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। ব্রুড বাছাইকরণ :

যথেষ্ট সংখ্যক ব্রুড হতে প্রজননের জন্য ব্রুড বাছাই করতে হবে। সাধারণত সিলভার ও বিগহেড কার্পের জন্য দুই বছরের বেশি বয়সের এবং দুই কেজির উপর ওজন এমন ব্রুড প্রণোদিত প্রজননের জন্য উত্তম। তবে গ্রাস কার্প তিন কেজি বা তদুর্ধ্ব হলে ভালো। সকালের দিকে ব্রুড পুকুরে জাল টেনে একটা একটা করে মাছ হাতে ধরে বাছাই করা হয়। সব মাছ একত্রে পরিপক্ব হয় না তাই অধিকতর উপযুক্ত ব্রুডগুলোকে আগে প্রজননের জন্য বাছাই করা হয়। স্ত্রী মাছের পেট স্ফীত ও নরম হয়, পায়ুপথ কিছুটা উদ্‌গত ও স্ফীত। পুরুষ মাছের পেট চিকন। পেটে হালকা চাপ দিলে মিল্ট বের হয়ে আসে। গ্রাস কার্প মাছের পেটে পর্যাপ্ত ঘাস থাকে তাই এদের স্ত্রী মাছের পরিপক্বতা নির্ণয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সিলভার ও বিগহেড কার্প নরম প্রকৃতির মাছ। তাই জালের ঘষা লেগে যাতে মাছ আহত না হয় সে দিকে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার।

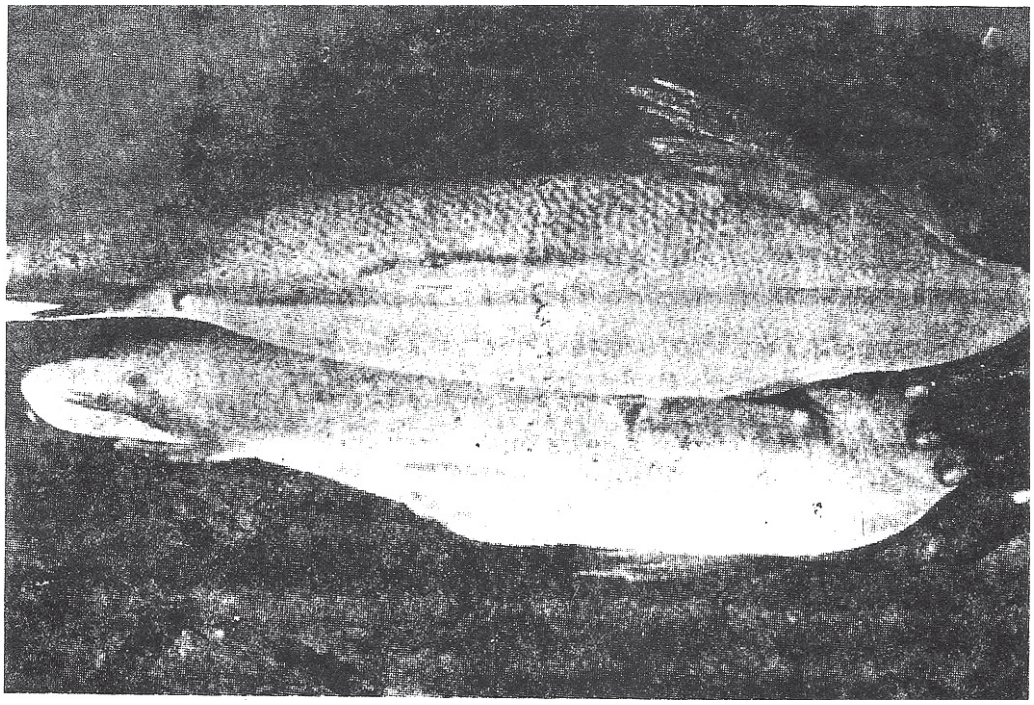

চিত্র : স্ত্রী ও পুরুষ সিলভার কার্পের ব্রুড

৪। হরমোন প্রয়োগ :

চাইনিজ কার্প মাছের প্রণোদিত প্রজননে হরমোন হিসেবে পিজি ও এইচসিজি দুটোই ব্যবহার করা যায়। তবে কেউ কেউ শুধুমাত্র এইচসিজি দিয়েই প্রজনন করান আবার কেউ কেউ পিজি ও এইচসিজি একত্রে প্রয়োগ করেন। পিজি ব্রুড মাছের শরীরের ওজন অনুপাতে মি.লি. গ্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে এইচসিজি ব্রুড মাছের শরীরের ওজন অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট (International unit বা I.U) মাত্রায় ব্যবহার করা হয়।

৫। হরমোন মাত্রা :

চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছে পিজি ও এইচসিজিউভয় প্রকার হরমোনই ব্যবহার করা হয়। মাছের প্রজনন অঙ্গের পরিপক্বতা ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে হরমোন মাত্রায় কম বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া এক জন অভিজ্ঞ মৎস্য প্রজননকারী তার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ অনুসারে হরমোনের মাত্রার কার্যকরী ডোজ ঠিক করে নিতে পারেন। নিম্নের ছকে চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছের প্রজাতি অনুযায়ী হরমোনের মাত্রা দেওয়া হলো :

প্রজাতি	১ম ইনজেকশন প্রতি কেজি	ব্যবধান ঘণ্টা	২য় ইনজেকশন প্রতি কেজি	মন্তব্য
সিলভার কার্প	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	৯-১২	৮০০-১২০০ আই ইউ এইচ সিজি	২য় ইনজেকশনের ৭-৮ ঘণ্টা পর ওভুলেশন
	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	৮	৩০০-৪০০ আই ইউ এইচ সিজি	ঐ
	২.২ মিলি গ্রাম পিজি	৬	৪.৮ মি.গ্রা. পিজি	ঐ
গ্রাস কার্প	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	১২	১৪৫০ আই ইউ এইচ সিজি	২য় ইনজেকশন ৬ ঘণ্টা পর ২.৫ মি. গ্রা. পিজি ৪-৬ গন্টা পর ওভুলেশন
	১.৫-২.০ মি. গ্রাম পিজি	৬	৪.৫ মি.গ্রা. পিজি	২য় ইনজেকশন ৬ ঘণ্টা পর ওভুলেশন
বিগহেড কার্প	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	৯-১২	৪০০ আই ইউ এইচ সিজি + ২ মি.গ্রা. পিজি	ঐ
	২০০ আই ইউ এইচ সিজি	১২	১৪০০ আই ইউ এইচ সিজি	ঐ

৬। দ্রবণ তৈরি :

প্রজননের জন্য বাছাই করা স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রজাতি অনুসারে সংখ্যা ও ওজন একটা খাতায় লিখে রাখতে হবে। এবারে ওজন অনুযায়ী পিজি ও এইচসিজি দ্রবণ তৈরি করে নিতে হবে। পিজি দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এইচসিজি পাউডার আকারে কাচের ভায়ালে বা কাগজের প্যাকেটে প্যাক করা থাকে এবং হরমোনের পরিমাণ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে লেখা থাকে। এইচসিজি পাউডার ডিস্টিলড ওয়াটারে দ্রবীভূত করে সেন্ট্রিফিউজে থিতিয়ে নেয়া হয়। থিতানো দ্রবণ ইনজেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭। ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি :

চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছের মাংসপেশির ভিতর ইনজেকশন দেওয়া হয়। সূক্ষ্ম সুচ ব্যবহার করে পৃষ্ঠ পাখনার নিচে মাংসপেশিতে বা লেজে ইনজেকশন দেওয়া হয়। হরমোন দ্রবণ এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে প্রতি কেজি মাছের দেহে ০.২ থেকে ০.৩ মিলি এর বেশি দ্রবণ প্রবেশ না করে। অনেক সময় ইনজেকশন দেওয়ার আগে মাছকে অবচেতন করে নেয়া হয়। অবচেতন করার জন্য এমএস ২২২ বা কুইনালডিন ব্যবহার করা হয়। ব্রুড মাছ ধরে বাছাইয়ের পর হ্যাচারির পানিতে ৬-৭ ঘণ্টা খাপ খাওয়ানোর পর প্রথম ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই কার্যক্রম এমন ভাবে শুরু করা হয় যাতে সকালে ঠাণ্ডার মধ্যে জাল টানার কাজ হয়ে যায়। মাছের বিশ্রামের পর ইনজেকশনের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে গভীর রাতে কষ্ট করে জাগতে না হয়। ইনজেকশন দেওয়ার সময় হ্যাচারিতে অন্তত তিনজন কর্মীর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

৮। প্রজনন পদ্ধতি :

চাইনিজকার্প সহজাত পদ্ধতিতে প্রজনন করে না এজন্য সর্বদা এদের পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে পৃথক পৃথক চৌবাচ্চায় রাখা হয়। সর্বশেষে ইনজেকশন দেওয়ার পর ৬-৭ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছের দু-একটা ডিম বের হতে শুরু করে। ডিম বের হতে থাকলেই বুঝতে হবে ওভুলেশনের সময় হয়েছে। **ওভুলেশন হচ্ছে স্ত্রী মাছের ডিম্বাশয়ের ডিমগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হওয়া এবং ডিমগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে মাছের জননেন্দ্রিয় দিয়ে সামান্য চাপে বের হয়ে আসার অবস্থা।** ঠিকমতো ওভুলেশন না হলে স্ত্রী মাছকে সাবধানে ধরে প্লাস্টিকের গামলায় স্ট্রিপিং করে ডিম সংগ্রহ করা হয়। একই ভাবে পুরুষ মাছকে ধরে পেটে চাপ দিয়ে সংগৃহীত ডিমের উপর শুক্র (মিল্ট) সংগ্রহ করা হয়। পাখির পালক দিয়ে ডিমের সাথে শুক্র ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এবারে অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে ডিম নাড়াচাড়া করে ডিম ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে ৩-৪ বার ধুয়ে ফেলায় অতিরিক্ত শুক্রাণু পানির সাথে চলে যায়। এভাবে ধুয়ে ফেলার পর আধা ঘণ্টা পর্যন্ত ডিমগুলো পরিষ্কার পানির মধ্যে রেখে দিতে হয়। স্ট্রিপিং করার সময় মাছ ধরা ও আনার

কাজের জন্য অন্তত তিনজন কর্মী থাকা দরকার। অনেকে স্ট্রিপিং করার সময় মাছকে অবচেতন করে থাকে। স্ট্রিপিং পদ্ধতিতে ডিম বেশি পাওয়া যায় এবং ভালোভাবে নিষিক্ত হয় ফলে রেণু বেশি উৎপন্ন হয়। ২-৩ বছর বয়সের ২-৫ কেজি ওজনের সিলভার কার্পের স্ত্রী ব্রুড হতে গড়ে প্রতি কেজি দেহ ওজনের ১৫০০০০ - ৩০০০০০টি ডিম পাওয়া যায়। ২-৩ বছরের ৩-৭ কেজি ওজনের বিগহেড কার্পের স্ত্রী ব্রুড হতে প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ১০০০০০-১২৫০০০টি ডিম পাওয়া যায়। ২-৩ বছরের ১.৫-৪ কেজি ওজনের গ্রাস কার্প হতে প্রতি কেজি দেহ ওজনে ৪৫০০০-১১৫০০০টি ডিম পাওয়া যায়।

৯। ডিম ফুটানো :

নিষিক্ত ডিম পানিতে ভিজে ফুলে বড় বড় হয়ে যায়। এবারে নিষিক্ত ডিমকে ১-১.৫ কেজি হারে প্রতিটি হ্যাচিং জারে স্থানান্তর করা হয়। প্রথম ঘণ্টা দুয়েক পানিপ্রবাহের মাত্রা প্রবাহ প্রতি মিনিটে ১১-১৫ লিটার রাখা হয়। এরপর ৮-১০ ঘণ্টা সময় হ্যাচিং জারে পানির প্রবাহ একটু কমিয়ে দিতে হবে। এ সময়ে ডিমের মধ্যে ভ্রূণ ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে এবং ডিমের মধ্যে মোচড় দিয়ে নড়াচড়া করে। ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ পানির তাপমাত্রার সাথে কম বেশি হয়। সাধারণত ২৭°- ৩০° সেঃ তাপমাত্রায় নিষিক্ত ডিম ১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে রেণু বের হয়। রেণু ফুটে বের হলে আবার পানির প্রবাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে ডিমের খোসা ও অনান্য দূষিত পদার্থ সহজে ধূয়ে যেতে পারে। সব ডিম ফুটে গেলে এবং যাবতীয় ময়লা ও ডিমের খোসা পরিষ্কার হয়ে গেলে পানিপ্রবাহের মাত্রা কমিয়ে মিনিটে ৭-৮ লিটার করা হয়। এভাবে আরও ২০-৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত রেণুকে হ্যাচিং জারে রেখে দেওয়া হয়।

প্রশ্নমালা-৪

এক কথায় উত্তর দাও

১। সহজাত পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?

২। প্রজননের জন্য বাছাইকালে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের অনুপাত কত হওয়া উচিত?

৩। প্রজনন প্রভাবিত করে এমন ২টি হরমোন এর নাম লেখ।

৪। সিলভার কার্পের প্রণোদিত প্রজননের কোন হরমোন ব্যবহার করা হয়?

৫। বেশির ভাগ হ্যাচারি মালিকগণ কোন কোন হরমোন ব্যবহার করেন?

৬। ঠাণ্ডা আবহাওয়া প্রজননের জন্য হরমোনের পরিমাণ কম না বেশি লাগে?

৭। রুই-মৃগেল এর ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে প্রজননের জন্য কয়টি ইনজেকশন দিতে হয়?

৮। ব্রুড মাছকে অচেতন করার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন একটি ওষুধের নাম লেখ।

৯। ওভুলেশন বলতে কী বুঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মাছের দেহে কোন কোন জায়গায় ইনজেকশন দিতে হয়?

২। প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত পাঁচটি হরমোনের নাম লেখ।

৩। ব্রুড মাছ সংগ্রহের উৎসগুলোর নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কার্প জাতীয় মাছের প্রণোদিত প্রজননের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর।

২। চাইনিজ কার্প জাতীয় মাছের প্রণোদিত প্রজননের বিভিন্ন ধাপ সমূহ আলোচনা কর।

৩। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের মাস ওয়ারি হরমোন প্রয়োগের ডোজের বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

মাছের রেণুপোনা ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের পোনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা অতীব জরুরি। বিভিন্ন আকারের পোনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে পোনা ব্যবসায়ী এবং পুকুর মালিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। নিচে বিভিন্ন আকারের পোনার বেড়ে ওঠার পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

১. রুইজাতীয় মাছ

চিত্র : ডিম পোনা

ডিম পোনা

ক. মাছের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণ তৈরির পর যখন তা নাড়াচাড়া শুরু করে (ডিমের ভিতরে) সে ধাপকে সাধারণত ডিম পোনা বলা হয়।

খ. ডিম নিষিক্ত হয়ে ভ্রূণ তৈরির পর ডিম্ব-থলি দুই থেকে তিন দিন পরে মিলিয়ে যায়। এই ডিম্ব-থলি মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে ডিম পোনা বলা হয়ে থাকে।

গ. ডিম্ব-থলি থাকা অবস্থায় ডিম পোনা পানি হতে খাবার গ্রহণ করে না।

ঘ. ডিম পোনা মাছের আকার ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটার হয়ে থাকে।

চিত্র : রেণু পোনা

রেণু পোনা

ক. ডিমপোনার পেটের থলি মিলিয়ে যাবার পরের স্তরই হলে রেণুপোনা। রেণুপোনার দেহ লম্বাটে ও চিকন হয়ে থাকে।

খ. রেণুপোনাকে সাধারণত সিদ্ধ ডিমের কুসুম খাওয়ানো হয়।

গ. মাছের আকার ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে রেণুপোনার আকার ছয় থেকে দশ মিলিমিটার হয়ে থাকে।

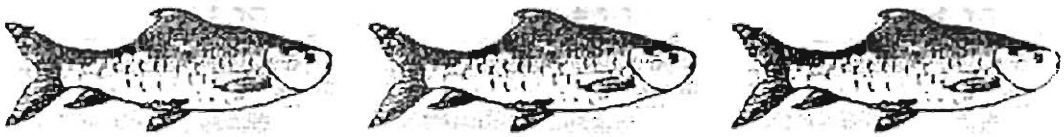

চিত্র : ধানী পোনা

ধানী পোনা

ক. সাধারণত ধানের আকারের পেনাকে ধানীপোনা বলা হয়। ধানী পোনাকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা-

১) জিরা ধানী– জিরা ধানী অপেক্ষাকৃত ছোট। এই আকার হতে ১০ থেকে ১২ দিন লাগে।

২) ধানী– ধানী পোনা জিরা ধানী হতে একটু বড় যা হতে ১২ থেকে ১৫ দিন লাগে।

৩) ধানী পোনার মধ্যে মাছের চেহারা পুরাপুরি প্রকাশ পায়। ধানী পোনার প্রধান খাদ্য হলো প্রাণিকণা বা জুপ্লাঙ্কটন।

৪) ধানী পোনার দৈর্ঘ্য এক থেকে দুই সে.মি.। রেণুপোনা হতে ধানী পোনার অবস্থায় পৌঁছতে ১২ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। এ অবস্থা থেকে নার্সারির দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়। এখানে পোনা কাটাই করা হয়।

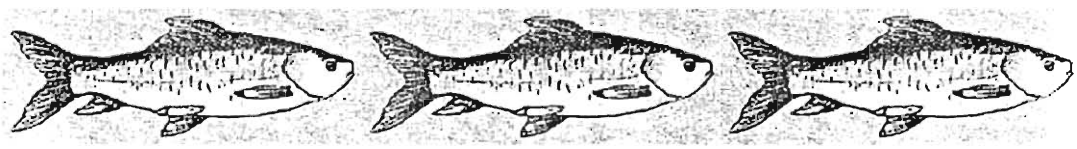

চিত্র : আঙ্গুলে পোনা

চারা পোনা বা আঙ্গুলে পোনা

ক. চারা পোনা আকারে মানুষের হাতের আংগুলের সমান বলেই একে আবার আঙ্গুলে পোনাও বলা হয়ে থাকে। মাছ চাষের জন্য চারা পোনা বাং আঙ্গুলে পোনা পুকুরে ছাড়তে হয়। সাধারণত ৫ সে.মি. হতে ১৫ সে.মি. দীর্ঘ পোনাকে চারা পোনা বলা হয়।

খ. চারা পোনাকে কৃত্রিম খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও চারা পোনার পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়।

গ. চারা পোনার দৈর্ঘ্য ১০-১৫ সে.মি.। এ অবস্থায় সাধারণত নার্সারি থেকে পুকুরে ছাড়তে।

চাপের পোনা

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার পোনা ছাড়া আরো এক ধরনের পোনা আছে যাকে বলা হয় চাপের পোনা (over wintering fingerlimg)। পূর্ববর্তী বছরের পোনাকে বিক্রি না করে একটি পুকুরে অধিক ঘনত্বে মজুদ করে পরবর্তী বছরে যেসব পোনাকে বিক্রি করা হয় তাকেই চাপের পোনা বলা হয়।

চাপের পোনা মজুদ পুকুরে দ্রুত বাড়ে সেজন্য ইদানীং চাপের পোনার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নার্সারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ :

ক) কার্প নার্সারি পুকুরের বৈশিষ্ট্য :

ক. পুকুরের আয়তন ১০-২৫ শতাংশ।

খ. পানির গভীরতা ১-১.৫ মি.।

গ. আয়তকার পুকুর, ঢাল ১ঃ২ অথবা ১ঃ১.৫।

ঘ. মাটির গঠন দোআঁশ অথবা এটেল দোআঁশ।

ঙ. তলায় ১০-১৫ সে.মি. বেশি পচা কাদা থাকবে না।

চ. বাড়ির কাছাকাছি হলে ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধা হয়।

ছ. পুকুরের সব পাড় উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত হতে হবে।

জ. পুকুরে প্রচুর সূর্যের আলো (প্রায় সারাদিন) এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকবে।

ঝ. শীত বা গ্রীষ্মকালে পুকুর শুকিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই।

ঞ. মৌসুমি পুকুর নার্সারি ব্যবস্থাপনার জন্য ভালো।

ট. পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহ ব্যবস্থা থাকলে ভালো।

খ) পাড় মেরামত ও তলদেশের কাদা তোলা :

পুকুরে অতিরিক্ত কাদা নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকারক গ্যাস সৃষ্টি হয়।

ii) পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস পায়।

iii) পানির দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে।

iv) স্ত্রী মাছের ডিম্ব কোষ বৃদ্ধিতে ক্ষতি সাধন।

v) পুরুষ মাছের শুক্রাণু সৃষ্টিতে ক্ষতি সাধন।

vi) মাছ আহরণে সমস্যা হয়।

পুকুরে পাড় ভাঙা থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) পাড় ভাঙা থাকলে, মাছ বের হয়ে যেতে পারে।

ii) বিষাক্ত পানি ঢুকে মাছ মারা যেতে পারে।

iii) বাহির থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে ঢুকতে পারে।

iv) মৎস্যভুক প্রাণী সহজে ঢুকতে পারে ইত্যাদি।

গ) জলজ আগাছা দূর করা :

জলজ আগাছা নিম্নোক্ত সমস্যা সৃষ্টি করে :

i) জলজ আগাছা পুকুরে থাকলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না ফলে প্রাকৃতিক খাদ্য কম তৈরি হয়।

ii) ক্ষতিকর প্রাণী যেমন : সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ ইত্যাদি আশ্রয় নিতে পারে।

iii) জলজ আগাছা পুকুরের পুষ্টিকর দ্রব্য শোষণ করে নেয়।

iv) জলজ আগাছা ব্রুড মাছের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই সব ধরনের জলজ আগাছা দূর করতে হবে।

ঘ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা :

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে থাকলে নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি হয় :

i) চাষকৃত মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে।

ii) চাষকৃত মাছের জায়গা দখল করে নেয়।

iii) প্রজনন করে মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে ফেলে।

iv) মাছকে আহত করতে পারে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ তিনভাবে দমন করা যায়:

i) বার বার জাল টেনে

ii) রোটেনন প্রয়োগ করে।

প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্য ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করতে হয়।

iii) পুকুর শুকিয়ে

ইহা রাক্ষুসে অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে পুকুর রোগ জীবাণুমুক্ত হয়, উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই কাজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে করলে খরচ কম হয়। নার্সারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার জন্য অবশ্যই পুকুর শুকাতে হবে।

ঙ) চুন প্রয়োগ :

চুন প্রয়োগে নিম্নলিখিত উপকার হয় :

i) চুন মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করে।

ii) মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর করে।

iii) জৈব পদার্থের পচন ত্বরান্বিত করে।

iv) মাটি হতে ক্ষতিকর গ্যাস দূর করে দেয়।

v) মাটির পিএইচ ওঠা-নামাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

vi) রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে।

পুকুর শুকানোর পরপরই প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন রৌদ্রোজ্জ্বল সময়ে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের পরপরই পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে।

চ) সার প্রয়োগে :

সার প্রয়োগের মাত্রা:

সারের নাম	মাত্রা/শতাংশ
ইউরিয়া	২৫০ গ্রাম
টি.এস.পি	৫০০ গ্রাম
এম.পি	১২০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৮০০ গ্রাম
গোবর	৬০০০-৯০০০ গ্রাম

চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর রাসায়নিক সার ও গোবর উপরোক্ত মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। এর ৪-৫ দিন পর হররা বা জাল টেনে তলদেশের মাটি নড়া-চড়া করে ভিজানো খৈল পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

ছ) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। এক্ষেত্রে পানির রং হালকা সবুজ অথবা বাদামি হতে পারে। পানিতে ফাইটোপ্লাংক্টন বেশি থাকলে পানির রং হালকা সবুজ হয় এবং পানিতে জুপ্লাংক্টন বেশি থাকলে পানির রং বাদামি হয়। তিনভাবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায়।

(i) গামছা-গ্লাস পরীক্ষা সাহায্যে

(ii) সেকিডিস্কের সাহায্যে

(ii) হাতের সাহায্যে

জ) জলজ পোকামাকড় দমন : পুকুরে সার প্রয়োগের পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধি সাথে সাথে রেণু পোনার ক্ষতি করে এমন অনেক ধরনের জলজ পোকা-মাকড় সৃষ্টি হয়। যেমন : হাঁস পোকা ড্রাগনফ্লাই, ওয়াটার স্টোক, আংগুলী পোকা, গোবর পোকা, বড় আকৃতির জুপ্লাংক্টন যেমন : ক্লাডোসিরা, কপিপোড ইত্যাদি। নার্সারি পুকুরে এ সমস্ত পোকামাকড় থাকলে এরা–

ক. রেণুর খাদ্য উপযোগী কীট (জুপ্লাংক্টন) নষ্ট করে।

খ. রেণু পোনা ধরে খায় বা পেট কেটে মেরে ফেলে।

দমন পদ্ধতি :

ক. ডিপটারেক্স : ৬-১২ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা।

খ. সুমিথিয়ান : ২-৩ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা।

জ) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা : পুকুরে রোটেননের সাহায্যে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা হলে এর বিষাক্ততা সাধারণত ৭ দিন পর্যন্ত থাকে। এর পরও সাবধানতা অবলম্বের জন্য মাছ ছাড়ার আগে কিছু পরিমাণ মাছ ঐ পানিতে ২৪ ঘণ্টা রেখে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যায়।

ঝ) হররা বা জাল টানা : পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত বা ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার জন্য হররা বা জাল টানতে হয়।

রেণুপোনার খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা :

পোনা মাছের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং দৈহিক বৃদ্ধি অর্থাৎ অধিক উৎপাদনের জন্য পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের সাথে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপরে

১। মাছের চাষ পদ্ধতি

২। খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান

৩। পানির তাপমাত্রা এবং

৪। চাষকৃত মাছের খাদ্যাভ্যাস।

সাধারণভাবে মাছের আকৃতিগত বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের পরিমাণগত প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দৈহিক ওজন বা আকৃতিগত বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহের প্রতি একক ওজনের জন্য খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১ কেজি ওজনের ১টি মাছের দৈহিক খাদ্য চাহিদার প্রতিটি ১০০ গ্রাম ওজনের ১০টি মাছের দৈনিক খাদ্য চাহিদা মোট পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। যদিও ১০টি মাছের মোট ওজন ১ কেজি।

বিভিন্ন বয়সে মাছের খাদ্য চাহিদা

পোনা (৫-গ্রাম)	আঙ্গুলে পোনা (১০-৫০ গ্রাম)	মাছ (৬০-গ্রাম)
১০%	৪-৬%	২-৪%

বিভিন্ন প্রজাতির খাদ্য চাহিদা

	খাদ্যের পরিমাণ (মাছের ওজনের %	
প্রজাতি	শুকনো খাদ্য	ভিজা খাদ্য
রুই জাতীয়	২-৩	৬-৮
মাগুর জাতীয়	৪-৫	৭-১০

প্রজাতিভেদে রেণু পোনাকে দুই ধরনের খাদ্য দেওয়া হয়।

১। জীবন্ত খাদ্য

২। অজীবন্ত খাদ্য

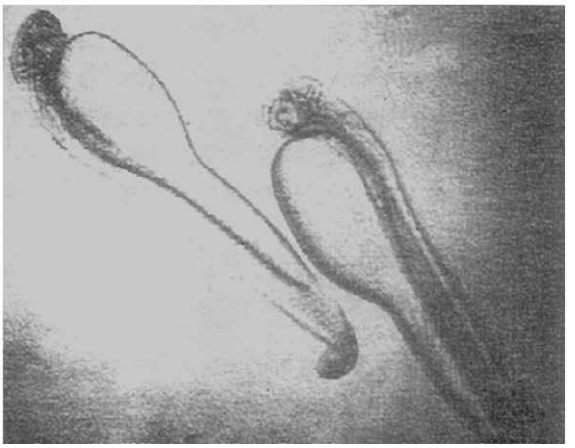

চিত্র : সদ্য স্ফুটিত মাছের রেণু

১। **জীবন্ত খাদ্য :** সাধারণত ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ যেমন থাই পাঙ্গাশ, মাগুর, গুলসা, পাবদা, শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছের রেণুকে জীবন্ত খাদ্য যেমন- জুপ্লাঙ্কটন, টিউবিফেক্স নামক লাল কেঁচো, আর্টিমিয়ার নপ্লি, ইত্যাদি দেওয়া হয়। হ্যাচিং-এর ১ দিন পর থেকে রেণুকে খুব হালকা আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন তাজা মাছ সিদ্ধ করে পেস্ট করার পর নাইলন কাপড়ে ছেঁকে দুধের মতো তরল করে ৩ ঘণ্টা পর পর রেণুকে খেতে দিতে হবে। ২-৩ দিন পর টিউবিফেক্স খাওয়াতে হয়। টিউবিফেক্স হলো লাল কেঁচো যা অগভীর ড্রেনে, কলের পাড়ে যেখানে হালকা স্রোত থাকে, এমন স্থানে দেখা যায়। রেণুকে টিউবিফেক্স আস্ত দিলে খেতে পারে না। কারণ তখনও এদের মুখের আকার খুব ছোট থাকে। তাই টিউবিফেক্সকে হামানদিস্তায় পিষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রেণুকে খাওয়াতে হয়।

টিউবিফেক্সের পাশাপাশি রেণুকে আর্টিমিয়া খাওয়াতে হবে। আর্টিমিয়া হচ্ছে লবণাক্ত পানিতে জমানো এক ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিংড়িজাতীয় প্রাণীর বাচ্চা। শাপলা ফুলের দানার মতো দেখতে আর্টিমিয়ার ডিম কোটাজাত অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়। এসব ডিমকে লবণাক্ত পানিতে কয়েক ঘণ্টা রেখে বায়ুপ্রবাহ দিলে ডিম ফুটে লাল রঙের বাচ্চা বের হয়। একে নপ্লি বলে। এটা রেণু পোনার উত্তম খাদ্য।

২। **অজীবন্ত খাদ্য :** সাধারণত কার্পজাতীয় মাছ যেমন, রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ইত্যাদি মাছের রেণুকে অজীবন্ত খাদ্য দেওয়া হয়। অজীবন্ত খাদ্য হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে মুরগির ডিম, আটা, ময়দা, খৈল, চালের কুঁড়া গমের ভুসি কলিজা সিদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৮-১০ দিন পর পোনাকে প্রস্তুতকৃত আঁতুর পুকুরে ছাড়তে হবে। পুকুরে পোনা মজুত করার পর মোট ওজনের ৮-১০% হারে সম্পূরক খাদ্য পানিতে গুলে পাতলা করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়। দিনে ৩ বার ছিটিয়ে দিতে হয়। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ৫০% ফিশমিল ও ৫০% চালের কুঁড়া দেওয়া যায়। আবার ৩০% রক্তের গুঁড়া ৩৫% খৈল ও ৩৫% কুঁড়া সহযোগে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়।

সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ : প্রতি কেজি রেণু পোনার জন্য

পোনার বয়স প্রতি কেজি রেণু পোনার জন্য সম্পূরক খাবারের পরিমাণ

১ম-২য় দিন : ৮ টা অধিক সিদ্ধ মুরগির ডিমের কুসুম ও ২ কেজি সিদ্ধ ময়দার দ্রবণ।

৩য়-৫ম দিন : ১.৫ কেজি সিদ্ধ ময়দা ও ১.৫ কেজি এক রাত ভিজিয়ে রাখা সরিষার খৈলের দ্রবণ।

৬ষ্ঠ-১০ম দিন : ৪ কেজি এক রাত ভিজিয়ে রাখা সরিষার খৈলের দ্রবণ।

১১তম-১৫তম দিন : ৫ কেজি এক রাত ভিজিয়ে রাখা সরিষার খৈলের দ্রবণ।

১৬তম-২৩তম দিন : ৬ কেজি এক রাত ভিজিয়ে রাখা সরিষার খৈলের দ্রবণ।

২৪তম-৩০তম দিন : ৭ কেজি এক রাত ভিজিয়ে রাখা সরিষার খৈলের দ্রবণ।

৩০ দিনে পোনা ১-২ ইঞ্চি সাইজের হবে।

এক মাস পর পোনার ঘনত্ব কমিয়ে প্রতি শতাংশে ১০০০-১২০০-তে নামিয়ে এনে দ্বিতীয় ধাপে লালন-পালন করা যায়, সে ক্ষেত্রে সম্পূরক খাবার নিম্নহারে দিতে হবে।

পোনার বয়স	১-২ ইঞ্চ সাইজের ১০০০০০ পোনার জন্য প্রতিদিনের সম্পূরক খাবারের পরিমাণ
৩১-৪০ দিন	৮-১২ কেজি চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল (১ঃ১ অনুপাতে)
৪১-৫০ দিন	১২-২৪ কেজি চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল (১ঃ১ অনুপাতে)
৫১-৬০ দিন	১৬ কেজি চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল (১ঃ১ অনুপাতে)
৬১-৭০ দিন	১৮ কেজি চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল (১ঃ১ অনুপাতে)
৭১-৮০ দিন	২০ কেজি চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈল (১ঃ১ অনুপাতে)

৮০ দিন পর পোনা ৩-৫ ইঞ্চি সাইজের হবে ।

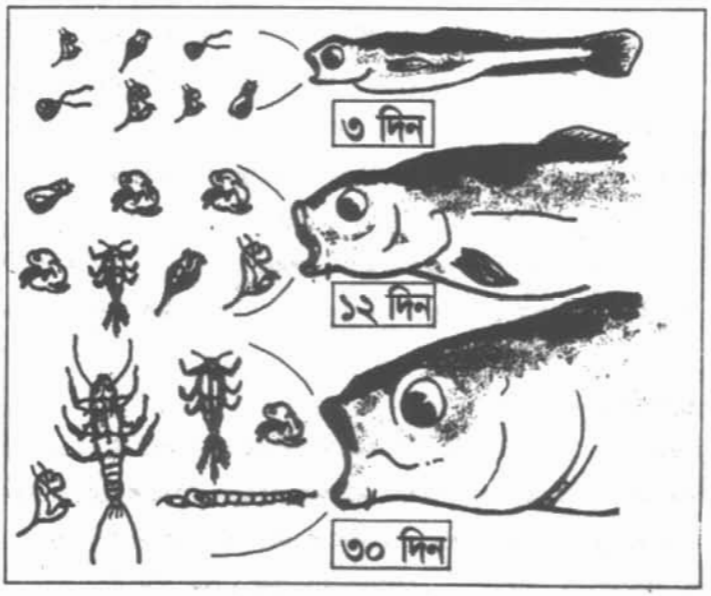

চিত্র : বিভিন্ন বয়সে পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য

ডিম সিদ্ধ করে কুসুমটা আলাদা করে পানিতে কচলে ভালো করে গুলাতে হবে। ময়দা গুলানো পানি ও কুসুম গুলানো পানিকে সূক্ষ্ম কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। ছেঁকে নেয়া তরল রেণু পোনার চৌবাচ্চায় দিলে ৩-৪ বার ছিটিয়ে দিতে হবে সরিষার খৈল অবশ্যই ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে প্রয়োগ করতে হবে। পরিমাণমতো খাদ্য দিনে ৩-৪ বার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অধিক উৎপাদনের জন্য এর সাথে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন- গবাদি পশুর রক্ত বা ফিশমিল দেওয়া যেতে পারে। গ্রাস কার্পের পোনার জন্য নিয়মিত ক্ষুদিপানা প্রয়োগ করতে হয়।

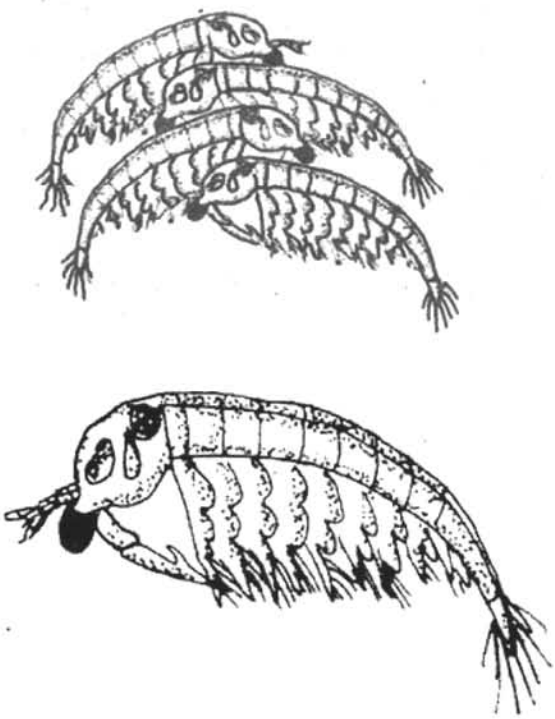

চিত্র : আর্টিমিয়া

আর্টিমিয়া ফুটানোর কৌশল

আর্টিমিয়া হচ্ছে একপ্রকার লোনা পানির চিংড়ি। দক্ষিণ আমেরিকায় উপকূলে লবণাক্ত পানিতে এদের চাষ করা হয় এবং এদের ডিম কৌটাজাত করে রপ্তানির জন্য সংরক্ষণ করা হয়। আর্টিমিয়ার ডিম দেখতে ঘুণের গুঁড়া বা শাপলা ফুলের দানার মতো লাল রঙের। আর্টিমিয়ার ডিম লবণাক্ত পানিতে কয়েক ঘন্টা রাখলে ফুটে বাচ্চা বের হয় যা মাছের পোনার উপযুক্ত খাদ্য। ডিম ফাটার পর বাচ্চাকে আর্টিমিয়া নপ্লি বলে।

ডিম ফুটানোর পদ্ধতি

৪-৫ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পাত্র হলে ভালো হয়। এই পাত্রে ২৮-৩০ পিপিটি (এক হাজার ভাগের এক ভাগ) লবণাক্ত পানি নিতে হবে। লবণাক্ত পানির অভাবে লিটার-প্রতি ৩০ গ্রাম খাবার লবণ মিলিয়ে নিলে চলবে। পাত্রটি আলোকময় স্থানে রাখতে হবে যাতে তাপমাত্রা ২২ ৩০^{0} সে. এর মধ্যে হয়। এবার পাত্রে মধ্যে আর্টিমিয়ার ডিম ফুটানোর জন্য দিতে হবে এবং পাত্রের মধ্যে বাতাস প্রবাহের জন্য এরেটর লাগিয়ে দিতে হবে। এরেশন এমন বেগে হতে হবে যাতে আর্টিমিয়ার ডিম পাত্রের তলায় জমা না হয়। ১২ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। ডিম ফুটে বের হলে বাচ্চাকে নপ্লি বলে।

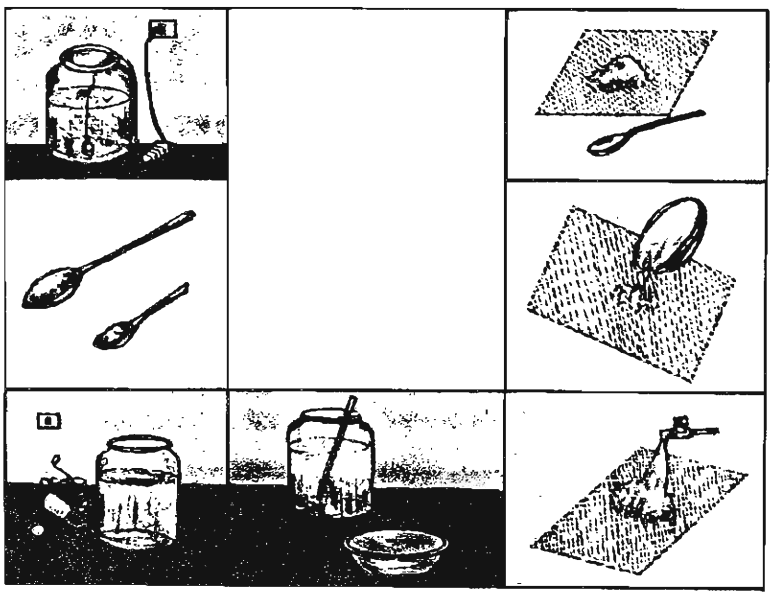

চিত্র : আর্টিমিয়া ফুটানোর পদ্ধতি

ডিম ফুটানোর পর পর নপ্লিকে আলাদা করে ফেলে এবং ডিমের খোসা ও নষ্ট ডিম ফেলে দিতে হবে। নপ্লি আলাদা করার জন্য এরেটর বন্ধ করে দিতে হবে। ৫-১০ মিনিটের মধ্যে ডিমের খোসা পানির উপর ভেসে উঠবে এবং নষ্ট ডিম পাত্রের তলায় তলানি হিসেবে জমা হবে। নপ্লির রঙ লাল তাই ডিম ফোটার পর পানি দেখতে লাল মনে হয়। এবারে সতর্কতার সাথে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে সাইফন করে মরা বা নষ্ট ডিম সরিয়ে ফেলতে হবে। একইভাবে উপরের স্তর হতে ভেসে ওঠা ডিমের খোসা ফেলে দিতে হবে। এবারে পরিষ্কার নপ্লি প্লাঙ্কটন নেটের সাহায্যে ছেঁকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে মাছের রেণুকে খাওয়াতে হবে।

টিউবিফ্যাক্সের চাষ

টিউবিফ্যাক্স (Tubifex) অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণী। অর্থাৎ এরা ও কেঁচো একই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। শহরের ড্রেনগুলোর কাদায় লাল রঙের যেসব প্রাণী কিলবিল করতে দেখা যায় এরাই Tubifex; কূয়া বা নলকূপের যে স্থান দিয়ে পানি নিস্কাশন হয় সেখানেও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

Tubifex কাদায় থাকলেও এদের জন্য অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানির আবশ্যক হয়। ড্রেনের যে অঞ্চলে পানি অক্সিজেনসমৃদ্ধ থাকে সেখানেই কেবল Tubifex বাস করে। ড্রেনের অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানি স্বচ্ছ থাকে। সেজন্য ড্রেনের তলায় Tubifex গুলোকে উপর থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সারা বছর ড্রেনে Tubifex দেখতে পাওয়া যায়। তবে শীতকালে ড্রেনের পানি কমে বা শুকিয়ে যায় বলে এদের পরিমাণ কমে যায়।
বর্ষাকালে ২/৩ সপ্তাহকাল বৃষ্টিহীন রোদ থাকলে ড্রেনগুলোতে Tubifex এর পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায়। এসময় বেশি পরিমাণে Tubifex আহরণ করা যায়। ভারি বৃষ্টির পর যদি ড্রেনে স্রোতের বেগ খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে স্রোতের সাথে কাদা সমেত Tubifex ভেসে চলে যায়। সেজন্য বর্ষাকালে ভারি বৃষ্টির পর শহরের ড্রেনগুলোতে Tubifex-এর পরিমাণ কমে যায়। তবে ২/৩ সপ্তাহ রোদ থাকলে এরা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।
Tubifex পানির অক্সিজেন নির্দেশক। পানিতে অক্সিজেন না থাকলে সেখানে Tubifex থাকে না। আবার কম অক্সিজেন পানিতে এরা কম নড়াচড়া করে এবং এদের গায়ের রঙ হালকা লাল থাকে। অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানিতে এরা খুব দ্রুত নড়াচড়া করে এদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল থাকে। Tubifex সব ধরনের জৈব পদার্থ খায়। ড্রেনের যে অংশ জৈব পদার্থ বেশি থাকে Tubifex বেশি পরিমাণ থাকে। ড্রেনের যেখানে ডাবের খোলস, পচা আলু বা অন্যান্য জৈব পচা থাকে সেখানে Tubifex খুব বেশি পরিমাণ থাকে।

চাষ পদ্ধতি :

ক. ড্রেনে চাষ

প্রথম ২/৩ ফুট প্রশস্ত ও ২৫/৩০ ফুট লম্বা এবং ১-১.৫ ফুট গভীর ড্রেনে করতে হবে। ড্রেনের মাটি 'ঝুর ঝুর' করে মাটির সাথে ১০ কেজি গোবর ও ১০ কেজি খৈল মিশাতে হবে এবং ড্রেনে পানি সরবরাহ করতে হবে। ড্রেনের পানির গভীরতা থাকবে ৬-৮ ইঞ্চি। ড্রেনকে বদ্ধ পানিসহ ধুয়ে ফেলে রাখতে হবে।

যখন গোবর ও খৈল মাটির সাথে মিশে যাবে এবং নরম হবে তখন প্রতি ৩০ ফুট দৈর্ঘ্যের ড্রেনের জন্য ১ কেজি করে Tubifex ছাড়তে হবে। Tubifex সারা ড্রেনে সমভাবে ছাড়িয়ে দিতে হবে। Tubifex ছাড়া শেষ হওয়ার সাথে ড্রেনে অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানির স্রোতে দিতে হবে। কোনো কারণে পানির সমস্যা/স্বল্পতা হলে ড্রেনের সবটুকু পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। কারণ ভেজা মাটিতে Tubifex দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকতে পারলেও অক্সিজেনবিহীন পানিতে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না।

প্রতিদিন আধা কেজি খৈল ড্রেনের কাদার ঠিক নিচে Tubifex-এর খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করতে হবে। ড্রেনে পানির স্রোত থাকার কারণে খৈল পচলেও কোনো অসুবিধা হবে না। বিশ দিন বা এক মাস পর যখন ড্রেনটি Tubifex-এ লাল হয়ে উঠবে তখন এদের সংগ্রহ করতে হবে।

কোনো হোস্টেল বা অন্য কোনো ধরনের আবাসিক এলাকার বাথরুমের পানি যদি Tubifex-এর ড্রেনে সরবরাহ করা যায় তাহলে উৎপাদন খরচ কম হয়।

পলিথিন সীট চাষ

প্রথমে মাটি, ইট, খড় বা আগাছা দিয়ে ৩/৪ ফুট ফাঁক করে দুটি সমান্তরাল আইল তৈরি করতে হবে। আইল দুইটি ২৫/৩০ ফুট লম্বা করতে হবে। এরপর আইল দুইটির মাঝে ছিদ্রবিহীন পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে।

এরপর দোঁ-আশ মাটিতে ১০% গোবর ও ১০% খৈল মিশিয়ে মাটিতে 'ঝুর ঝুরা' করে পলিথিনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিয়ে পানি দিয়ে ভর্তি করে ১৫ দিনের মতো রেখে দিতে হবে। এসময়ের মাঝে মাটি পচে নরম হবে। এই অবস্থায় পলিথিনের ড্রেন থেকে পুরানো পানি অপসারণ করতে হবে এবং ড্রেনে অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানির প্রবাহ দিতে হবে।

এরপর প্রতিটি ড্রেনে ১ কেজি Tubifex সারা ড্রেনে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই টিউবিফ্যাক্স পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে অসংখ্য টিউবিফ্যাক্স তৈরি করবে।

প্রতিদিন ড্রেনে Tubifex-এর খাদ্য হিসেবে আধা কেজি করে খৈল সরবরাহ করতে হবে। যখন ড্রেনের মাটি Tubifex দিয়ে লাল হয়ে উঠবে তখন সেখান থেকে এগুলো আহরণ করতে হবে।

কাদা হতে Tubifex আলাদাকরণ

থালা তার বা মশারির জাল দিয়ে Tubifex-সহ কাদার উপরের স্তর তুলে এনে বালতি বা বোলে জমা করতে হবে। এরপর কাদাগুলো তার বা মশারির জালের চালনিতে ধৌত করতে হবে। ধৌত করার এক পর্যায়ে কাদার পরিমাণ কমে আসে।

এই অবস্থায় Tubifex-সহ একটি বালতি বা বাটিতে কাদা ও পানি সমান অনুপাতে মশিয়ে রেখে থাল বা অন্য কোন ছিদ্রহীন পাত্র দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং ঢাকা অবস্থায় ১০/১২ ঘণ্টা রাখতে হবে। এ সময়ের ভিতর Tubifex গুলো কাদার উপরে পানিতে গুটি বেঁধে অবস্থান করবে। Tubifex গুলো এই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কাদামুক্ত হয়ে পড়ে। এখন Tubifex-এর গুলি হাত দিয়ে সংগ্রহ করে কোনো ট্রে বা থালে পানির প্রবাহ দিয়ে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ব্যবহারোপযোগী থাকবে। ইচ্ছা করলে এভাবে খৈল খাইয়ে এদের দীর্ঘদিন লালন করা চলে। তবে সবসময় পানির প্রবাহ দিতে হবে।

পোনা পরিবহনের পদ্ধতি :

পোনা পরিবহন : পোনা পরিবহনের দক্ষতা মাছ চাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সফলভাবে পোনা পরিবহনের উপর মাছ চাষে লাভ অনেকাংশে নির্ভরশীল। পোনা পরিবহনের সময় দুইটি জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অক্সিজেনের অভাবে পোনা যেন পানির উপর ভেসে না ওঠে এবং পরিবহনের সময় যেন পোনা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। রেণু পোনা পরিবহন হয়ে থাকে মূলত–

১। নার্সারি পুকুর

২। লালন পুকুর

৩। মজুদ পুকুরের জন্য

পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণ :

১। অক্সিজেন ঘাটতি :

ক) পোনা মাছের অক্সিজেন চাহিদা, জাত, তাপমাত্রা ও শরীর তত্ত্বীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে।

খ) একটি পাত্রে যত বেশি মাছ থাকবে সেখানকার অক্সিজেন তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।

গ) যদি অতিমাত্রায় বা ঘনত্বে মাছ রাখা হয় তবে পরিবহনের পূর্বে এবং পরিবহনকালীন সময়ে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে ও অক্সিজেন ঘাটতি ঘটে মাছ মারা যেতে পারে।

২। শারীরিক ক্ষত :

ক) জাল টানার সময়, ওজন ও গণনা করার সময় এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তরের সময় মাছের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

খ) পানির মধ্যে থেকে পরীক্ষার জন্য নাড়ার সময় আঁইশ উঠে গিয়েও ক্ষত হতে পারে।

৩। অ্যামোনিয়া :

ক) পরিবহনকালে নিঃসৃত মল পচনের ফলে পাত্রে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। যার ফলে পানি বিষাক্ত হয়ে পোনা মারা যেতে পারে। ২১ দিনের কম বয়সী পোনার ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া বেশি ঘটে থাকে।

৪। তাপমাত্রা :

পানির তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পোনার অক্সিজেন চাহিদা বাড়ে। কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে।

৫। পরিবহন সময় :

ক) দূরত্ব বেশি হলে অধিক পরিবহন সময়ের কারণে ও কঠিন চাপে পোনার মৃত্যু হতে পারে।

খ) স্বল্প সময়ের ক্ষেত্রে ও সতর্ক থাকতে হবে।

৬। সংগ্রহ পদ্ধতির ত্রুটি :

ক) পোনা সংগ্রহে ত্রুটির কারণেও পরিবহন কালে পোনা মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে।

৭। রোগাক্রান্ত ও দুর্বল পোনা :

ক) পোনাগুলো যদি দুর্বল বা রোগাক্রান্ত থাকে তাহলে মৃত্যুহার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়।

৮। পরিবহনের পূর্বে টেকসই না করা : মাছকে প্রতিকূল অবস্থার সাথে সহনশীল করে নেওয়াটাই হলো টেকসইকরণ।

ক) টেকসইকরণ ব্যতিত পোনা নাজুক বা কাঁচা থাকে।

খ) কাঁচা পোনা পরিবহনকালীন ধকল সহ্য করতে পারে না।

১। পোনা পরিবহনের সনাতন পদ্ধতি : অনেক আগে থেকে আমাদের দেশে পোনা মাছ মাটির পাত্রে পরিবহন করা হয়ে আসছে। বর্তমানে অবশ্য ধাতব পাত্র যেমন– কেরোসিনের টিন, কাঁসা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল ও একাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যেহেতু ধাতব পাত্রের পানি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় ফলে পোনা মারা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ভেজা কাপড় বা চট পানিতে ভিজিয়ে পাত্রের গায়ে জড়িয়ে রাখলে পাত্র সহজেই গরম হয় না। একজন বিক্রেতা এক সঙ্গে দুইটি হাঁড়ি কাঁধে বহন করার জন্য দড়ির শিকাসহ বাঁশের তৈরি একটি বাঁক ব্যবহার করে থাকে। একটি পাত্রে ৩০-৩৫ লিটার পানি ধরতে পারে। দুটি হাঁড়িতে নদী বা পুকুরের পানি আধা আধি মতো ভর্তি করে কিছু লাল মাটি মিশিয়ে আনুমানিক ৪০০০০-৬০০০০০টি রেণু পোনা প্রতি হাঁড়িতে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। হাঁড়ির মুখে গামছা থাকে সঙ্গে ছোট বাঁশের ঝুড়ি। এভাবেই রেল, বাস, লরিতে বহন করা হয়। যেখানে কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই, সেখানে মানুষ বাঁকের সাহায্যে তাদের সর্বত্র বিতরণ করা হয়।

চিত্র : পোনা পরিবহনের সনাতন পদ্ধতি

হাঁড়ির পানিকে সব সময় ঝাঁকাতে এবং মাঝে মাঝে থাবড়াতে হয়। মাঝে মাঝে হাঁড়ির মধ্যে নারকেলের দড়ি দিয়ে কচিয়ে মরা রেণু পোনা ফেলে দিতে হবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগ পর্যন্ত সব সময়ই মনোযোগ সহকারে এসব কাজ করতে হয়। অনেক সময় নৌকার মাঝখানে (খোলেও) পোনা পরিবহন করা হতো।

হাঁড়িতে পোনা পরিবহনকালে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত :

১। পোনা পরিবহনকালে হাঁড়িতে বেশি বেশি এবং খুব জোরে ঝাঁকানি দেওয়া ঠিক নয়। কারণ তাতে অনেক পোনা হাঁড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে জখম হতে পারে।

২। পোনা পরিবহনকালে পানি বদলানোর জন্য বালতি, মগ ও গামছা প্রভৃতি সরঞ্জাম সঙ্গে রাখা দরকার।

৩। শহরের টেপ বা কলের পানি দিয়ে হাঁড়ির পানি বদলানো উচিত নয়, কারণ তাতে ক্লোরিন গ্যাস থাকে এবং পোনা মারা যায়।

৪। পানি সর্বদাই ধীরে-সুস্থে বদলানো উচিত। হাঁড়ির পানির তাপমাত্রা ও নতুন পানির তাপমাত্রার বিভিন্নতা পোনা সহ্য করতে পারে না। তাই নতুন পানি পূর্ণ করার আগে যতদূর সম্ভব নতুন ও পুরনো পানির তারতম্য লক্ষ্য করে নেয়া উচিত।

৫। পরিবহনকালে যদি কোনো পোনা জখম হয় বা মারা যায় তাহলে তাকে সাবধানে হাঁড়ি থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৬। পোনাগুলোর মধ্যে থেকে রাক্ষুসে মাছের পোনা ও পোকামাকড় সরিয়ে ফেলতে হবে। শারীরিক পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সাবধানতা সত্ত্বে ও পুরানো পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনকালে পোনার সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য কিছুটা অনিশ্চয়তা এ ব্যবসায় সব সময় থাকে। তাই পোনা আরও সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে পৌঁছাবার ব্যবস্থার কথা ভাবা দরকার যাতে পোনার ক্ষতি খুব সামান্যই হয়।

২। মিশ্র পদ্ধতি :

ক) ড্রামে :

১. ২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রামে ২০-২৪ ঘণ্টা দূরত্বে ২.৫ সে. মি. মাপের ১০০০০-১২০০০ টি (১২-১৪ কেজি) এবং ৫-৭ সে. মি. মাপের ৮০০০-১০০০০ টি পোনা (১৫-২০ কেজি) প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর পানি পরিবর্তন করে পরিবহন করা যায়।

২. ড্রামের পানি পরিবর্তন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভেতরের ময়লাগুলো বের হয়ে যায়।

৩. পানির মধ্যে প্রতি লিটারে ১০ গ্রাম বরফ দিয়ে তাপমাত্রাকে ২০° সে. রাখতে পারলে মাছের সহজ প্রতিশব্দ কমে যাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কম অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।

৪. প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী টেকসইকৃত ১ কেজি মাছকে ১০ লিটার পানিতে পরিবহন করা হয়।

৫. অত্যন্ত অভিজ্ঞ পোনা ব্যবসায়ীরা কোনো কোনো সময় ১০ লিটার পানিতে ২ কেজি পর্যন্ত পরিবহন করে থাকেন কিন্তু এটা অধিক ঝুকিপূর্ণ।

৬. অক্সিজেন বা ত্র্যরেটরের ব্যবস্থা করতে পারলে দ্বিগুণ পোনা পরিবহন করা যাবে।

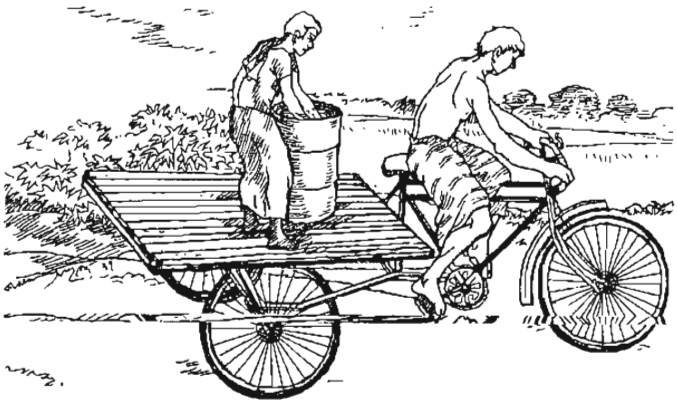

খ) ট্যাংক অথবা বৃহৎ ফাইবার গ্লাস পাত্রে :

১. বড় বড় বাণিজ্যিক হ্যাচারি অথবা নার্সারিতে পরিবহনের জন্য দুই দেয়াল বিশিষ্ট তাপ নিরোধক বড় আকারের (১০০০ লিটার) ফাইবার গ্লাস ট্যাংক ব্যবহার করা হয়।

২. স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নলকূপের পানিতে পর্যায়ক্রমে প্রতি লিটারে ১০ গ্রাম বরফ যোগ করে ঠাণ্ডা করা হয়।

৩. এ ধরনের ট্যাংকে ৪-৫ ঘন্টা দূরত্বে ১০০-১৩০ কিলো/ঘনমিটার হারে পোনা পরিবহন করা যায়।

৩। পোনা পরিবহনের উন্নত (আধুনিক) পদ্ধতি :

এ পদ্ধতিতে পোনা পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পরিবহন করা হয়। এ পদ্ধতি খুবই নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত। এভাবে পোনা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহন করা সম্ভব। আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়।

১। প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ

২। অক্সিজেন সিলিন্ডার

৩। রাবারের নল

৪। বোর্ড কাগজ

৫। হালকা কাঠের বাক্স, চটের থলে ইত্যাদি।

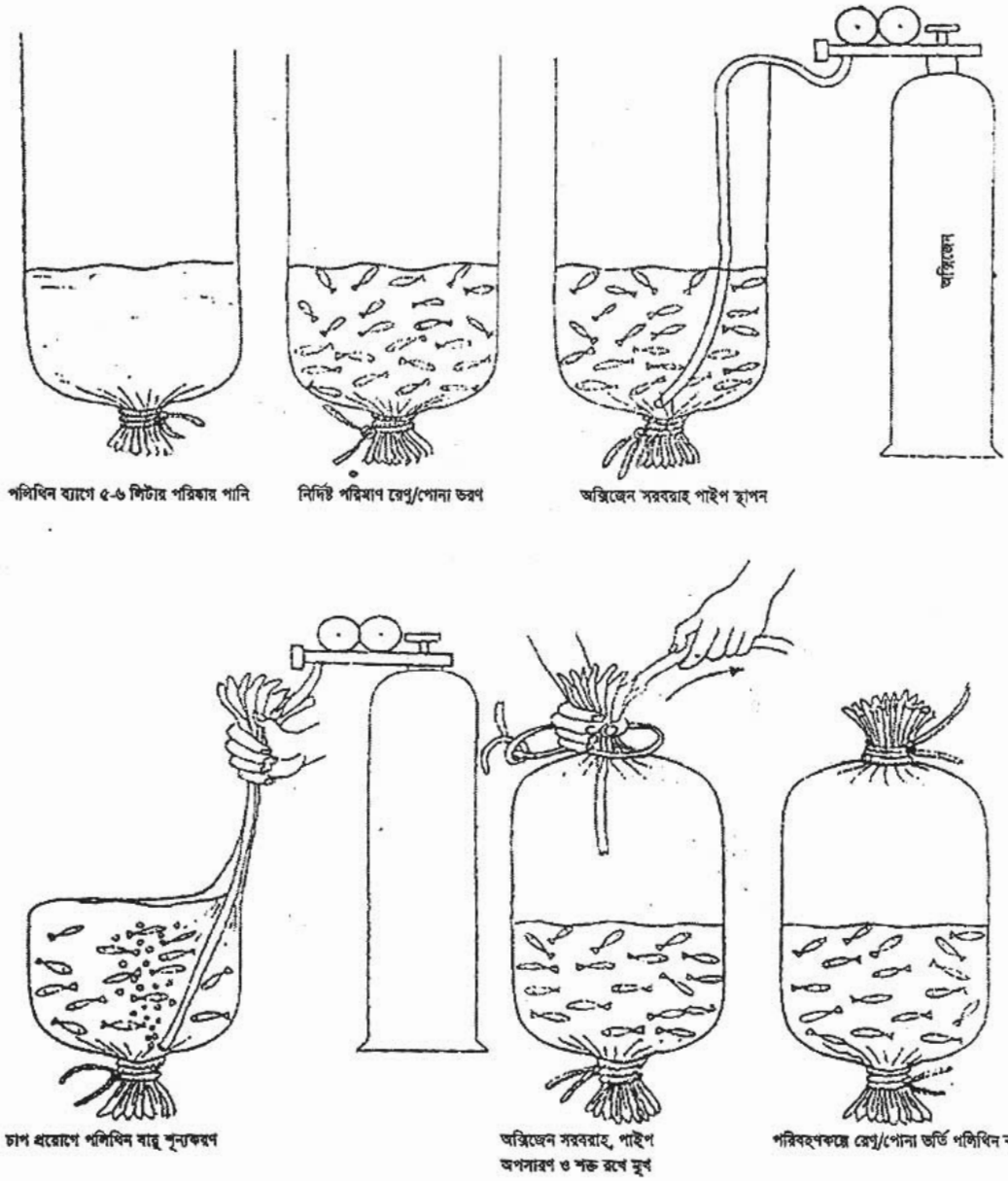

চিত্র : আধুনিক পদ্ধতি

পোনা প্যাকিং :

১। সাধারণত প্রতিটি প্যাকেটের জন্য দুটি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত কারণ দৈবক্রমে যদি একটি ব্যাগ ছিদ্র হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয়টি পানি ও অক্সিজেনসহ পোনাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

২০২০

২। সমান আকারের দু'টি পলিথিনের ব্যাগ একটি আরেকটির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটি ব্যাগে পরিণত করতে হবে এবং নিচের অংশ মুচকিয়ে দিয়ে শক্ত করে রশি দিয়ে বাঁধতে হবে যাতে পলিথিনের জোড়া ছিঁড়ে গিয়ে পানি পড়ে না যায়। পলিথিনের ব্যাগ বিভিন্ন আকারের হতে পারে। পরিবহনের সুবিধা অনুযায়ী এটি তৈরি করা যেতে পারে।

৩। প্যাকিং এর পূর্বে পোনা যে পানিতে রাখা হয় সাধারণত সেই পানিতে পোনা পরিবহন করা উচিত। তাই একই উৎস থেকে একই তাপমাত্রার পানি এবার পলিথিনে ঢুকাতে হবে এবং ব্যাগের ১/৩ অংশ পানিতে ভর্তি করতে হবে।

৪। পানি ভর্তি করার পর ব্যাগের উপরিভাগ হাত দিয়ে মুচড়িয়ে এক হাতে ধরতে হবে এবং নিচের অংশ আরেক হাত দিয়ে ধরে ব্যাগটিকে উল্টিয়ে ও ঘুরিয়ে দেখতে হবে কোন ছিদ্র পথে পানি বেরিয়ে যায় কিনা। ছিদ্র যুক্ত ব্যাগ পরিহার করতে হবে।

৫। পানি ভর্তি ব্যাগে পোনা ভরতে হবে। কতকগুলো পোনা একটি ব্যাগে ভরতে হবে তা পথের দূরত্ব এবং পোনার আকারের উপর নির্ভর করে। ৩৬×২৪ ইঞ্চি ব্যাগে ৮-১২ ঘণ্টার যাত্রায় ২৫০-৩০০ গ্রাম রেণু পরিবহন করা যায়।

৬। পলিথিন ব্যাগে পোনা ঢোকানোর পর অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে নলের সাহায্যে সতর্কতার সাথে ব্যাগে অক্সিজেন ঢোকাতে হবে এবং ব্যাগের ২/৩ অংশ অক্সিজেন দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। অক্সিজেন দেওয়ার সাথে সাথে ব্যাগের মুখ শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে অক্সিজেন বেরিয়ে না যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, অক্সিজেন সরবরাহের আগে ব্যাগের মুখটি আলতোভাবে মুড়িয়ে নিতে হবে।

৭। চটের ব্যাগ ও কার্টন ব্যবহার :

পোনাসহ পলিথিন ব্যাগটি পরিবহনের সুবিধার্থে চটের ব্যাগ, টিন অথবা কার্টনের ভিতর ঢুকিয়ে নিতে হবে। চটের ব্যাগ অথবা কার্টন পলিথিন ব্যাগটিকে নিরাপদে রাখতে সহায়তা করে। চটের ব্যাগ ব্যবহার করলে তা মাঝে মাঝে পানি দিয়ে ভিজিয়ে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করা যায়। এতে পোনা ভালো থাকে।

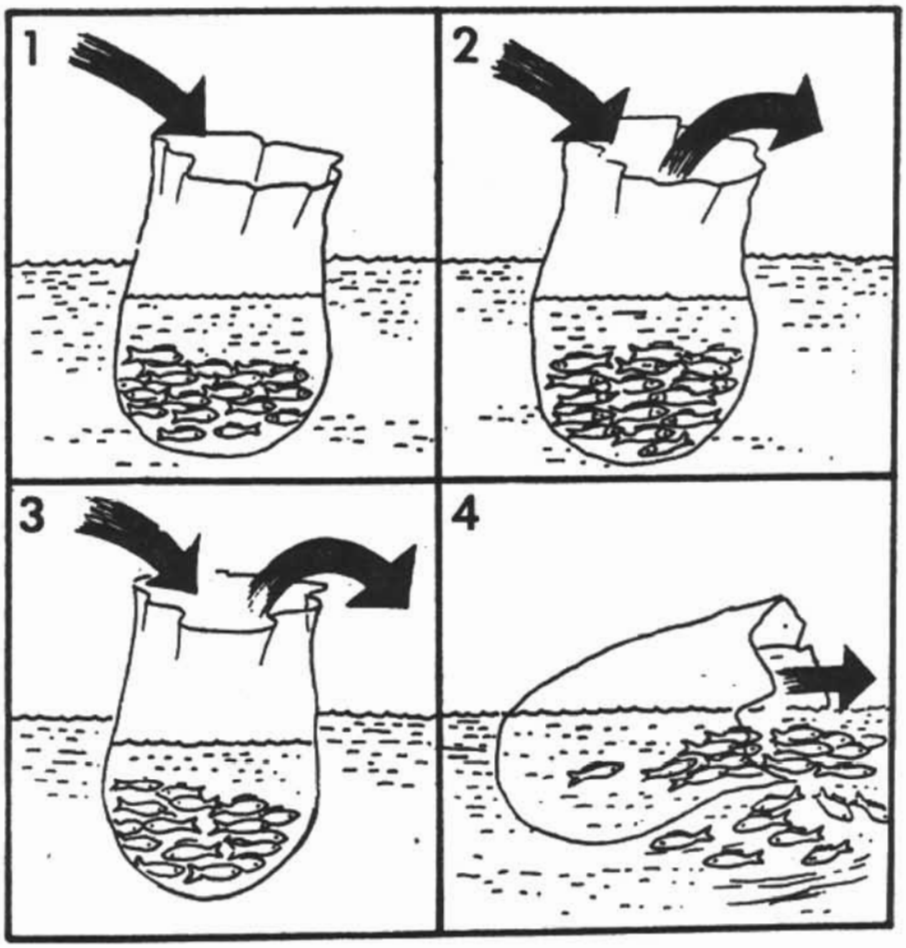

চিত্র ঃ পরিবহনকৃত পোনা বেশকিছু সময় যাবৎ পুকুরের পানিতে খাপ খাইয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ার কৌশল

সতর্কতা:

১। যাতায়াতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পোনার বাক্স সব সময় ছায়া এবং নিরাপদ স্থানে থাকে। কোনোভাবে যাতে ব্যাগ ছিদ্র না হয় বা ফেটে না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বাক্স বা চটের থলে থেকে ব্যাগটি খুলে পুকুরের পানিতে মিনিট পাঁচেক ফেলে রেখে ব্যাগের মুখ খুলে ফেলতে হবে।

৩। ব্যাগের মুখ খোলার সময় অতি সর্তকতার সহিত ধীরে ধীরে খুলে ফেলতে হবে। কারণ অক্সিজেনের চাপ ধীরে ধীরে না কমিয়ে হঠাৎ করে মুখ খুলে ফেললে পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য পোনার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২০২০

রেণু বাজারজাতকরণ

মানুষের চাহিদা ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত সকল মানবীয় কার্যক্রমকে বাজারজাতকরণ বলা হয়। যেকোনো ব্যবসার সফলতা উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণের উপর নির্ভরশীল। যথাযথ বাজারজাতকরণের জন্য বাজারে অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার, বাজার প্রসার ও বাজার পণ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসরণ করা আবশ্যক। উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত না হলে আর্থিক লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হ্যাচারি স্থাপন ও মৎস্য প্রজনন বেশ ব্যয়বহুল কার্যক্রম। এ ধরনের বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত লাভবান হওয়ার জন্য স্থান নির্বাচন, জরিপের মাধ্যমে পোনার চাহিদা নির্ধারণ, মৎস্যচাষি সুযোগ ও মৎস্যচাষির আগ্রহ অন্যান্য মৎস্য খামারের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। সম্ভাব্য স্থানসমূহে জরীপের মাধ্যমে উৎসাহী ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে যারা স্থানীয়ভাবে রেণু পালন ও নার্সারি ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করবে। প্রয়োজনে কিছু কিছু উদ্যোক্তাকে ধারে বা কিস্তিতে রেণু সরবরাহ করা যেতে পারে। সঠিক বিক্রয়মূল্য উচ্চ বা ভালো গুণসম্পন্ন পোনা বিভিন্ন ধরনের পোনার সরবরাহ ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে অন্যান্য উৎপাদনকারী থেকে আলাদা বা ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে। মৎস্যচাষ বা মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের সময় এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য চাষের সাথের সম্পৃক্ত এনজিওগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে রেণু বা পোনার বাজার বিস্তৃত করা যায়।

রেণুপোনার রোগ :

সাধারণভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অণুজীব সংক্রমিত রোগের চেয়ে পরজীবীঘটিত রোগের সংক্রমণ অধিক পরিলক্ষিত হয়। পরজীবী সংক্রমণের তীব্রতার মাত্রা এবং পরজীবীঘটিত রোগের কারণে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ জলাশয়ভেদে খুবই কম-বেশি হয়ে থাকে। জলজ পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত জৈবপদার্থের উপস্থিতি এবং অধিক তাপমাত্রায় জৈব পদার্থের পচন পরজীবীঘটিত রোগের প্রধান কারণ।

হ্যাচারি পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রেণুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা করা। প্রজেননের অন্যান্য ধাপগুলো যথেষ্ট দক্ষতার সংগে সম্পন্ন করে যদি রেণুর স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগ না দেওয়া হয়। তাহলে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে সব রেণু মারা যতে পারে। আর রেণু মারা যাওয়ার অর্থ হলো হ্যাচারির সামগ্রিক ব্যর্থতা।

রেণুপোনার রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার :

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় আমিষ চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, রোগের প্রাদুর্ভাব ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রাচুর্য আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষি কাজে ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহার এবং অন্যান্য কারণে জলজ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে।

পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি আধা নিবিড় মাছ চাষাবাদের ফলেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা অনেক সময় সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাছের রোগবালাই দেখা দিচ্ছে। মাছের রোগবালাই বাংলাদেশে নিবিড় বা আধা নিবিড় মৎস্য প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নে অন্যতম অন্তরায়। রোগবালাইয়ের ফলে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং বাজারে রোগাক্রান্ত মাছের চাহিদা ও মূল্য কমে যায়। তাই রোগবালাই থেকে মাছ, পোনাকে রক্ষা করে উৎপাদন বাড়াতে হলে রোগের কারণ, লক্ষণ, রোগ প্রতিষেধক এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় :

'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়' এই ভিত্তিতেই রেণুপোনার রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি রোগ প্রতিরোধ। রেণুপোনাতে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। পানিতে বসবাস করে বিধায় মাছের বিভিন্ন কার্যাবলি ও আচরণ পর্যবেক্ষণ কষ্টসাধ্য। এ কারণে নির্ভুলভাবে মাছের রোগ নিরূপণ করা এবং রোগ সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিকতর কষ্টসাধ্য।

আবার অনেক রোগই মাছকে খাদ্য প্রদানের পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে মুখে ওষুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ততটা কার্যকরি হয় না। অন্যদিকে রোগাক্রান্ত মাছকে জীবাণুমুক্ত **(disinfect)** করার জন্য কোনো দ্রবণে ডুবানো বা গোসল করানোর পদ্ধতি বড় খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব হয় না। এসব বিবেচনায় সুষ্ঠুভাবে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম।

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং সফলভাবে রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ :

i. জলজ পরিবেশের গুণাবলি যথাযথ মাত্রায় সংরক্ষণ।

ii. দূষণ নিয়ন্ত্রণ

iii. জলাশয়ের স্থান নির্বাচন

iv. সুষ্ঠু মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

v.নিয়মিত মনিটরিং এবং

vi. জলজ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

নিচে মাছের রোগ প্রতিরোধের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ (Controlling Water Quality)

জলজ পরিবেশের বিভিন্ন গুণাবলি, যেমন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, পি.এইচ, তাপমাত্রা, অ্যামোনিয়া, মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি মাছের জীবনযাত্রায় নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা রাখে। এসব গুণাবলি কাঙ্ক্ষিত মাত্রার না হলে মাছ পরিবেশগত পীড়নের শিকার হয় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। পানির বিভিন্ন ভৌত রাসায়নিক গুণাবলির মাত্রা অনুকূল সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে

মাছকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। পানির বিভিন্ন গুণাবলির অনুকূল মাত্রায় রেণুপোনা সুষম হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মাছের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মজুদ ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য প্রয়োগ (Rearing Management & Feeding)

রেণুপোনার রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পুকুরে ভালো পরিবেশ বজায় রাখতে হয়। সঠিক সংখ্যায় রেণুপোনা মজুদকরণ, নমুনায়নের সময় যত্নের সাথে মাছ নাড়াচাড়া করা এবং সতর্কতার সাথে পরিবহন রেণুপোনার রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অধিক উৎপাদনের জন্য রেণুপোনা মজুদের পর পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণে রেণুপোনার পূর্ণ পুষ্টিসাধন হয় না। পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনের লক্ষ্যে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। সুষম খাদ্য গ্রহণে রেণুপোনা সুস্থ-সবল থাকে এবং এতে রেণুপোনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ করা যায়। অতিরিক্ত খাদ্য বা সার প্রয়োগে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাছে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং সঠিক সংখ্যায় রেণুপোনা মজুদ, পরিমিত সার প্রয়োগ ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করে রেণুপোনার বিভিন্ন রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

পুকুর জীবাণুমুক্তকরণ (Pond Disinfection)

পুকুর শুকনো এবং পুকুরে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুর জীবাণুমুক্ত করে সফলভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। পুকুর জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে মাঘ-ফাল্গুন মাসে পুকুর শুকিয়ে ফেলে তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এরপর তলায় চাষ দিয়ে রোদ্রে কয়েকদিন শুকাতে হবে। সূর্যালোকে সর্বাপেক্ষা উত্তম। শুকনা পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে তলার মাটি জীবাণুমুক্ত হয়। অতঃপর উক্ত পুকুরে যথানিয়মে মাছ চাষ করা হলে সাধারণত কোনো রোগ-বালাই দেখা দেয় না। চুন প্রয়োগের মাত্রা মাটির পি.এইচ-এর ওপর ভিত্তি করে কম-বেশি হতে পারে।

মজুদ পুকুরে পোনামাছ ছাড়ায় ৪-৫ দিন পূর্বে নার্সারি বা চারা পোনার পুকুরে ০.২৫ পিপিএম হারে ম্যালথিয়ন/সুমিথিয়ন প্রয়োগ করে চাষকৃত মাছের পরজীবীঘটিত রোগ প্রতিরোগ করা যায়। এছাড়াও পোনা মজুদের সময় পুকুর প্রস্তুতকালে একবার এবং কার্তিক মাসে একবার প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে মাছের জীবাণুঘটিত (pathogenic) প্রায় সব রোগই প্রতিরোধ করা যায়।

উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ (disinfection of appliances)

মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- রেণুপোনা পরিবহন পাত্র, খাদ্য প্রদানের পাত্র, জাল বা রেণুপোনা ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম রোগজীবাণু ও পরজীবীর বাহক হিসেবে কাজ করে। এসব উপকরণ এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ৪০-৫০ পিপিএম মাত্রার ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে এসব উপকরণ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। অতঃপর শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথকভাবে লালন-পালন (Separation of year-class fish populations)

অনেক সময় প্রজননক্ষম এবং বয়স্ক মাছ অনেক রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু এসব মাছ রোগাক্রান্ত হয় না। পূর্বে মাছ ঐসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে দেহে উক্ত রোগের স্বাভাবিক প্রতিরোধক ব্যবস্থা (Immune System) গড়ে ওঠে। ফলে মাছ উক্ত রোগজীবাণুর উত্তরজীবী (Survivor) -তে পরিণত হয়। কিন্তু ঐসব রোগ জীবাণু অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মাছ বা ভিন্ন বয়স গ্রুপের মাছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বয়স গ্রুপের মাছকে আলাদা ভাবে পালন করে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

মরা বা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু রেণু অপসারণ (Removal of Dead/moriYund Fish)

এক পোষক হতে অন্য পোষকে গমন বা স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগজীবাণুর সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। রোগাক্রান্ত মরা বা মুমূর্ষু রেণু রোগজীবাণু দ্রুত বংশ বিস্তার করে। তাই মরা ও মুমূর্ষু রেণু পুকুর/হ্যাচিং জার / ইনকুবেশন ট্যাংকে থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব অপসারণ করে রোগ সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করা যায়।

রাসায়নিক প্রতিরোধ (Chemoprophylaxis)

মাছকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য খাইয়ে, রাসায়নিক দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে রেখে বা পুকুরে প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য নির্দিষ্ট রোগজীবাণু মেরে ফেলে বা পানির গুণাবলির উন্নয়ন করে রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রোগ এবং রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মাছের রোগ প্রতিরোধে প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২-৩% হারে সাধারণ লবণ দ্রবণ ব্যবহার করে অল্প ব্যয়ে এবং সহজেই বিভিন্ন ধরনের পরজীবী ও অণুজীব সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়। মাঝে মাঝে ২-৩ পিপিএম হারে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো যায় এবং এতে মাছের রোগ প্রতিরোধ হয়। নমুনায়ন বা অন্য কোনো কারণে ধরা মাছ ৫০০-১০০০ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে কয়েক সেকেন্ড ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়া হলে মাছের সাধারণ রোগ-বালাই প্রতিরোধ হয়।

পুকুরে পোনার মড়ক

রেণুপোনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে নার্সারি কার্যক্রম অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হতে পারে। বড় মাছের চাষের চেয়ে পোনা মাছের চাষ অধিক লাভজনক। রেণু থেকে ধানী পোনা উৎপাদনে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত রেণু টিকে যেতে পারে। আবার ধানী পোনা থেকে চারা পোনা উৎপাদনে শতকরা ৯৪ ভাগ ধানী পোনা বেঁচে থাকতে পারে। এতদসত্ত্বেও ব্যবস্থাপনার ফাঁকফোকর দিয়ে এমন কিছু ঘটনা চাষির অগোচরে ঘটে যেতে পারে, যার ফলে পোনার মড়ক হতে পারে বা পুকুরের উৎপাদন কম হতে পারে। এখানে রেণুপোনা উৎপাদনের পুকুরে মড়কের সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

ক. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ

রেণুপোনা চাষের পুকুর শুকানো হলেও বিভিন্নভাবে কিছু কিছু রাক্ষুসে মাছ যেমন শোল, টাকি, শিং, মাগুর প্রভৃতি মাছ কাদার মধ্যে বা গর্তে লুকিয়ে থেকে যেতে পারে। অনেক সময় বৃষ্টির পানি উপচে বাইরে থেকে অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে ঢুকে যেতে পারে। ফলে রেণুপোনার পুকুরে চান্দা, পুঁটি, ছোট চিংড়ি প্রভৃতি মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে যেতে পারে। এরকম রাক্ষুসে ও বাজে মাছের কারণে পোনার উপোদন ৫০-৯০% পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

প্রতিকারের উপায়

একবার রেণু মজুদের পর রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের উপদ্রব দেখা গেলে রেণু মজুদ অবস্থায় প্রতিকারের সুযোগ খুব কম। তবে সত্বর পুকুর যথাযথভাবে পুনঃপ্রস্তুত করে দ্বিতীয় বার রেণু মজুদ করতে হবে। তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে কোনোভাবে এদের প্রাদুর্ভাব না ঘটে। সম্ভাব্য উৎস যেমন বৃষ্টির পানি উপচে আসা, পাখি বা জাল প্রভৃতি হতে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় পাখির মুখ থেকে বা মাছ ধরা জাল হতে জীবিত অবস্থায় রাক্ষুসে অথবা অবাঞ্ছিত মাছ দুই-একটা পুকুরে চলে আসতে পারে। পুকুর পুনঃপ্রস্তুতির সময় পাড়ে কোনো গর্তে টাকি মাছ বা শিং মাছ লুকিয়ে থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. শামুক ও ঝিনুকের প্রাদুর্ভাব

অনেক সময় পোনা চাষের পুকুর শুকানোর পরও শামুক ও ঝিনুক জন্মাতে পারে। সাধারণাত প্রস্তুতির সময় যেসব পুকুর ভালোভাবে শুকানো না হয় এমন পুকুরে এ সমস্যা দেখা দেয়। শামুক ও ঝিনুক অধিক সংখ্যায় জন্মালে পুকুর পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যেতে পারে। ফলে পোনার উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিকারের উপায়

পুকুরের রেণুপোনা মজুদ অবস্থায় কোনো ঔষধ দিয়ে শামুক, ঝিনুক মারা যাবে না। তবে হাত দিয়ে বেছে ফেলে এদের সংখ্যা কমানো যেতে পারে। পুকুরের মধ্যে নারিকেল বা খেজুরের পাতা ফেলে রাখলে শামুক এসব পাতায় লেগে থাকে। কয়েকদিন পর পর আস্তে করে এসব পাতা উপরে উঠিয়ে শামুক মারা যেতে পারে। তবে বেশি সমস্যা হলে পানি কমিয়ে তামাক পাতার গুঁড়া প্রয়োগ করে সমুদয় শামুক-ঝিনুক ধ্বংস করা যায়। ব্ল্যাক কার্প মাছ ছেড়ে প্রাকৃতিক ভাবে বা জৈবিকভাবে শামুকের প্রাদুর্ভাব কমানো যেতে পারে কারণ ব্ল্যাক কার্প মাছের প্রধান খাদ্য শামুক।

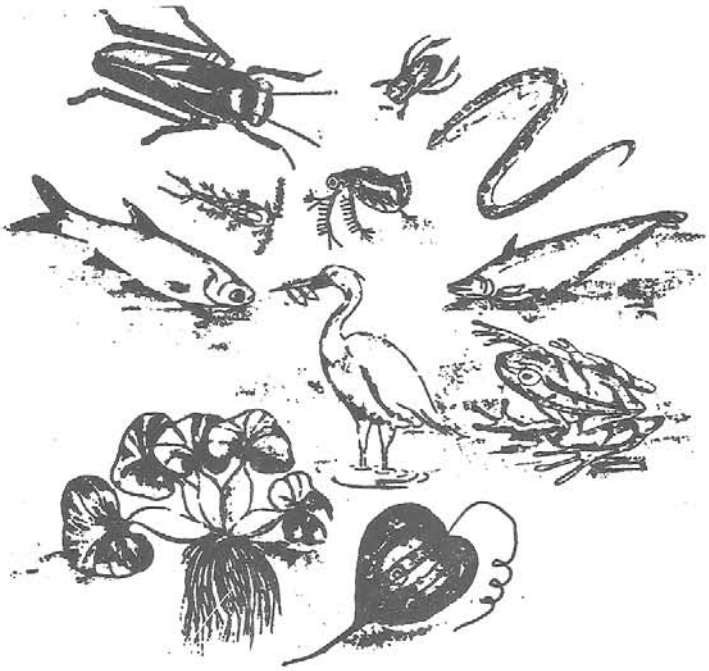

চিত্র ঃ পোনা চাষের পুকুরে ক্ষতিকর জীবকুল

গ. সাপ, ব্যাঙ ও শুই সাপের উপদ্রব

অনেক সময় পোনার পুকুরে সাপ ও ব্যাঙের উপদ্রব দেখা যায়। একটা ছোট ব্যাঙ দৈনিক ১০০-২০০টি রেণু খেয়ে ফেলতে পারে। রেণু একটু বড় হলে ধোড়া সাপ ও শুই সাপে খেতে শুরু করে। এদের উপদ্রবে ৫০-৯০% পর্যন্ত উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকারের উপায়

এসব প্রাণী কোনো ঔষধ দিয়ে মারা কঠিন। পোনার পুকুরে বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ যেমন চাই, চারো প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কায়িক শ্রমের দ্বারা এসব প্রাণী দূর করা ভালো। ছাতির শিক বা লোহার তৈরি কোঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে সহজেই সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি মারা যায়। প্রতিরোধের জন্য বৃষ্টি পর পর ব্যাঙ যাতে পুকুরের অগভীর অংশে জন্মানো ঘাসের মধ্যে ডিম না দিতে পারে সেজন্য ঘাস পরিষ্কার করে ফেলা। খুঁজে খুঁজে ব্যাঙের ডিম বাঁশের চালনি দিয়ে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা।

ঘ. ক্ষতিকর পোকার বিকাশ

রেণুপোনা ছাড়ার পর কিছু কিছু পোকা মাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যদিও আগে এদের দমনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এসব পোকামাকড় রেণুপোনার খাদ্য খেয়ে ফেলে কোনো কোনোটি রেণুকে ধরে খেয়ে ফেলে। বিশেষ করে হাঁস পোকার ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকা অতি জরুরি।

প্রতিকারের উপায় :

কাপড় কাচার সাবান ও সরিষা বা নারিকেল তৈল একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়। এক ভাগ সাবান ও তিন ভাগ তেল অল্প গরম পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হবে। এই মিশ্রণ পুকুরের পানির সাথে মিশিয়ে সারা পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এই মিশ্রণ পানির উপর একটা সরের মতো আস্তরণ তৈরি করে। ফলে পোকাগুলো যখন শ্বাস নিতে পানির উপর আসে তখন এই তেলের মিশ্রণ তাদের শ্বাস নালিতে ঢুকে যায় এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। শতাংশ প্রতি ৭২ গ্রাম সাবান এবং ২১০ গ্রাম তেলের মিশ্রণ প্রয়োজন।

ঙ. পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস

পুকুরে জৈব সার ও খাদ্য প্রয়োগের ফলে অনেক সময় পুকুরের তলদেশে কাদার মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। সাধারণত পুরাতন পুকুরে গ্যাসের সমস্যা বেশি হয়। তলায় গ্যাস সৃষ্টি হলে পোনা মারা যেতে পারে।

প্রতিকারের উপায় :

পোনার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রেখে প্রতিদিন হররা টেনে দিতে হবে। ২/৩ দিন দিক পরিবর্তন করে করে হররা টানলে তলার কাদা মোটামোটি ওলট-পালট হয়ে যাবে এবং গ্যাস কমে যাবে। এ পর্যায়ে আবার সার ও খাদ্য প্রয়োগ আরম্ভ করতে হবে।

চ. বিভিন্ন বয়স ও আকারের পোনা

একই সাথে বিভিন্ন বয়স ও আকারের পোনা মজুদ করলে পুকুরে খাদ্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। ফলে বড় পোনাগুলোর সব খাদ্য খেয়ে ফেলে আর ছোটগুলো না খেতে দুর্বল হয়ে যায়। ফলে মড়ক বেশি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সব সময় একই বয়স ও আকারের রেণু বা ধানী চাষের পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করা।

ছ. প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব বা অতিরিক্ত উৎপাদন

পোনা চাষের পুকুরে পরিমিত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য বাঞ্ছনীয় যদি খাদ্য ঘাটতি হয় অর্থাৎ সেকিডিস্ক গভীরতা ৩০ সে. মি. এর বেশি হয় তাহলে পোনার বৃদ্ধি কমে যায়। এ ঘাটতি বেশি ও স্থায়ী হলে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরের প্রাকৃতিক খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে পানির রঙ ঘন সবুজ দেখায়। তখন সেকিডিস্ক গভীরতা ২০ সে.মি. এর নিচে নেমে আসে। এ অবস্থায় রাতের বেলায় পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে এবং ব্যাপকভাবে পোনার মড়ক দেখা দিতে পারে।

প্রতিকারের উপায় :

প্রাকৃতিক খাদ্য ঘাটতির সময় নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। অত্যধিক প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয়ে গেলে পুকুরের সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। সম্ভব হলে পুকুরে কিছু নতুন পানি দিতে পারলে ভালো হয়।

জ. কম গভীর পুকুরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি

পোনা চাষের পুকুর সাধারণত অগভীর হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বেশি অগভীর হয় এবং গরমের সময় পানি উত্তপ্ত হয়ে যায় তাহলে ব্যাপকভাবে পোনা মারা যেতে পারে। কারণ রেণু পোনা খুব বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না।

প্রতিকারের উপায় :

সম্ভব হলে পুকুরে নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে। পুকুরের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হলে পুকুরে রোগের সময় পোনা ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। নারিকেল পাতা দিয়ে মাচা তৈরি করে ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়। ছোট ছোট কচুরিপানা বা টোপাপানা কঞ্চি দিয়ে বেড়ার মতো দিয়ে মাঝখানে গোল একটা জায়গায় আটকে রাখে ছায়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে এরকম ছায়ার ব্যবস্থা পুকুরের মোট আয়তনের ১০% জায়গার বেশি হবে না।

সদ্য জন্মলাভ করা রেণু খুবই স্পর্শকাতর হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই কোনো কারণে যেন এদের অসুখ বিসুখ না হয় বা কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেদিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। আর একবার কোনো রোগ ব্যাধির আক্রমণ হয়ে গেলে তার কোনো সহজ প্রতিকার সম্ভব হয় না। তাই রেণুপোনার যাতে কোনো রোগ না হতে পারে সেজন্য হ্যাচারিতে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

হ্যাচারিতে রেণুপোনার যেসব রোগ-বালাই সচরাচর দেখা যায় সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পরজীবীঘটিত রোগ :

ক) সাদা দাগ রোগ :

রোগজীবাণু : ইকথায়োপথিরিয়াস মালটিফিলিস (*Ichthyopthirius Multiphilis*) নামের এককোষী পরজীবী এ রোগ ঘটায়।

রোগের বিস্তার : চাষোপযোগী মাছের জন্য খুবই অনিষ্টকারী রোগ। দেশি কার্পজাতীয় মাছে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। চীনা কার্পেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হয়। স্বাদু ও আধা লোনা পানির পুকুরে সাদা দাগ রোগ পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের সংক্রমণ ও তীব্রতার মাত্রা ২৫°-২৬° সে. তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায় গ্রীষ্মকাল ও বসন্তকালে সাদা দাগ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুকুরে অতিরিক্ত সংখ্যায় মাছ মজুদ এ রোগের একটি অন্যতম সহায়ক কারণ।

রোগের লক্ষণ

i. মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোয় বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ফোটা দেখা যায়।

ii. রোগের তীব্রতা খুব বেশি হলে মাছের ত্বক সাদা ঝিল্লিতে ঢাকা পড়ে যায়।

iii. মাছের গায়ের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায় ও স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায়।

iv. পরজীবী সংক্রমণের শুরুতে মাছ পানিতে লাফালাফি শুরু করে এবং কোনো কিছুতে গা ঘষতে থাকে।

v. আক্রান্ত মাছের পাখনা মুড়িয়ে যায়।

vi. মাছ অলসভাবে চলাফেরা করে, খাদ্য গ্রহণ করতে অনীহা দেখায়।
vii. আক্রান্ত মাছ বহিঃপ্রণোদনে (External Stimuli) ধীরগতিতে বা দেরিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়।
viii. পানির উপরিভাগে দীর্ঘ সময় ধরে ভেসে থাকে।

খ) ট্রাইকোডাইনিয়াসিস

এটি এককোষী পরজীবীঘটিত রোগ।

রোগজীবাণু : ট্রাইকোডিনা গন এর কয়েকটি প্রজাতির পরজীবীর সংক্রমণে এ রোগ দেখা দেয়। যথা ট্রাইকোডিনা ডুমারগুই *(Trichodina domerguei)*, ট্রাইকোডিনা পেডিকুলাস *(T. pediculus)*, ট্রাইকোডিনা নিগ্রা *(T.nigra)* ইত্যাদি। ট্রাইকোডিনা প্রধানত মাছের ফুলকাকে আক্রান্ত করে।

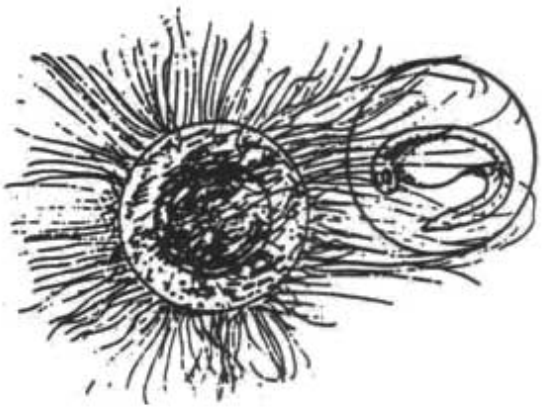

(খ) ছত্রাক আক্রান্ত ভ্রূণ

রোগের বিস্তার :

ধানী পোনা ও আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। রুই জাতীয় মাছের পোনা, বিশেষ করে গ্রাসকার্পের পোনা এ রোগের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। আক্রান্ত মাছের স্পর্শে এবং পানির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। প্রাপ্তবয়স্ক মাছ এ রোগের বাহক। মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। অপেক্ষাকৃত ছোট ও অগভীর জলাশয়ে এবং পানির গুণাগুণ খারাপ হলে এ রোগের দ্রুত সংক্রমণ ঘটে থাকে। নার্সারি পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত পোনা মজুদ এ রোগের একটি সহায়ক কারণ। এ রোগে পোনা মাছের ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণ

i. পোনা মাছের শরীর অধিক উজ্জ্বল (mucus) দেখা দেয়।

ii. আক্রান্ত মাছের ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়।

iii. পোনামাছ খাদ্য গ্রহণের অনীহা দেখায়।

iv. ফুলকারশ্মিতে (gill filament) পচন ধরে এবং ফুলকা শলাকা (gill racker) বের হয়ে যায়।

v. মাছের ফুলকা এবং দেহের বিভিন্ন অংশে গোলাকার হলদে দাগ দেখা দেয়।

vi. মাছ দ্রুত ও অবিশ্রান্তভাবে চলাফেরা করতে থাকে।

vii. আক্রান্ত পোনা মাছ দ্রুত মারা যায়।

পরজীবীঘটিত রোগের প্রতিকার :

এ রোগগুলো এককোষী পরজীবী দ্বারা হয়। কার্প জাতীয় এবং ক্যাটফিশ (মাগুর, পাঙ্গাশ) মাছে ও এদের আক্রমণ হতে পারে। এগুলো মাছের ত্বক, লেজ, পাখা ও ফুলকায় আক্রমণ করে। আক্রান্ত মাছকে আলাদা পাত্রে ৫০ পি. পি. এম ফরমালিন, অথবা ১.০ পি.পি. এম. তুঁতে (Copper Sulphate) বা ২.৫% লবণ দ্রবণে যতক্ষণ মাছ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ গোসল করাতে হবে। এরপর পরিষ্কার পানিতে কিছুক্ষণ চুবানোর পর মজুদ পুকুরে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে পড়লে সপ্তাহে ২০-২৫ পি.পি.এম হারে পুকুরে ফরমালিন প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ভালো ফল পাওয়ার আশা করা যায়। এ ছাড়া ৩-১০ পি.পি.এম অ্যাক্রিফ্লাভিন এর মধ্যে আক্রান্ত মাছকে দীর্ঘক্ষণ গোসল করালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ছত্রাকজনিত রোগ

মিঠাপানির প্রায় সব মাছই ছত্রাকজাতীয় রোগের প্রতি সংবেদনশীল। মোল্ডজাতীয় ছত্রাক এ ধরনের রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে তাকে। ছত্রাক মাছের রোগ সৃষ্টিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবীর আক্রমণে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয়। উক্ত ক্ষতস্থানে ছত্রাকের সংক্রমণে রোগ সৃষ্টি হয়। রেণুর জন্য এই রোগ খুবই সংবেদনশীল। হ্যাচারি বা আঁতুড় পুকুরে হঠাৎ করে মোড়ক আকারে এই রোগ সব রেণু ধ্বংস করে দিতে পারে।

স্যাপরোলেগনিয়াসিস

এই রোগ সাধারণভাবে তন্তুরোগ নামে পরিচিত।

রোগজীবাণু : এই রোগ প্রধানত স্যাপরোলেগনিয়া গনের তিনটি প্রজাতির সংক্রমণে ঘটে থাকে প্রজাতিগুলো হলো- সেপরোলেগনিয়া ফেরাক্স *(Saprolegnia ferax)*. সেপরোলেগনিয়া প্যারাসাইটিকা *(Saprolegnia parasitica)* এবং সেপরোলেগনিয়া ডিকলিনা *(Seprolegnia diclina)* একাইয়া *(Achyia)* গনের কয়েকটি প্রজাতির সংক্রমণেও এ রোগ ঘটে থাকে।

রোগের বিস্তার : কার্পজাতীয় মাছের সব প্রজাতির ক্ষেত্রেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মাছের ডিম এবং রেণুর একটি একটি প্রধান রোগ। আক্রান্ত মাছ বা ডিমে উজ্জ্বল সাদা আঁশ বা তন্তুজাতীয় মোলায়েম বস্তুর উদ্ভব হয়। এসব তন্তু বা আঁশ ৩ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পরিবেশগত পীড়নে অথবা ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবীর সংক্রমণে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

পোনামাছ ছাড়া, মাছ ধরা বা নমুনায়নের সময় যথেচ্ছাভাবে মাছ নাড়াচাড়া করা, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে মাছ দুর্বল হওয়া এবং অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করা এ রোগের তীব্রতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাছের ডিম বা মৃত মাছের ক্ষেত্রে মোল্ড ১২-২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরো দেহ ঢেকে ফেলে। এ রোগে মাছের পিঠের অংশ ও লেজ, পাখনা, চোখ, ফুলকা আক্রান্ত হয়ে থাকে। সংক্রমণের শুরুতে মাছ তেমন কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করে না। সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মাছে মড়ক দেখা দেয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ। বিশেষ করে হ্যাচিং বোতলে বা ইনকুবিউশন ট্যাংকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ :

i. রেণুপোনার দেহে বা ডিমে মিহি সুতার মতো উজ্জ্বল বস্তু দেখা দেয়।
ii. রেণুপোনার দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের উপস্থিতি দেখা দেয়।
iii. পোনা অস্থিরভাবে চলাফেরা করে এবং শক্ত কিছুতে গা ঘষে।
iv. সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে রেণুপোনা ক্ষুধা হ্রাস পায়।
v. রেণুপোনা ধীরে ধীরে ও অলসভাবে চলাফেরা করে।
vi. রেণুপোনার আক্রান্ত অংশে পঁচন ধরে।
vii. রেণুপোনার ব্যাপকহারে মড়ক দেখা দেয়।

ছত্রাকজনিত রোগের প্রতিকার

আমাদের দেশের মিঠা পানির প্রায় সকল মাছই ছত্রাক রোগে সংবেদনশীল। বিশেষ করে ত্বক ও ফুলকাতে আঘাতজনিত কারণে সহজেই ছত্রাক আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। ত্বকের রোগকে ডারমাটোমাইকোসিস *(Dermatomycosis)* ফুলকায় হলে ফুলকা পচা রোগ যথাক্রমে স্যাপ্রোলেগনিয়াসিস এবং ব্র্যংকিওমাইকোসিস হিসেবে পরিচিত। যা হোক ত্বক বা ফুলকায় ছত্রাক জাতীয় রোগ হলে সাধারণত 'ম্যালাকাইট গ্রীন' দ্বারা চিকিৎসা ফলদায়ক। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে হ্যাচারিতে ডিম বা পোনার আক্রমণে 'মিথিলীন ব্লু' ব্যবহার করা হয়। আবার অল্প সংখ্যক মাছের ক্ষেত্রে লবণ দ্রবণে চিকিৎসা করা যায়। এদের প্রয়োগ মাত্রা নিম্নে দেওয়া হলো।

ম্যালাকাইট গ্রীন : ০.১৫-০.২০ পি.পি.এম পুকুরে প্রয়োগ প্রতি সপ্তাহে একবার দু থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত চালালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মিথিলিন ব্লু : ০.১০-০.১৫ পি.পি.এম দ্বারা আক্রান্ত পোনা বা ডিম ধোত করালে, বা দ্রবণে ১-২ ঘণ্টা গোসল করালে প্রতিকার পাওয়া যায়।

লবণ দ্রবণ : ২.০-২.৫ শতাংশ লবণে আক্রান্ত মাছকে যতক্ষণ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্রান্ত মাছকে ০.৫ পি.পি.এম তুঁতে দ্রবণে চুবানোর জন্য উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে তুঁতে খুব বিষাক্ত এবং ক্ষতিকর তাই যতদূর সম্ভব তুঁতে দ্বারা চিকিৎসা না করানো ভালো।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় নার্সারি পরিচালনা, চারা পুকুরে পোনা পালন এবং মজুদ পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। মাছ চাষিদের কাছে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যথাসময়ে ব্যাকটেরিয়াজনিত সমস্যা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ পুকুরে চাষকৃত মাছ পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে পারে। মাছ চাষে ব্যাকটেরিয়াজনিত বহু রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। ব্যাকটেরিয়াজনিত মাছকে প্রাথমিক জীবাণু হিসেবে অথবা মাছের কোনো ক্ষত বা ঘায়ের মাধ্যমিক সংক্রামক হিসেবে রোগাক্রান্ত করে থাকে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত ফুলকা পচা রোগ (Bacterial gill disease)

রোগজীবাণু : মিক্সোকক্কাস পিসিকলাস *(Mixococcus piscicolus)* নামের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের এ রোগ দেখা দেয়।

রোগের বিস্তার : গ্রাসকার্প এবং কমন কার্পের পোনা ও আঙ্গুলে পোনায় এ রোগ বেশি দেখা দেয়। এরোগে আক্রান্ত মাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং বাঁচার হার (survival rate) হ্রাস পায়। দেকি কার্পজাতীয় মাছেও এ রোগ দেখা যায়। গ্রাস কার্পের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ। সাধারণত ২৮°-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াসের নিচে গেলে এ রোগ সাধারণত হয় না এবং তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াসে উঠলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। জলজ পরিবেশের অবনতিশীল অবস্থা, যথা- তলদেশে ক্ষতিকর জৈব পদার্থ জমা হওয়া এবং মাছের অধিক ঘনত্ব এ রোগের সহায়ক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ রোগ বছরব্যাপী হয়ে থাকে। এ রোগে ব্যাকটেরিয়া মাছের ফুলকাকে আক্রান্ত করে। এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং খুবই দ্রুত ছড়ায়।

i. রোগের লক্ষণ

ii. মাছের দেহ, বিশেষ করে মাথা কালচে বর্ণ ধারণ করে।

iii. মাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

iv. মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং মাছ এবড়ো-থেবড়ো চলাফেরা করে।

v. মাছের ফুলকারশ্মি কাদা ও অধিক পিচ্ছিল পদার্থে আবৃত থাকে।

vi. মাছের ফুলকা ফুলে যায়, ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে ও পচে যায়।

vii. মারাত্মক অবস্থায় মাছের কানকো পচে যায় এবং কানকো স্বচ্ছ দেখায়।

viii. আক্রান্ত মাছের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিদিন মারা যেতে পারে।

ব্যাকটেরিয়াল রোগের প্রতিকার

Pseudomonas fluorescens, Aeromonas hydrophila এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত মাছের রক্ত ক্ষরণসহ নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর মধ্যে ড্রপসি (পেটফুলা) রোগও হতে পারে। এ সকল রোগ হলে বা রক্ত সংক্রমিত হলে সাধারণত এন্টিবায়োটিকের চিকিৎসা ছাড়া আর উপায় থাকে না। তখন উপরিউল্লিখিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে 'অক্সোলিনিক এসিড' (Oxolinic Acid) প্রতিদিন ৩ মি. গ্রাম হারে প্রতি কেজি মাছে খাবারের মাধ্যমে ৫ দিন পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে। আবার গোসলের জন্য ১-২ পি.পি.এম এই ঔষধ দ্রবণে ১ দিন পর্যন্ত আক্রান্ত মাছকে রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া পুকুরের পানিতে অক্সিজেন কম থাকার কারণে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হলে ২-৫ পি.পি.এম পটাশ (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$) প্রয়োগ করলে কিছু ফল পাওয়া যায়। অল্প সংখ্যক মাছ হলে ১৫-২০ পি.পি.এম পটাশ দ্রবণে এক ঘণ্টা পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে। বর্তমানে তুঁতে (কপার সালফেট, $CuSO_4, 5H_2O$) খুব বিষাক্ত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় সাধারণত এর প্রয়োগ পুকুরে একেবারে অনুচিত। তবে অল্প সংখ্যক আক্রান্ত মাছকে আলাদা করে ০.৫-২ পি.পি. এম তুঁতে দ্রবণে ৩০ মিনিট সময় পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে।

জেনেটিক রোগ

আজকাল অধিকাংশ হ্যাচারিতে মৎস্য প্রজননের পর উৎপন্ন রেণু পোনায় দৈহিক বিকৃতি বা বিকলাঙ্গতা দেখা যায়। ডিম ফুটে বের হবার পর থেকে ব্যাপক হারে রেণু মারা যায়। ব্রুড মাছ বাছাই এ ঋণাত্মক নির্বাচন, নিকট আত্মীয় পুরুষ ও স্ত্রী মাছের মধ্যে প্রজনন এবং অপরিকল্পিত সংকরায়ণের জন্য উৎপন্ন রেণু পোনার মধ্যে এ ধরনের জেনেটিক রোগ দেখা যায়।

প্রতিকারের উপায়ঃ

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রজননের জন্য ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা।
২. দূর-দূরান্তের বিভিন্ন হ্যাচারির মধ্যে ব্রুড মাছ বিনিময় করা এবং প্রজনন কাজে ব্যবহার করা।
৩. ব্রুড মাছ যথেষ্ট বড় ও পরিপক্ব না হলে তাদের দিয়ে প্রজনন করানো থেকে বিরত থাকা।
৪. সরকারি ব্যবস্থায় গড়ে উঠা ব্রুড ব্যাংক হতে প্রজননের জন্য ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা।

পরজীবী, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার পদ্ধতি

মাছের সাদা দাগ রোগ (White spot) ও ট্রাইকোডাইনিয়াসিস (Trichodiniasis), কসটিয়াসিস (Costiasis)

নীলাভ দাগ রোগ

রেণুপোনা সাধারণত এই রোগ দেখা গেছে। পেটের নিচে বা কুসুম থলিতে ঈষৎ নীল বর্ণের দাগ দেখা দিয়ে যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে তাকেই নীলাভ দাগ রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন মাছের নিষিক্ত ডিম থেকে উদ্ভূত লার্ভা এই রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগে লার্ভার দেহে পানি জমা হয়, স্বাভাবিক আকারের পরিবর্তন ঘটে ও কুসুম থলির (Yolk Sac) রং এর পরিবর্তন ঘটে। এই রঙের পরিবর্তন উজ্জ্বল নীল বা বাদামি হতে পারে। কখনও কখনও কুসুম থলিতে সাদা দাগ দেখা যায়। এই রোগে লার্ভার মজুদে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে যদিও এ রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে পানিতে ভারী ধাতুর আয়নের অধিক ঘনত্ব, দ্রবীভূত অ্যামোনিয়ার উচ্চহার ও পরিস্ফুটন ট্রে (Hatching Tray) তে কাঁকরের পরিমাণ হ্রাস পেলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। সুস্থ ও সবল প্রজননক্ষম মাছ ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ কারিগরি জ্ঞানের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে এই রোগের প্রকোপ হ্রাস করা যায়।

ইয়োক স্যাক রোগ (Yolk Sac Disease)

নিষিক্ত ডিম থেকে পরিস্ফুটনের (Hatch out) পর যে লার্ভা বের হয় তার কুসুম থলিতে যে সকল অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় তাকে ইয়োক স্যাক রোগ বলে। মাছের লার্ভা বা রেণু পোনা বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল (Sensitive)। রেণুপোনার আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম (Defence mechanism) নাজুক হবার কারণে এর সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। ইয়োক স্যাক রোগ বা কুসুম থলির রোগ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই রোগে কুসুম থলির স্বাভাবিক রংঙের পরিবর্তন ঘটে বাদামি বর্ণ ধারণ করে ও কখনও কখনও কুসুম থলিতে সাদা দাগ দেখা যায়। এই রোগে নার্সারির লার্ভার মজুদে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ মজুদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অসম্পূর্ণ পরিপক্ব রোগাক্রান্ত মাছ থেকে ডিম সংগ্রহের ফলে এই রোগের প্রকোপ বেশি হচ্ছে, যদিও এই রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে পানিতে ভারী ধাতুর (Heavy metal) আয়রনের অধিক ঘনত্বজনিত দূষণ, দ্রবীভূত অ্যামোনিয়ার উচ্চহার ও হ্যাচারির অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। রেণুপোনাগুলোকে স্থানান্তরের সময় এদের যান্ত্রিক ক্ষত (Mechanical Injury) হতে পারে। নিষিক্ত ডিমগুলো পরিস্ফুটন ট্যাংকে পরিস্ফুটনের সময় বায়ু সঞ্চালন (Aeration) বেশি হলে অনেক সময় কুসুম থলি বা লার্ভার মুখে Gas bubble দেখা দিতে পারে। এই সময় সতর্কতার সাথে বায়ু সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন পারিবেশিক পীড়নের (Environmental Stress) কারণে কুসুম থলির রোগ হতে পারে। সুস্থ, সবল ও পরিপক্ব প্রজননক্ষম মাছের ব্যবহার এই রোগের আশঙ্কা কমাতে পারে। নিষিক্ত ডিমগুলোকে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন মেশানো পানিতে ধৌত করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন দূষণমুক্ত হ্যাচারি পরিবেশ ও যথাযথ কারিগরি জ্ঞানের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে পারে।

প্রশ্নমালা-৫

এক কথায় উত্তর দাও :

১। রেণু পোনা কাকে বলে?

২। ডিম পোনা কাকে বলে?

৩। কুসুম থলি কী?

৪। ডিম পোনায় কতক্ষণ কুসুম থলি থাকে?

৫। রেণু পোনার খাদ্য কয় ধরনের?

৬। রেণুকে খাওয়ানো হয় এমন দুইটি জীবন্ত খাদ্যের নাম লেখ।

৭। আর্টিমিয়া কী?

৮। টিউবিফেক্স কী?

৯। কোন মাছের রেণুকে কলিজা সিদ্ধ খাওয়ানো হয়?

১০। ময়দা গুলিয়ে খাওয়ানো হয় কোন মাছের রেণুকে?

১১। রেণু পোনাকে কীভাবে খইল খাওয়াতে হয়?

১২। আত্মভুক বৈশিষ্ট্য কোন কোন প্রজাতির মাছে দেখা যায়?

১৩। রেণুর ছত্রাকজনিত রোগের একটি লক্ষণ লেখ।

১৪। ছত্রাকজনিত রোগের একটি ওষুধের নাম লেখ।

১৫। ইয়োক স্যাক রোগ কী?

১৬। নীলাভ দাগ রোগ কাকে বলে?

১৭। সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

১৮। হ্যাচারির বিভিন্ন অংশের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

১৯। রেণুর পেট ফোলা রোগ কোন মাছের রেণুতে দেখা যায়?

২০। পেট ফোলা রোগের একটি ঔষধের নাম লেখ।

২১। রেণুর দৈহিক বিকলাঙ্গতা কোন রোগের কারণে হয়?

২২। রেণু পরিবহনের পদ্ধতি কী কী?

২৩। বাঁক কাকে বলে?

২৪। মাটির হাঁড়িতে কত ঘণ্টা রেণু পরিবহন করা হয়?

২৫। আধুনিক পদ্ধতিতে রেণু পরিবহন করার জন্য কী পাত্র ব্যবহার করা হয়?

২৬। রেণুর প্যাকেটে কতটুকু পানি দেওয়া হয়?

২৭। সাধারণত পলিথিন প্যাকেটের কত অংশ অক্সিজেন দিয়ে পূর্ণ করা হয়?

২৮। অক্সিজেন দিয়ে রেণু কত সময় একান্ত নিরাপদে পরিবহন করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) কার্প জাতীয় মাছের রেণুর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি লেখ।

২) ক্যাটফিশ জাতীয় মাছের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি লেখ।

৩) রেণু পরিবহনের আগে কীভাবে টেকসই করা হয়?

৪) পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণগুলো কী কী?

৫) রেণুর ছত্রাকজনিত রোগের প্রতিরোধের উপায় লেখ।

৬) রোগ প্রতিরোধের জন্য কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) রেণুর কী কী রোগ হতে পারে? যে কোনো দুইটি রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের উভয় বর্ণনা কর।

২) রেণু পরিবহনের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩) রেণুর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা কীভাবে বিস্তৃত করা যায়?

৪) রেণুর রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলো বর্ণনা কর।

৫) রেণু মড়কের কারণগুলো বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন কৌশল

অনেক দেশে তেলাপিয়া চাষ জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণ ও গ্রীষ্ম অঞ্চলীয় আবহাওয়ায় এদের প্রায় সব বাণিজ্যিক প্রজাতির ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিপক্বতার ফলে পোনা উৎপাদন একটি প্রধান সমস্যা। এই কারণে চাষকালীন সময়ে এদের অধিক হারে প্রজননের জন্য পোনার ঘনত্ব প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং আহরণযোগ্য মাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কমে যায়। এই সমস্যা উত্তরণের জন্য ১৯৬০ সাল থেকেই এই মাছ চাষে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রজনন বন্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির উন্নয়ন ঘটেছে। এসব পদ্ধতিগুলো হলো পোনা বাছাই করে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ আলাদাকরণ, সংকরায়ণ করে ও হরমোন প্রয়োগ করে পুরুষ পোনা উৎপাদন এবং জেনেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে মনোসেক্স পোনা উৎপাদন। সংকরায়ণ ও জেনেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে তেলাপিয়া সব পুরুষ জাতের পোনা উৎপাদন খুবই কষ্টসাধ্য বিধায় বর্তমানে এন্ড্রোজেন হরমোন প্রয়োগে মনোসেক্স সব পুরুষ জাতের পোনা উৎপাদন খুব সহজ কৌশল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এই পদ্ধতিতে ক্ষুদে পোনাকে প্রথম খাবার গ্রহণের সময় হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ করে পুরুষ পোনায় রূপান্তরিত করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতন ভোক্তারা মনে করেণ যে, হরমোন প্রয়োগে উৎপাদিত পুরুষ তেলাপিয়া মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু অদ্যাবধি এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। ইতিমধ্যে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এন্ড্রোজেন হরমোন প্রয়োগের ১ মাসের মধ্যে মাছের শারীরিক টিস্যুতে হরমোন এর কোনো অস্থিত্ব বিদ্যমান থাকে না (Green and Teichert Codding 2000)। এশিয়ার থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে বাণিজ্যিকভাবে হরমোন প্রয়োগে তেলাপিয়ার মনোসেক্স পোনা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। হরমোন প্রয়োগে মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদন পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

১। এই পদ্ধতি সহজ ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

২। অত্যাধুনিক গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।

৩। সর্বোপরি উৎপাদন খরচ খুব কম।

৪। ৯০-৯৫% মনোসেক্স পুরুষ জাতের তেলাপিয়া উৎপাদন করা যায়।

৫। অধিক উৎপাদন ও বেশি মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়।

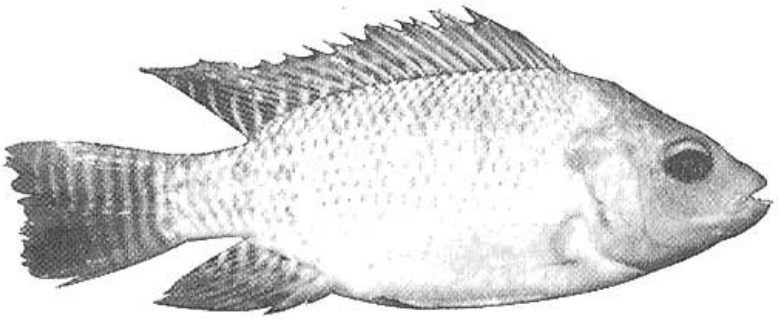

চিত্র : মনোসেক্স তেলাপিয়া

মনোসেক্স তেলাপিয়ার প্রজননের গুরুত্ব :

আমরা জানি তেলাপিয়া মাছ ঘন ঘন বাচ্চা দেয় তাই তাদের Prolific Breeder বলা হয়। অর্থাৎ এরা বছরে একাধিকবার প্রজননে সক্ষম এমনকি একটি পূর্ণ বয়স্ক তেলাপিয়া বছরে তিন বারেরও অধিক প্রজনন করে থাকে ফলে চাষকৃত পুকুরে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটতে থাকে। নিজেদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কারণে এদের বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার বাচ্চা দেওয়ার কারণে বাচ্চার জন্মদান থেকে শুরু করে বাচ্চাকে লালন পালনে স্ত্রী তেলাপিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি যতদিন পর্যন্ত বাচ্চগুলো বাইরের পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে না পারবে (কমপক্ষে ১২ দিন) ৩৩ দিন পর্যন্ত মা তেলাপিয়া তার বাচ্চাগুলোকে মুখের ভিতর আগলে রাখে। এই সময় সে বাহির থেকে কোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না। এই সমস্ত কারণে স্ত্রী তেলাপিয়ার বৃদ্ধির হার পুরুষ তেলাপিয়ার চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ স্ত্রী তেলাপিয়ার চেয়ে পুরুষ তেলাপিয়া অনেক দ্রুত বাড়ে। তাই চাষের ক্ষেত্রে এই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রজনন ঠেকানোর জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ তেলাপিয়া একসঙ্গে চাষ না করে শুধুমাত্র মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়া চাষ করা যেতে পারে। আবার তেলাপিয়ার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিক প্রজনন সবচেয়ে বড় সমস্যা বিধায় তেলাপিয়া যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রজনন করতে না পারে সেজন্য এদেরকে ট্রিপ্লয়েড তেলাপিয়ার রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ট্রিপ্লয়েড মাছ বন্ধ্যা হওয়ার কারণে জনন কোষের বিভাষণ তথা প্রজনন-সংশ্লিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কাজে তাদের শক্তি ব্যয় করতে হয় না। ফলে গৃহীত খাদ্যের ব্যয়িত অংশ বাদে পুরোটাই মাংসপেশিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ফলে স্বাভাবিক তেলাপিয়ার চেয়ে বন্ধ্যা তেলাপিয়া উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। তাই কোনো কোনো মৎস্যচাষি সাধারণ তেলাপিয়া চাষ না করে একলিঙ্গ পুরুষ (Monosex Male) তেলাপিয়া চাষ করলে একই সময়ে একই ব্যবস্থাপনায় অনেক বেশি উৎপাদন পেতে পারেন।

তেলাপিয়া শোনার লিঙ্গ শনাক্তকরণ কৌশল :

সাধারণত প্রতিটি মাছের ওজন যখন ৩৪-৪০ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্য ৭-৯ সেন্টিমিটার হবে তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এদের পুরুষ এবং স্ত্রী মাছের পার্থক্য করা যায়। কারণ এ সময় এদের জননঅঙ্গ বা জেপিটাল প্যাপিরাল পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঠিক তখনই তাদের এ পার্থক্যকরণের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। তবে

সেক্সিং-এর ক্ষেত্রে এ পৃথককরণ যত কম বয়সে করা যাবে এ পদ্ধতিতে চাষের সফলতা ততই বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রী এবং পুরুষ তেলাপিয়ার পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

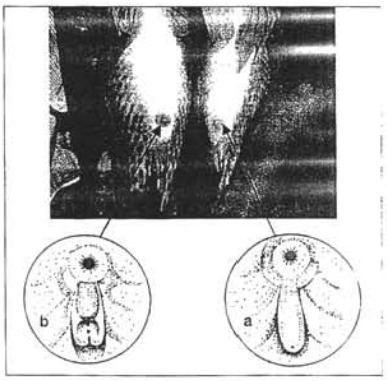

চিত্র : স্ত্রী ও পুরুষ তেলাপিয়া

পুরুষ তেলাপিয়া	স্ত্রী তেলাপিয়া
পুরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় ২ ছিদ্র সম্পন্ন, সাদা ও লম্বাটে।	স্ত্রী মাছের জননেন্দ্রিয় ৩ ছিদ্রসম্পন্ন খাটো ও লালচে রঙের।
প্রজনন কালে এ ক্ষেত্রে গলায় অংশে বর্ণ লালচে দেখায়।	এ ক্ষেত্রে ততটা লালচে বর্ণ দেখা যায় না। কিছুটা হলদেটে ভাব দেখায়।

কিন্তু পোনার ওজন ২ গ্রামের কম হলে জননেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ করে লিঙ্গ শনাক্ত করা যায় না, তবে এসিটোকারমিন স্কোয়াস পদ্ধতিতে লিঙ্গ শণাক্তকরণ করা সম্ভব। তেলাপিয়া পোনার লিঙ্গ শণাক্তকরণের প্রণালি নিচে দেখানো হলো :

১। কিছু পোনার নমুনাকে ধারালো কাচির সাহায্যে বিচ্ছেদ করা হয়।

২। উদয় গহ্বরের উপরের দিকে অবস্থিত সুতার ন্যায় গোনাড ফরসেফ দিয়ে বের করা হলো।

৩। সংগৃহীত গোনাড গ্লাস স্লাইডে স্থাপন করে ১ ফোঁটা এসিটোকারমিন দ্রবণ দিয়ে হবে। তারপর কভার স্লাইপ দিয়ে ঢেকে গোনাডকে চাপ দিয়ে হয়।

৪। এরপরে গোনাডকে মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

৫। পুরুষ গোনাড দেখতে সূক্ষ্ম দানার ন্যায় এবং স্ত্রী গোনাড দেখতে জালের মতো।

এসিটোকারমিন দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো :

১। কারমিন : ০.৫ গ্রাম

২। ৪৫% এসিটিক এসিড : ১০০ মি. লি.

৩। ২-৪ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ফিল্টার করতে হবে।

তেলাপিয়ার মনোসেক্স জাতের পোনা উৎপাদনে হ্যাচারির নকশা প্রণয়ন ও পরিচালনা :

বাণিজ্যিকভাবে তেলাপিয়ার মনোসেক্স পোনা উৎপাদন হ্যাচারি নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বে স্থান নির্বাচনে নিম্নের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিবেচনা করা দরকার।

১। হ্যাচারির স্থান বন্যামুক্ত এবং বাণিজ্যিক তেলাপিয়ার খামারের নিকটে হলে ভালো হয়।

২। পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে (ভূ-গর্ভস্থ অথবা উপরিভাগের পানির উৎস হতে পারে)।

৩। পুকুর নির্মাণে ভালো মাটি অর্থাৎ বেলে-দোঁআশ মাটি হতে হবে।

৪। স্থায়ী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। পোনা বিক্রির জন্য ভালো বাজার বা বিপণনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

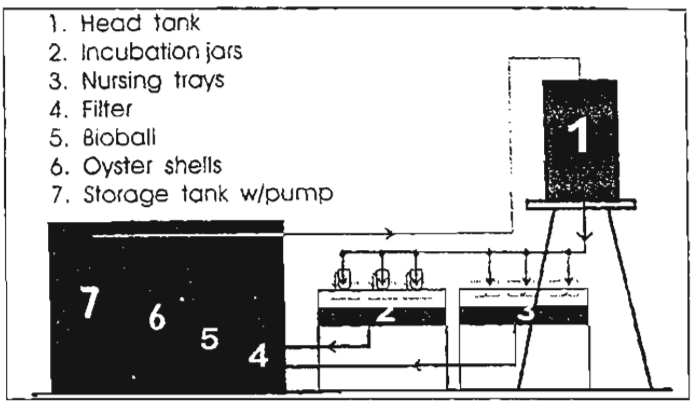

চিত্র : হ্যাচারিতে তেলাপিয়ার ডিম ইনকোবেশন এবং হ্যাচিং সিস্টেমের মডেল

ক) তেলাপিয়া হ্যাচারি কমপ্লেক্সের নকশা এবং নির্মাণ :

ডিম ফুটানো, হ্যাচিং এবং লার্ভিং নার্সিং ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তেলাপিয়া হ্যাচারির প্রধান ও কার্যকর উৎপাদনগুলো নিম্নরূপ :

১। হ্যাচারির ছাউনি (Hatchery Shed) লোহার অ্যাঙ্গেল (Iron Angles) দিয়ে তৈরি যা সিআই সিট (CI Sheets) দিয়ে আবৃত।

২। সিমেন্টের মেঝে।

৩। ডিম ফুটানোর জন্য জার (Jars) এবং হাতলসহ ট্রে (Trays)।

৪। পুনঃসঞ্চালন পানির প্রবাহ।

৫। পানি সরবরাহের (অন্তর্মুখী ও বর্হির্মুখী)।

৬। পানির পাম্প (SubmersiYule water pump)|

৭। ১০০০০-২০০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড পানির ট্যাংক।

৮। খাবার প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ রুম।

৯। স্বল্পস্থায়ী নার্সিং ট্যাংক।

১০। হরমোন ট্রিটমেন্টের জন্য নার্সারি পুকুর।

১১। হ্যাচারিতে বায়ুবায়নের ব্যবস্থা।

(খ) হ্যাচারিতে তেলাপিয়ার ডিম ফুটানো পদ্ধতির মডেল :

হ্যাচারির প্রয়োজনীয় উপাদনসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(ক) হেডার ট্যাংক : জার এবং ট্রেতে প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য মজুদ রাখা হয়।

(খ) ইনকোবেশন জার :

নিষিক্ত ডিম হ্যাচিং-এর জন্য ইনকোবেশন জারে রাখা হয়।

(গ) নার্সিং ট্রে

সদ্য ফোটা লার্ভিকে নার্সিং-এর জন্য এই ট্রেতে রাখা হয়।

(ঘ) ফিল্টার চেম্বার :

ইনকোবেশন জার এবং ট্রেতে ব্যবহৃত পানি এই চেম্বারের মাধ্যমে ফিল্টার করা হয়।

(ঙ) বায়োবল চেম্বার :

ফিল্টার করা পানি বায়োবল চেম্বারের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়ে প্রবাহিত হয়।

(চ) ওয়েস্টার সেল :

ফিল্টার ও বায়োবল চেম্বারের পানি এই চেম্বারে পুনরায় বিশুদ্ধ হয়।

(ছ) মজুদ ট্যাংক :

এই চেম্বারে বিশুদ্ধ পানি মজুদ থাকে এবং তা সাব-মারসিবল পাম্পের মাধ্যমে ওভার হেড ট্যাংকে স্থানান্তরিত হয়।

(গ) হ্যাচারি ছাউনি : (Hatchery Shed) এবং সিমেন্টের মেঝে নির্মাণ মাঝারি আকারে তেলাপিয়া হ্যাচারির নির্মাণের জন্য নিম্নের উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ :

১। হ্যাচারির ছাউনির (Hatchery Shed) গঠন : ৮৬২৫ বর্গমিটার (১১.৫ মি × ৭ মি.)

২। সিমেন্টের মেঝে : ৭৭ বর্গমিটার (১১ মি × ৭ মি.)

৩। বিম ও কলাম

৪। এম এস এঙ্গেল ট্রাস

৫। সি আই সিটের ছাদ

৬। ইনকোবেশন জার এবং ট্রে স্থাপন :

প্লাস্টিক কন্টেনারের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যাচিং জার এবং ট্রেগুলো হ্যাচারির ভিতরে সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

১। লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন জার ৩০টি।

২। ট্রের সংখ্যা ৬০টি (প্রতিটি ২৮ সে. মি. × ৪৩ সে. মি. × ১০ সে.)

৩। ট্রে স্থাপনের জন্য প্লাস্টিক কন্টেনারের সংখ্যা : ৩০ টি প্রতিটি ৩০ সে.মি. ×১২০ সে.মি×২০ সে. মি)

৪। ইস্পাত অথবা লৌহ অথবা কাঠের স্ট্যান্ড : ১৫ টি।

(ঙ) প্রজনন পুকুর নির্মাণ :

প্রজনন পুকুরের জন্য ০.৪ হেক্টরের কমপক্ষে ১.৫-২.০ মিটার গভীরতায় কমপক্ষে ৩টি পুকুর পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করতে হবে। পানি সরবরাহ এবং নির্গমনের জন্য ২টি মক্ক বা পার্শ্বপথসহ পুকুরগুলো আয়তাকার হতে হবে।

(চ) প্রজনন হাপা তৈরি ও স্থাপন :

প্রজনন হাপা তৈরির জন্য গ্লাস নাইলন অথবা নাইলন জালের কাপড় স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে দর্জির সাহায্যে আয়তাকার (২০ মি × ৫ মি. × ১.৫ মি.) আকারের হাপা তৈরি করা প্রয়োজন। নিম্নে পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি প্রজনন পুকুরে ৮১০ টি হাপা স্থাপন করা হয়ে থাকে।

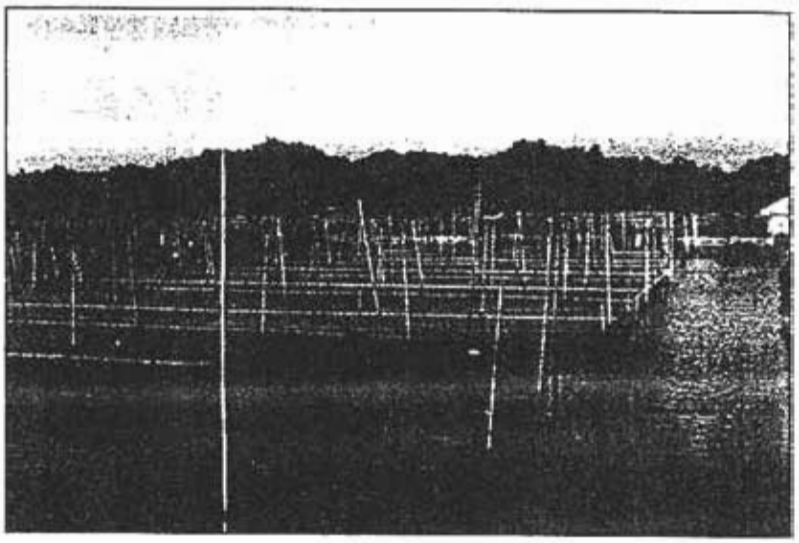

চিত্র : পুকুরে স্থাপিত তেলাপিয়ার প্রজনন হাপা

(১) খুব সতর্কতার সাথে হাপা স্থাপন করতে হবে যাতে হাপাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।

(২) বাঁশের অথবা কাঠের অথবা লোহার খুঁটির মাধ্যমে হাপা স্থাপন করতে হবে।

(৩) হাপাতে পানি সঞ্চালনের জন্য ০.৫-১.০ মিটার গভীরতায় স্থাপন করা হয়। হাপার উপরের অংশ পানির স্তর থেকে ৫০-৬০ সে. মি. উপরে রাখা হয়।

(৪) হাপা খুব ভালোভাবে বাঁধতে হবে যাতে হাপা বাতাসের চাপে ভাজ হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

২০২০

(ছ) প্রজননক্ষম মাছ বাছাই এবং প্রজনন হাপাতে মজুদকরণ :

হাপা আকারের উপর প্রজননক্ষম মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ভরশীল। হাপায় উন্নত জাতের প্রজননক্ষম ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া প্রতি বর্গমিটারে ৪-৬টি মজুদ করতে হবে। জানা উৎস থেকে সংগৃহীত অথবা ইতিপূর্বে ব্রুড পুকুরে লালন-পালন করা হয়েছে এমন স্টক থেকে পুরুষ ও স্ত্রী মাছ ১ঃ৩ (১টি পুরুষ ও ৩ টি স্ত্রী) অনুপাতে হাপায় মজুদ করা হয়।

খাবার উপাদান	শতকরা হার	প্রোটিনের পরিমাণ (%)
ফিশমিল	২৮.০০	১৬.৮০-৬০%
সরিষার খৈল	২০.০০	৭.২৫-৩৬%
চালের কুঁড়া	৩৭.০০	৪.৫০-১২%
গমের ভুসি	১০.০০	১.৫০-১৫%
চিটাগুড়	৫.০০	-
মোট	১০০	৩০.০০

(জ) মাছের মুখ থেকে নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ :

গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের পুকুরে পরিপক্ব স্ত্রী মাছ সাধারণত ২-৩ সপ্তাহে অন্তর ডিম দিয়ে থাকে। পর্যায়ক্রমে পুরুষ মাছ ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে এবং প্রাকৃতিকভাবে স্ত্রী মাছ মুখে নিষিক্ত ডিম ধারণ করে। সুতরাং ডিম সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক হাপাতে মজুদকৃত স্ত্রী মাছের মুখ সপ্তাহে ১ বা ২ বার অত্যধিক সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ডিম সংগ্রহের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা :

(১) প্রজননক্ষম স্ত্রী মাছ হাপার এক জায়গায় জমা করে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

(২) নিষিক্ত ডিম অথবা লার্ভি হাপা থেকে সংগ্রহ করার জন্য অত্যন্ত ২-৩ জন লোক দরকার হয়।

(৩) নিষিক্ত ডিম অথবা লার্ভি মুখে আছে কিনা তা দেখার জন্য প্রত্যেক প্রজননক্ষম স্ত্রী মাছ স্কপ নেটের সাহায্যে সংগ্রহ করে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

(৪) নিষিক্ত ডিম স্ত্রী মাছের মুখ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং রঙের ভিন্নতা অনুসারে আলাদা করে রাখা হয়। সাধারণত চার রঙের ডিমের মাছের মুখ থেকে সংগ্রহ করে প্লাস্টিক গামলায় রাখা হয়। (সাদাটে, হালকা, হলুদ, গাড় হলুদ এবং লালচে) প্লাস্টিক গামলাগুলো ইস্পাত লোহা অথবা বাঁশের ফ্রেমের উপর ভাসিয়ে রাখা হয়।

(৫) সংগৃহীত ডিমগুলো জীবাণুমুক্ত করতে ৫-৭ পিপিটি লবণে দ্রবণে (Saline Water) রেখে ৮-১০ মিনিট কক্ষ তাপমাত্রায় রাখা হয়।

(৬) এই অবস্থায় সংগৃহীত নিষিক্ত ডিম/লার্ভি হ্যাচিং-এর জন্য হ্যাচারিতে স্থানান্তর করা হয়।

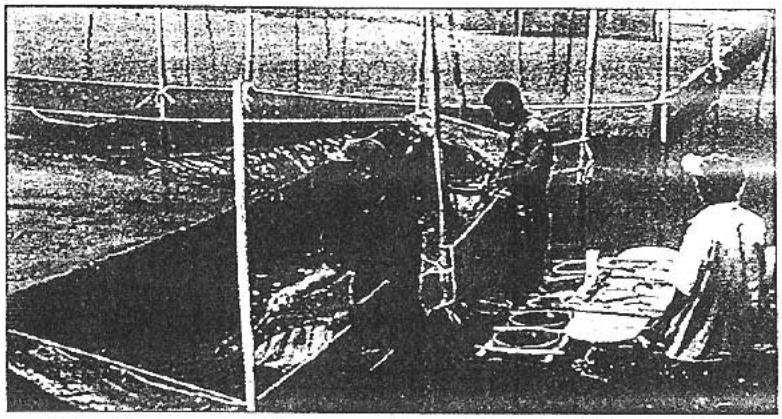

চিত্র : হাপা থেকে নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ এবং বাঁশের ফ্রেমে রক্ষিত প্লাস্টিক বাউলে বিভিন্ন রঙের ডিম পৃথককরণ পদ্ধতি

(ঝ) জার/ট্রেতে সংগৃহীত ডিম অথবা লার্ভি ফুটানো :

নিষিক্ত ডিম/লার্ভি স্ত্রী মাছের মুখ থেকে সংগ্রহ করে গোলাকার প্লাস্টিক জার এবং সমতল ট্রেতে রেখে পানির পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে ফুটানো হয়ে থাকে যেখানে স্বচ্ছ পানি (তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস) ওভারহেড ট্যাংক থেকে সরাসরি সঞ্চালিত হয়। ডিম ফুটার পর পূর্ণাঙ্গ লার্ভি ট্রেতে স্থানান্তর করা হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত লার্ভিং ডিমথলি নিঃশোষিত হয়, ততক্ষণ এই ট্রেতেই ক্ষুদে পোনাগুলো মজুদ থাকে। নিষিক্ত ডিম হতে ভ্রূণ এবং লার্ভার অবস্থা শেষ হতে গড়ে প্রায় ১৫-১২ দিন সময় লাগে।

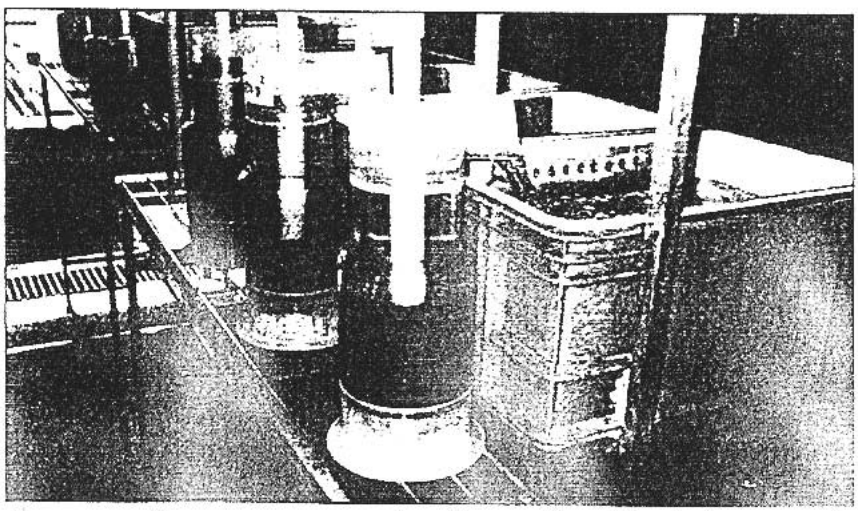

চিত্র : উন্নতমানের প্লাস্টিক জার এবং আয়তকার ট্রে সংবলিত তেলাপিয়ার নিষিক্ত ডিম ইনকোবেশন সিস্টেম

(ঞ) এন্ড্রোজেন হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রস্তুত মজুদ এবং প্রয়োগ :

তেলাপিয়া নাইলোটিকার মনোসেক্স পোনা উৎপাদনের জন্য হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

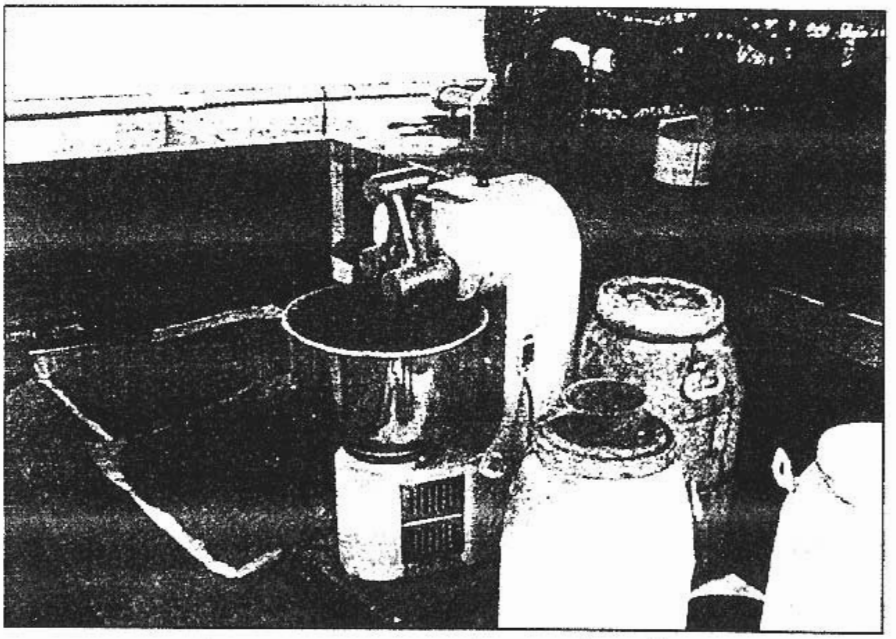

চিত্র : খাবারের সাথে হরমোন মিশ্রণের স্বয়ংক্রিয় মেশিন

হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরি :

১. হরমোন মাত্রা ৫০ মিলিগ্রাম ১৭-α মিথাইল টেসটোসটেরণ (17-α Methyl testosteron) ১০০ মি. লি ইথাইল অ্যালকোহালের (৯৫%) সাথে দ্রবীভূত করা হয়।

২. হরমোন দ্রবণ এক কেজি পাউডার খাবারের (৫০% সাধারণত খাবার +৫০% ফিশমিল) সাথে ১০-১৫ মিনিট সময় ধরে মিশাতে হবে।

৩. তৈরিকৃত খাবার পরে সাধারণত তাপমাত্রা শুকানো হয়।

৪. হরমোন মিশ্রিত শুস্ক খাবার কক্ষ তাপমাত্রায় অথবা ৪° সে. তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে সর্বোচ্চ ৭ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

মজুদ দ্রবণ ব্যবহার করে হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরি : মজুদ দ্রবণ তৈরি করে ১০০ কেজি খাবার তৈরির জন্য কয়েক সপ্তাহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়।

১। গ্রাম ১৭-α-মিথাইল টেসটোসটেরণ, ১ লিটার ইথানলের (৯৫%) সাথে দ্রবীভূত করে মজুদ দ্রবণ তৈরি করা হয়।

২। ১ কেজি মিহি খাবার একটা শুষ্ক পাত্রে রাখা হয়।

৩। পরে ১০ মি. লি মজুদ দ্রবণ পুনরায় ১০০ মি. লি ইথানলের সাথে মিশিয়ে খাবার তৈরি করা হয়।

৪। এই দ্রবণটি ধীরে ধীরে খাবারের সাথে সংমিশ্রণ করে হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরি করা যায়।

৫। প্রস্তুতকৃত খাবার ১০-১৫ মিনিট ধরে সাধারণত তাপমাত্রায় শুকিয়ে সরাসরি তেলাপিয়া মনোসেক্স পোনা উৎপাদন কার্যক্রম ব্যবহার করা হয়।

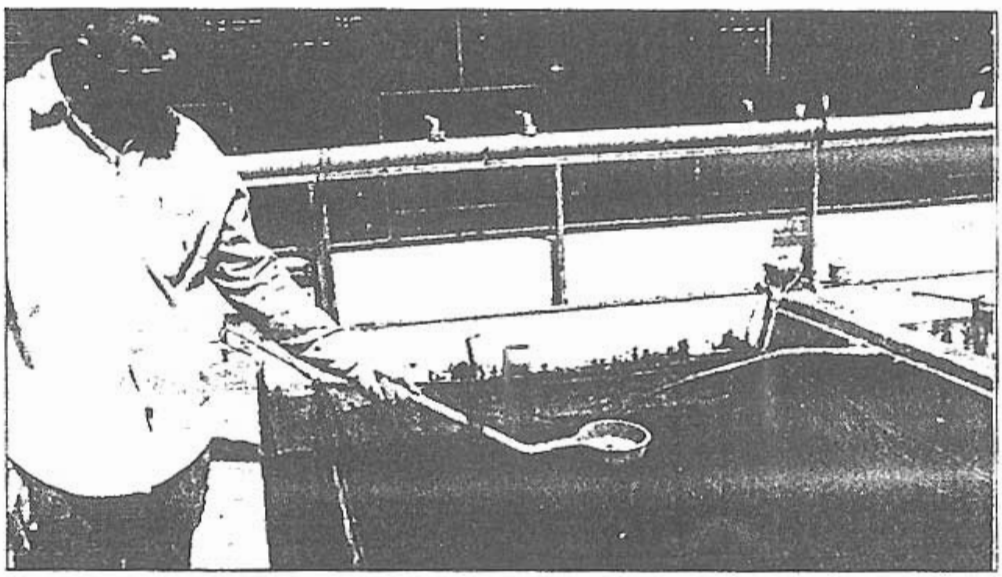

চিত্র : ট্রানজিটরি ট্যাংকে হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে হরমোন এবং খাবার মিশ্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয় মেশিন ও ব্যবহার করা যায়।

ক্ষণস্থায়ী ট্যাংকে প্রথমে খাবার গ্রহণযোগ্য পোনাকে হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ : ক্ষণস্থায়ী ট্যাংকে প্রথম খাবার গ্রহণযোগ্য পোনাকে হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগের দৃশ্য এবং নিম্নে কৌশল বর্ণনা করা হলো :

১। ট্যাংকের আকার : ১৭ মি. × ৩ মি. × ০.৭৫ মি.

২। ট্যাংকের সংখ্যা : ৪টি

৩। মিহি ফাঁসের জাল দ্বারা আবৃত

৪। হাপার আকার : ৮ মি. × ২.৫ মি. × ০.৬ মি.

৫। প্রতি ট্যাংকের হাপার সংখ্যা : ২ টি

৬। প্রতি হাপাতে প্রথম খাবার গ্রহণযোগ্য পোনার সংখ্যা : ১৫০০০০

৭। ট্যাংকে পানির উচ্চতা : ৬০ সে. মি

২০২০

৮। এই সকল হাপাতে হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ করা যায়

৯। খাবার প্রয়োগ মাত্রা : পরিতৃপ্ত অবস্থা পর্যন্ত

১০। খাবার প্রয়োগকাল : দিনে ৩ বার

১১। হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগের স্থায়িত্বকাল : ৩ দিন।

১২। নিয়মিত ঠান্ডা স্বাদু পানি পরিবর্তন করে এই ট্যাংকের পানিতে গুণাগুণ রক্ষা করা হয়। (তাপমাত্রা ২৪-২৭° সে.)

১৩। স্বল্পস্থায়ী ট্যাংকের অবস্থান কালের ক্ষেত্রে স্ফুদে পোনাকে তাদের সংখ্যা গণনা করে নার্সারি খাবার প্রয়োগ হাপাতে স্থানান্তর করা হয়।

চিত্র। তেলাপিয়ার স্ফুদে পোনা গণনার পদ্ধতি

নার্সারি হাপাতে স্ফুদে পোনাকে হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ : নার্সারি হাপা স্থাপনের জন্য ০.৪ হেক্টর আয়তনের একটি পুকুর নির্মাণ করতে হবে। পুকুরটি হবে আয়তাকার এবং পানি আগমন ও নির্গমনের দুটি পার্শ্বপথ যুক্ত। পুকুরের গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঁশের খুঁটি এবং নাইলনের দড়ির সাহায্যে হাপা স্থাপন করা হয়।

সপ্তাহ	খাদ্য (%)
১	৩০
২	২০
৩	১৫

২০২০

হরমোন মিশ্রিত খাবার খাওয়ানোর কৌশল এবং প্রয়োগ প্রণালি দেখানো হলো। মনোসেক্স পোনা উৎপাদনের জন্য খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো :

(১) হাপার আকার : দৈর্ঘ্য ৮ মি. × প্রস্থ ২.৫ মি. × ০.৭৫ মি.

(২) হাপার সংখ্যা : ২৫ টি

(৩) হাপাতে ক্ষুদে পোনার মজুদ ঘনত্ব : ১০০০০০

(৪) মজুদকৃত পোনার মোট সংখ্যা : প্রায় ২.৫ মিলিয়ন

(৫) খাবার প্রয়োগ মাত্রা : শারীরিক ওজনের ১৫-৩০%

(৬) খাবার প্রয়োগের তীব্রতা : প্রতিদিন ৪-৬ বার

(৭) হরমোন মিশ্রিত খাবার খাওয়ানো স্থায়িত্বকাল : ১৮-২১ দিন

(৮) মনোসেক্স পুরুষ জাতের পোনার উৎপাদন : প্রতি মাসে প্রায় ২.০ মিলিয়ন

(৯) নিয়মিত ঠাণ্ডা পানি পরিবর্তন করে পুকুরে অবস্থিত নার্সারি হাপার পানির গুণাগুণ ঠিক রাখা হয়। (তাপমাত্রা ২৪-২৭° সে.)

চিত্র : পুকুরে স্থাপিত হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগের হাপা

বিক্রয়ের জন্য মনোসেক্স পোনা মজুদ ও লালন : হরমোন মিশ্রিত খাবার ক্ষুদে পোনাকে ২১-২৪ দিন প্রয়োগের পর ৯০-৯৫% লিঙ্গ রূপান্তরিত মনোসেক্স পুরুষ পোনা প্রাপ্তির আশা করা যায়। এই অবস্থায় সাধারণ খাবার প্রয়োগ করে পৃথক পৃথক হাপায় বিক্রয়ের জন্য পোনা মজুদকরণ ও লালনের বিষয়ে নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) হাপার সাইজ : ৮ মি. × ২.৫ মি. × ০.৮ মি.

(খ) মজুদ : ২১-২৪ দিন বয়সের পোনা

(গ) মজুদ ঘনত্ব : ৪০০-৬০০ ঘন মিটার

(ঘ) পুকুরে তেলাপিয়ার পোনা লালনের জন্য সুষম খাবারের ফরমুলা নিম্নে দেওয়া হলো :

খাবার উপাদান	শতকরা হার (%)	প্রোটিনের পরিমাণ
ফিশ মিল	২৮.০০	১৬.৮০ - ৬০% কেজি
সরিষার খৈল	২০.০০	৭.২০ - ৩৬% কেজি
চালের কুঁড়া	৩৭.০০	৪.৫০ - ১২% কেজি
গমের ভুসি	১০.০০	১.৫০ - ১৫% কেজি
চিটা গুড়	৫.০০	-
মোট-	১০০	৩০.০০

প্রস্তুতকৃত খাবার প্রয়োগের হার পোনার দেহ ওজনের ৮-১০%

(ঙ) লালনকাল : ১-২ সপ্তাহ।

*** তেলাপিয়ার মনোসেক্স পোনা উৎপাদন এবং করণীয় :**

সাধারণত তেলাপিয়ার মনোসেক্স পোনা উৎপাদন পদ্ধতি খুব সহজে মনে হতে পারে কিন্তু প্রয়োগকারীদের এটি জেনে রাখা উচিত যেন এটি জীব প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন। মাছের প্রজনন সংক্রান্ত সঠিক প্রক্রিয়া, প্রজনন পুকুরে পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য রাসায়নিক গুণাগুণের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা, প্রথম খাবার গ্রহণের পোনা শনাক্তকরণ, হরমোন এবং অ্যালকোহলের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ১০০% পুরুষ পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। তাই মাঠ পর্যায়ে কৃষকরা যেন প্রতারিত না হন সেজন্য হ্যাচারির মালিকদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা-৬

এক কথায় উত্তর দাও

১। মনোসেক্স তেলাপিয়া কী?

২। কেন মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদন করা হয়?

৩। কী কী ভাবে মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদন করা হয়?

৪। হরমোন প্রয়োগের মনোসেক্স তেলাপিয়া সুবিধাগুলো কী কী?

৫। ছোট তেলাপিয়া মাছের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

৬। মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদনে কোন হরমোন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা উৎপাদনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। পুরুষ ও স্ত্রী তেলাপিয়া মাছের পার্থক্য লেখ।

৩। তেলাপিয়া মাছের সম্পূরক খাদ্য কী কী উপাদান দিয়ে তৈরি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। মনোসেক্স তেলাপিয়ার ব্রুড ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

২। তেলাপিয়া মাছের খ্যাদ্যে কীভাবে হরমোন মিশ্রিত করা হয় এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩। তেলাপিয়া মাছের নিষিক্ত ডিম ও রেণুর সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪। মনোসেক্স পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

ব্যবহারিক

জব নং-০১

জবের নাম : গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ সংগ্রহ ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : সুস্থ সবল নীরোগ পিতা মাতাই সুস্থ সবল এবং টেকসই বংশধর উৎপন্ন করতে পারে । ব্রুড মাছ সংগ্রহের সময় সংগৃহীত মাছের বৃদ্ধি হার বেঁচে থাকার হার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খাদ্য রূপান্তর হার (FCR), ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে । ভালো গুণসম্পন্ন রেণু উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত উৎস থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করা আবশ্যক :

১ । প্রাকৃতিক উৎস থেকে অর্থাৎ নদ-নদী বা প্লাবন ভূমি হতে বন্য জাতের মাছ সংগ্রহ করে।

২ । হ্যাচারিতে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা সংগ্রহ করে ।

৩ । ব্রুড ব্যাংক থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে ।

৪ । এক হ্যাচারি থেকে অন্য হ্যাচারীতে ব্রুড আদান প্রদান করে অর্থাৎ ব্রুড বিনিময় করে ।

(বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ব্রুড মাছকে আলাদা আলাদা পুকুরে রাখতে হবে)

উপকরণ :

১ । হ্যাচারি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য উপযুক্ত যানবাহন

২ । খাতা ও পেন্সিল

৩ । ব্রুড মাছ

৪ । জাল

৫ । হাপা

কাজের ধাপ :

১ । বিদ্যালয়ের নিকটতম স্থানে কোনো মৎস্য প্রজনন হ্যাচারি মালিকের সাথে হ্যাচারি পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পূর্বে যোগাযোগ করি ।

২ । নির্দিষ্ট তারিখে শ্রেণি শিক্ষকসহ মৎস্য প্রজনন হ্যাচারি পর্যবেক্ষণের জন্য গমন করি ।

৩ । হ্যাচারি মালিক নিয়োজিত লোকের কাছ থেকে ঐ হ্যাচারির ব্রুড সংগ্রহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি ।

৪ । নিকট আত্মীয়ের সম্পর্কের মাছ থেকে পোনা উৎপাদন অর্থাৎ অন্তঃপ্রজনন সম্পর্কে ধারণা লাভ করি ।

৫ । পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন তথ্য ও বিষয়গুলো ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি ।

জব নং-০২

জবের নাম : গুণগত মান সম্পন্ন ব্রুড মাছ প্রতিপালন

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

একটি হ্যাচারির প্রাণ হলো ব্রুড মাছ। প্রজনন সফলতা ও ভালো মানের পোনা প্রাপ্তি বহুলাংশে নির্ভর করে ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনার উপর উন্নত গুণ সম্পন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ হ্যাচারি নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন পুকুরে যথাযথভাবে পরিচর্যা করতে হবে।

১। বিভিন্ন উৎস থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করি।

২। সংগৃহীত ও বাছাইকৃত ব্রুড মাছকে ভালো পরিবেশে উৎপাদনশীল পুকুরে পালন করি। এক্ষেত্রে পুকুরের আয়তন ৫০-১০০ শতাংশ ও গভীরতা ৬-৮ ফুট হলে ভালো হয়।

৩। মজুদ ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় রাখি। এক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি মাছ রাখি।

৪। প্রাকৃতিক খাদ্যেও পাশাপাশি বাহির থেকে ২৫-৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করি।

৫। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি। রোগ-বালাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আগে থেকেই গ্রহন করি।

৬। মাঝে মাঝে আংশিক পানি পরিবর্তন করি।

৭। কোনো পুকুরে কী প্রজাতির এবং ওজনের মাছ আছে তা রেজিস্টার খাতায় লিখে রাখি।

৮। প্রজনন শেষে ব্রুড মাছ পৃথক পুকুরে পরিচর্যা করি।

উপকরণ :

১। হ্যাচারিতে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত যানবাহন।

২। খাতা ও পেন্সিল।

কাজের ধারা :

১। বিদ্যালয়ের নিকটতম স্থানে মৎস্য প্রজনন হ্যাচারি মালিকের সাথে হ্যাচারি পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পূর্বেই যোগাযোগ করি।

২। নির্দিষ্ট তারিখে শ্রেণি শিক্ষকসহ মৎস্য প্রজনন হ্যাচারিতে যাই।

৩। হ্যাচারি মালিক নিয়োজিত লোকের কাছ থেকে ঐ হ্যাচারির ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য যেমন : তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য গুদামজাতকরণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, পুকুর প্রস্তুতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি।

৪। পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন তথ্য ও বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-০৩

জবের নাম : বিভিন্ন প্রজাতির প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ শনাক্তকরণ ও বাছাইকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

ব্রুড মাছের সঠিক নির্বাচনের উপর কৃত্রিম প্রজননের সফলতা নির্ভর করে। মাছ বাছাইয়ের ব্যাপারটি মূলতঃ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ব্রুড মাছ বাছাই ও পরিবহনের কাজটি সকাল বেলায় পানির তাপমাত্রা বাড়ার আগেই করি। নিম্নবর্ণিত পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ মাছের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে নির্বাচন ও বাছাই করি।

স্ত্রী মাছ	পুরুষ মাছ
বক্ষ পাখনার উপরিভাগ পিচ্ছিল দেখে।	বক্ষ পাখনার উপরিভাগ খসখসে দেখে।
স্ত্রী মাছের পেটি স্ফীত ও নরম দেখে।	পেটি স্বাভাবিক দেখে।
পায়ু পথ ফুলা ও ঈষৎ গোলাপি থেকে লাল দেখে।	পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রঙের দেখে।
স্ত্রী মাছের পেটি সামান্য চাপে কিছু সংখ্যক ডিম বের হতে দেখে।	সামান্য চাপে শুক্র বের হতে দেখে।

উপকরণ :

১। হ্যাচারি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন।

২। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীদের পুকুরে নামার জন্য উপযুক্ত পোশাক।

কাজের ধারা :

১। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মাধ্যমে নিকটতম কোনো হ্যাচারি মালিকের সাথে পূর্বে যোগাযোগ করি।

২। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হ্যাচারিতে পৌঁছি।

৩। ব্রুড মাছের পুকুরে বেড় জাল দিয়ে ব্রুড মাছ ধরি এবং ব্রুড মাছ বাছাই করি।

৪। হ্যাচারির অভিজ্ঞ কর্মীর সহায়তায় বিভিন্ন প্রজাতির ব্রুড মাছের স্ত্রী ও পুরুষ ব্রুডের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করি।

৫। পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

চিত্র : পরিপক্ব স্ত্রী ও পুরুষ কাতলা মাছ

জব নং-০৪

জবের নাম : পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মাছের যে গ্রন্থি প্রজননের সময় গোনাডোট্রোপিন নামক হরমোন নিঃসৃত করে তাকে পিটুইটারি গ্রন্থি বা পি.জি বলে। কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত হরমোন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করি। এর মধ্যে মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি অন্যতম উৎস। পিজি সংগ্রহের জন্য মাছ নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাছ প্রজনন উপযুক্ত অর্থাৎ ১ বছরের বেশি বয়স হতে হবে। আর মাছ পচন ধরার আগেই পিজি সংগ্রহ করে নিই। সংগৃহীত পিজি সাধারণ তাপমাত্রায় অ্যালকোহলে এসিটনে সংরক্ষণ করি।

উপকরণ :

১। এক বছরের বেশি বয়সের এবং এক কেজি বা সামান্য বেশি ওজনের কয়েকটি তাজা রুই-কাতলা মাছ।
২। হ্যান্ডেলসহ হ্যাক'স ব্লেড
৩। মাছের মাথা বসাবার জন্য কাঠের ফ্রেম
৪। ছুরি, কাঁচি, চিমটা, নিডল, স্কালপেল ইত্যাদি
৫। অ্যালকোহলসহ কাচের ছোট ভায়াল

কাজের ধারা :

১। কাঠের ফ্রেমের সাহায্যে মাছকে পিঠ উপর দিকে অবস্থায় ধরে রাখি।
২। হাত করাত দিয়ে আস্তে আস্তে মাছের মাথার খুলি কেটে সরিয়ে ফেলি।
৩। খুলির নিচেই মাছের মস্তিষ্ক দেখা যাবে। চিমটা দিয়ে সাবধানে মাছের মস্তিষ্ক সরিয়ে ফেলি।
৪। মস্তিষ্কের নিচে মাঝামাঝি অংশে একটি গর্তের মধ্যে হালকা গোলাপি রঙের পিজি দেখা যাবে। টিস্যু দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিই।
৫। গর্তটির মুখে পাতলা একটা আবরণ থাকে। খুব সাবধানে চিমটা দিয়ে আবরণ সরিয়ে পিজিকে আলাদা করে তুলে আনি। খেয়াল রাখি যেন গ্লান্ডটি গলে না যায়।
৬। সংগৃহীত পিজি একটি ভায়ালে অ্যাবসলিউট অ্যাকোহলে বা এসিটনে রাখি।
৭। এভাবে সংগৃহীত গ্লান্ড ২০-৩০মি.মি. ছোট শিশিতে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল বা এসিটনে ২৪ ঘণ্টা রাখার পর শিশির পুরনো অ্যালকোহল বা এসিটনে বদলিয়ে নতুনভাবে শিশি ভরে রাখি।
৮। গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছবিসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

চিত্র : মাছের মাথার খুলির অংশের নিচে পি. জি.-এর অবস্থান দেখানো হচ্ছে

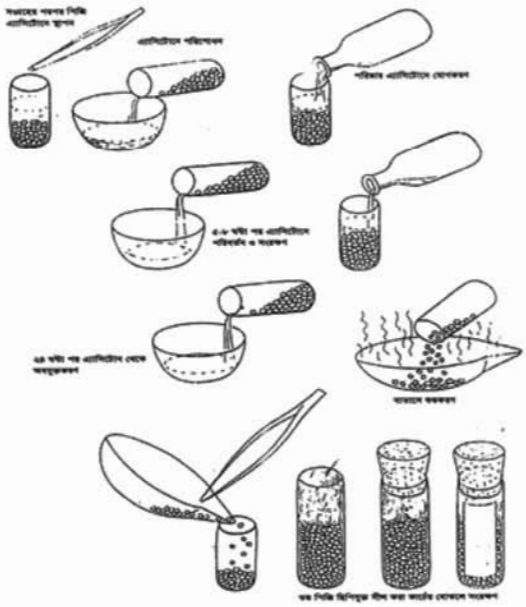

চিত্র : এসিটোন সহযোগে পিজি শোধন, শুষ্ককরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

সতর্কতা :

১। শুধু মাত্র পরিপক্ব মাছ থেকেই গ্লান্ড সংগ্রহ করতে হবে।

২। পচনশীল মাছ থেকে গ্লান্ড সংগ্রহ করা উচিত নয়।

৩। গ্লান্ডটি সাবধানে তুলে আনতে হবে যাতে পিজি গলে না যায়।

৪। গ্লান্ড কোনভাবেই যেন পানির সংস্পর্শে না আসে।

জব নং-০৫

জবের নাম : বিভিন্ন হরমোনের দ্রবণ তৈরিকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

হরমোন ইনজেকশন দ্রবণ তৈরির জন্য প্রথমে মাছের ওজনের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় হরমোন/পিজি মেপে পোরসেলিন কিংবা টিস্যু হোমোজিনাইজারে পতিত পানি দ্বারা উত্তমভাবে মিশ্রিত করি। এরপর পানিকে সেন্ট্রিফিউজ করে ৩০ মিনিট স্থির রেখে দ্রবণের উপর থেকে শুধুমাত্র জলীয় অংশটুকু সংগ্রহ করি। হয়। আর উক্ত জলীয় অংশই হরমোন ইনজেকশন দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করি।

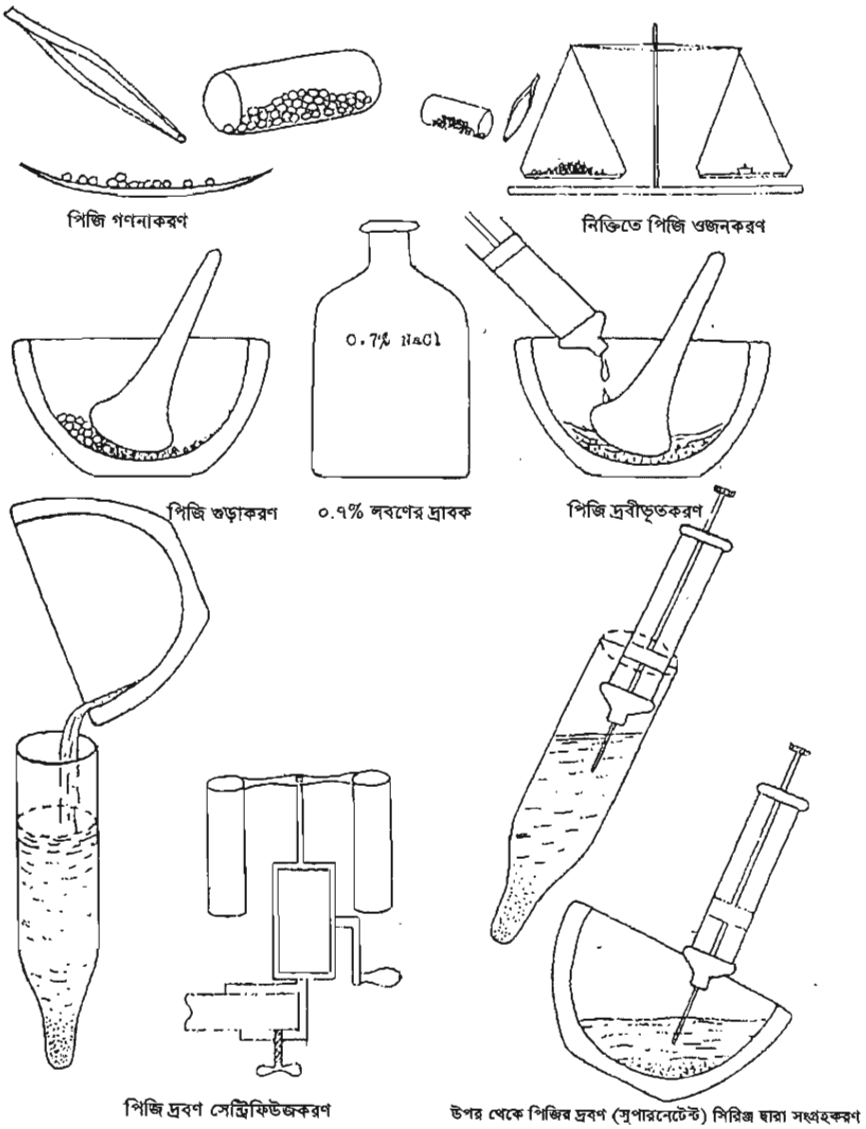

চিত্র- কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার্য পিজি এর দ্রবণ প্রস্তুতকরণ

২০২০

উপকরণ:

১। সুই

২। মাপন যন্ত্র

৩। হামান দিস্তা

৪। টিস্যু হমোজিনাইজার

৫। সেন্ট্রিফিউজ মেশিন

৬। বিশুদ্ধ পানি

৭। টিস্যু পেপার

৮। সিরিঞ্জ

৯। বিকার

কাজের ধারা :

১। মাছের প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এমন একটি হ্যাচারির সাথে যোগাযোগ করি।

২। শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে হাজির হই।

৩। প্রথমেই মাছের প্রজাতি ও ওজন জেনে ছক "ক" অনুযায়ী ইনজেকশনের ডোজ ও প্রয়োগ মাত্রা হিসেব করে নেই।

৪। অ্যালকোহল বা এসিটোনে রক্ষিত (PG) কে টিস্যু পেপারে চেপে শুষ্ক করি।

৫। শুষ্ক পিজিকে সামান্য পতিত পানি বা ০.৩% লবণ দ্রবণসহ একটি টিস্যু হোমোজিনাইজারে পিষি।

৬। পিজি গুলানো দ্রবণটি সেন্ট্রিফিউজ দ্বারা থিতিয়ে নেই।

৭। সবশেষে উপরের পরিষ্কার দ্রবণ পৃথক করি আর এই দ্রবণই হলো তৈরিকৃত হরমোন ইনজেকশন দ্রবণ।

৮। মাছের দেহের মাংস পেশিতে নবম স্থানে ইনজেকশন দেই।

ছক "ক"

মাছের নাম	পিজির পরিমাণ (প্রতি কেজি মাছ)		মোট
	১ম ইনজেকশন	২য় ইনজেকশন	
কাতলা	১-৪ মিলিগ্রাম	৭-৮ মিলিগ্রাম	৯-১২ মিলিগ্রাম
রুই ও মৃগেল	২-৩ মিলিগ্রাম	৫-৬ মিলিগ্রাম	৭-৯ মিলিগ্রাম
সিলভার কার্প	২-৪ মিলিগ্রাম	৮-১০ মিলিগ্রাম	১০-১৪ মিলিগ্রাম
গ্রাসকার্প	২-৪ মিলিগ্রাম	৭-৯ মিলিগ্রাম	৯-১৩ মিলিগ্রাম

জব নং-০৬

জবে নাম : মাছকে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করা ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

অন্ত মাংসপেশীয় (intramuscular) ইনজেকশন দ্বারা হরমোন ব্রুড মাছে প্রয়োগ করি। (এছাড়া অন্তঃগহবরীয় (intramuscular) ইনজেকশনের মাধ্যমে ও হরমোন প্রয়োগ করা যেতে পারে।) অন্যদিকে ইনট্রামাসকুলার ইনজেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি সহজতর ও বেশি কার্যকরী । এ ইনজেকশন সাধারণত লেজের অঞ্চলে অথবা পৃষ্ঠ পাখনার নিচে এবং পার্শ্বরেখার উপরের অংশে প্রয়োগ করি। দুটো ইনজেকশনের ক্ষেত্রে উভয় পাশে ১টি করে দেই। ইনট্রামাসকুলার ইনজেকশনের জন্য একটি আঁইশের নিচে প্রথম দেহের সমান্তরালে এবং পরে ৪৫° কোণে সুচ প্রবেশ করাই। ২ সি.সি. মাপের হাইপোডামিক সিরিঞ্জ হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করি। B.D.H (ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস) ২২ নং সুচ ১-৩ কেজি ওজনের মাছকে এবং ছোট আকারের মাছকে ১৯ নং সুচ দিয়ে সহজে ইনজেকশন দেই ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১ । ব্রুড মাছ
২ । সিরিঞ্জ ও সুচ
৩ । গামছা
৪ । স্পঞ্জের প্যাড
৫ । খাতা ও পেন্সিল ইত্যাদি
৬ । সূক্ষ্ম ব্যালেন্স
৭ । টেস্ট টিউব
০৮ । পিজি
৯ । সেন্ট্রিফিউজ

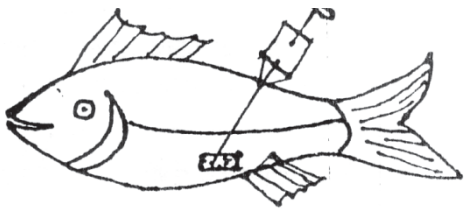

চিত্র : দেহগহবরে বা পায়ু পাখনার নিচে

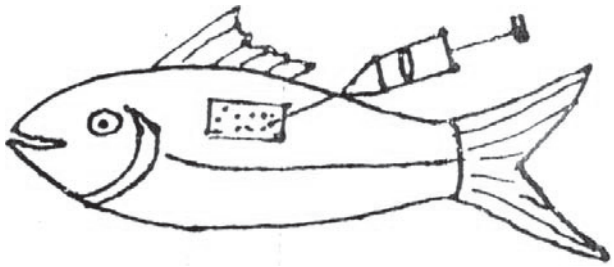

চিত্র : পৃষ্ঠ পাখনার নিচে এবং মাংসপেশির ভিতরে

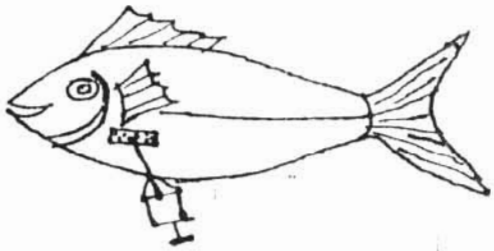

চিত্র : পেক্টোরাল ফিন বা শ্রোণি পাখনার গোড়ায় যেখানে আঁইশ নেই এবং একটু উঁচু থাকে

চিত্র : লেজের নিকটে মাংসপেশির ভিতরে

কাজের ধারা :

১। মাছের প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এমন একটি হ্যাচারিতে যাই।

২। নির্ধারিত সময়ে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে হাজির হই।

৩। মাছের প্রজাতি ও আকার অনুযায়ী ইনজেকশন ডোজ বা প্রয়োগ মাত্রা হিসেব করে নিই।

৪। ইনজেকশন দেওয়ার জন্য সিরিঞ্জ দিয়ে দ্রবণ উঠিয়ে নিই।

৫। মাছের দেহের মাংশপেশির নরম স্থানে বা উপর পৃষ্ঠ পাখনার নিচে বা পার্শ্বরেখায় ইনজেকশন প্রয়োগ করি।

৬। এবারে একটি আঁইশের নিচে প্রথমে দেহের সমান্তরালে এবং পরে ৪৫° কোণে সুচ প্রবেশ করিয়ে ইনজেকশন প্রয়োগ করি।

৭। গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছবিসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-০৭

জবের নাম : পরিপক্ব ডিম ও নিষিক্ত ডিম শনাক্তকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কার্প হ্যাচারিতে দুই প্রণালিতে ডিম নিষিক্ত হয়।

১। **সহজাত বা স্বাভাবিক পদ্ধতি :** হরমোন ইনজেকশন দেয়ার পর স্ত্রী মাছকে ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে রাখি। পুরুষ মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেয়ার পর পৃথক ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে স্ত্রী মাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখি। স্ত্রী মাছের ডিম ছাড়ার ২ ঘণ্টা পূর্বে পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের ব্রিডিং পুলে স্থানান্তর করি। স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের সাহচর্যে ডিম পাড়ে ও ডিম নিষিক্ত হয়।

২। **স্ট্রিপিং পদ্ধতি :** হরমোন ইনজেকশন দেয়ার পর স্ত্রী মাছকে ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে রাখি। পুরুষ মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেয়ার পর পৃথক ব্রিডিং পুলে স্রোত ও ফোয়ারা সহকারে স্ত্রী মাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখি। ডিম পাড়ার সঠিক সময়ে স্ত্রী মাছ ধরে পেটে সামান্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পাত্রে ডিম সংগ্রহ করি। এরপর পুরুষ মাছের পেটে চাপ দিয়ে মিল্ট পূর্ব সংগৃহীত ডিমের উপর ফেলি এবং মুরগির নরম পালক দিয়ে মিল্টকে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে ডিমকে নিষিক্ত করি। নিষিক্ত ডিমকে পরিমাপ সহকারে হ্যাচিং জার অথবা হ্যাচিং পুলে পানির স্রোত ও ফোয়ারার মধ্যে স্ফুটনের জন্য রাখি।

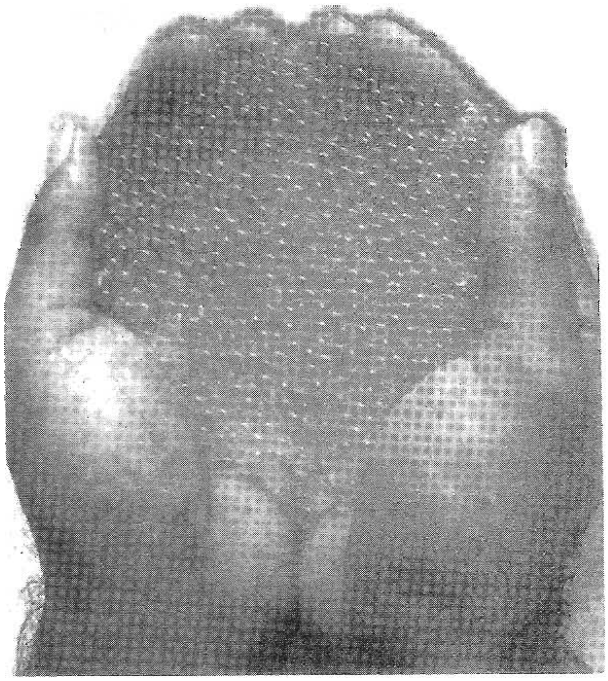

চিত্র হাতের মধ্যে ডিম

উপকরণ :

১। প্রজনন চালু আছে এমন হ্যাচারিতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন।

২। আতশ কাচ

৩। খাতা কলম ইত্যাদি।

কাজের ধারা :

১। প্রজনন কার্যক্রম আছে এমন হ্যাচারির সাথে আগে যোগাযোগ রাখি।

২। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে যাই।

৩। সহজাত পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্রুড মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেয়ার ৪-৬ ঘণ্টা পর থেকে সার্কুলার ট্যাংকে পুরুষ ও স্ত্রী মাছের কার্যাবলি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি। এক্ষেত্রে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ার পর পুরুষ মাছ শুক্রাণু ছেড়ে তা নিষিক্ত করা পর্যবেক্ষণ করি।

৪। চাপ পদ্ধতিতে ব্রুড মাছকে দ্বিতীয় ইনজেকশন দেয়ার পর ৪-৬ ঘণ্টা পর থেকে স্ত্রী মাছের পেটে চাপ দিয়ে পরিষ্কার গামলায় ডিম সংগ্রহ করি এবং পুরুষ মাছের শুক্র ডিমের উপর দিয়ে পালক দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিষিক্ত করি।

৫। সাদা থালায় কয়েকটা ডিম আতশ কাচ দিয়ে ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করি এবং খাতায় ছবি আঁকি।

৬। গৃহীত পর্যবেক্ষণের ছবিসহ ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

জব নং-০৮

জবের নাম : ভালো মানের রেণুপোনা শনাক্তকরণ

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

যে সমস্ত হ্যাচারিতে ভালো গুণ সম্পন্ন ব্রুড মাছ থেকে রেণু উৎপাদন করে সেখান থেকে রেণু সংগ্রহ করি। ভালো ও খারাপ রেণুর বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো:

পর্যবেক্ষণ	ভালো রেণু	খারাপ রেণু
নড়াচড়া	দ্রুত সাঁতার কাটে	কম সাঁতার কাটে
দেহের রং	কালচে বা বাদামি	সাদা ও ফ্যাকাসে
হাত দিয়ে	তাড়াতাড়ি নড়ে	ধীরে নড়ে
হঠাৎ পাত্রে টোকা দিলে	লাফিয়ে ওঠে	কোনো সাড়া দেয় না
স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীত দিকে চলে	স্রোতের অনুকূলে চলে

উপকরণ :

১। মাছের রেণু
২। সাদা গামলা
৩। আতশ কাচ
৪। স্কেল
৫। খাতা ও পেন্সিল

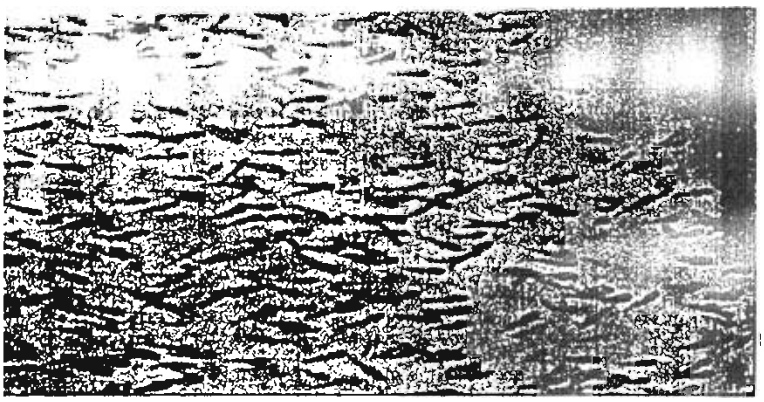

চিত্রঃ রেণু পোনা।

কাজের ধারা:

১। বিদ্যালয়ের নিকটতম কোনো হ্যাচারির মালিকের সাথে যোগাযোগ করে কিছু রেণু পোনা আনার ব্যবস্থা করি।

২। একটি বড় সাদা গামলায় কতকগুলো রেণু পাতিল থেকে নেই।

৩। মাছের রেণু লাফালাফি করে কিনা এবং যথেষ্ট প্রাণশক্তি আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করি।

৪। রেণুর গায়ের স্বাভাবিক উজ্জ্বল কিনা, আঁইশ ওঠে কিনা বা শরীরে কোনো দাগ আছে কিনা আতশ কাচ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি।

৫। রেণুর পাখনা অক্ষত কিনা, কোনটা ভাঙ্গা, ছেঁড়া কিনা আতশ কাচ দিয়ে ভালোভাবে লক্ষ করি।

৬। রেণুর গা পিচ্ছিল কিনা অর্থাৎ গায়ে শ্লেষ্মা আছে কিনা অথবা খসখসে কিনা হাত দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি।

৭। সর্বোপরি প্রতিটি রেণুর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হৃষ্টপুষ্ট আছে কিনা, রোগাক্রান্ত দুর্বল বা চিকন হয়ে গেছে, লক্ষ্য করি।

৮। গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

২০২০

জব নং-০৯

জবের নাম : হ্যাচারিতে রেণুপোনার খাবার তৈরিকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : মাছের ডিম ফুটে বের হওয়ার পরের অবস্থাকে ডিম পোনা বলে। এ অবস্থায় এদের পেটের সাথে কুসুম থলি ঝুলে থাকে। কুসুম থলি থাকা অবস্থায় ডিম পোনা বাইরের কোনো খাদ্য খায় না। ডিম পোনার পেটে লেগে থাকা কুসুম থলি বা খাদ্য থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরের অবস্থাকে রেণু পোনা বলে। ডিম ফোটার ৬০ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কুসুম পূর্ণাঙ্গ শোষিত হয় এবং মুখ দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়। এ সময় থেকে কার্প জাতীয় মাছের রেণুকে খাদ্য প্রয়োগ করি। ক্যাটফিশ জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে হ্যাচিং-এর ১৮ ঘণ্টা পর থেকে খাবার দেওয়া শুরু করি। যদিও রেণু পোনার কুসুম থলি ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে তবু আত্মভুক বৈশিষ্ট্যের কারণে কুসুম থলি মিশে যাওয়ার আগেই ওদের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে।

সাধারণত ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ যেমন থাই পাঙ্গাশ, মাগুর, গুলশা, পাবদা, শিং, মাগুর, প্রভৃতি মাছের রেণুকে জীবন্ত খাদ্য যেমন জুপ্লাঙ্কটন, টিউবিফেক্স নামক লাল কেঁচো, আর্টিমিয়া ইত্যাদি দিই। হ্যাচিং এর ১ দিন পর থেকে রেণুকে খুব হালকা আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন তাজা মাছ সিদ্ধ করে পেস্ট করার পর নাইলন কাপড়ে ছেঁকে দুধের মতো তরল পদার্থ ৩ ঘণ্টা পরপর রেণুকে খেতে দিই।

সাধারণ কার্প জাতীয় মাছ যেমন : রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ইত্যিাদি মাছের রেণুকে অজীবন্ত খাদ্য দিই। অজীবন্ত খাদ্য হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে মুরগির ডিম, আটা, ময়দা, খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, কলিজা সিদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডিম সিদ্ধ করে কুসুমটা আলাদা করে পানিতে কচলে ভালো করে গোলাই। কুসুম গোলানো পানিকে সূক্ষ্ম কাপড়ে ছেঁকে নিই। ছেঁকে নেয়া তরল খাদ্য রেণু পোনার চৌবাচ্চায় দিনে ৩-৪ বার ছিটিয়ে দেই।

চিত্র : মুরগির ডিম সিদ্ধ করে রেণুর খাবার তৈরি

চিত্র : তৈরিকৃত খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি

উপকরণ :

১। মুরগির ডিম সিদ্ধ

২। তাজা মাছ সিদ্ধ

৩। পাতলা কাপড়ের টুকরা বা গামছা

৪। খাতা পেন্সিল ইত্যাদি

কাজের ধারা :

১। কার্প জাতীয় মাছের রেণু ও ক্যাটফিশ জাতীয় মাছের রেণু আছে শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তা এমন একটি হ্যাচারির মালিকের সাথে যোগাযোগ করি।

২। নির্দিষ্ট সময় শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে যাই।

৩। চৌবাচ্চার হাপায় রাখা রেণুর পেটে কুসুম থলি আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করি।

৪। কার্প জাতীয় মাছের রেণুর ক্ষেত্রে, রেণুর পরিমাণ জেনে প্রয়োজনীয় ডিম সিদ্ধ করে ডিমের কুসুম পানিতে গুলে কাপড় দিয়ে ছেঁকে হাপার মধ্যে ছিটিয়ে দেই।

৫। ক্যাটফিশ জাতীয় মাছের রেণুর ক্ষেত্রে, রেণুর পরিমাণ জেনে প্রয়োজনীয় মাছ সিদ্ধ করে কাপড় দিয়ে ছেঁকে রেণুকে খেতে দেই।

৬। গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-১০

জবের নাম : পরিবহনের নিমিত্ত রেণু পলিথিন ব্যাগে প্যাকিং।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পোনা পরিবহণে দক্ষতা মাছ চাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফলভাবে পোনা পরিবহনের উপর মাছ চাষে লাভ অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিভিন্নভাবে পোনা পরিবহন করা গেলেও আধুনিক পদ্ধতি হলো পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা। এ পদ্ধতি খুবই নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত। এভাবে পোনা দূরদূরান্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহন সম্ভব এবং পোনার মৃত্যুহারও অনেক কম।

আধুনিক পদ্ধতিতে রেণু প্যাকিং ও পরিবহনের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হয়।

ক) পোনা টেকসই করা : ঘণ্টা দুয়েক আগে থেকে রেণুকে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করে রাখি। সব রেণু হাপার এক কোণে আনি। হাপার তলদেশে কোনো অভুক্ত খাদ্য মরা রেণু থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলি। আস্তে আস্তে পানির ঝাঁপটা দিয়ে দিয়ে সব রেণুকে অল্প জায়গায় আনি।

খ) রেণু মাপা : রেণু মাপার জন্য আয়তন পদ্ধতি অনুসরণ করি। হাপার অল্প জায়গায় আনা রেণুকে আরো গুটিয়ে হঠাৎ করে পানির উপরে অল্প সময়ের জন্য ওঠাই। ফলে সব রেণু এক জায়গায় চলে আসে এবং পানি পড়ে যায়। এভাবে দাগ কাটা বিকার দিয়ে মেপে খুব দ্রুত পলিথিন ব্যাগে রাখা পানির মধ্যে দেই।

গ) প্যাকিং : পলিথিন ব্যাগের মধ্যে রেণু পরিবহন করি। সাধারণত ৩৬ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি মাপের দুটো পলিথিনের ব্যাগ এক সাথে ব্যবহার করি। ব্যাগগুলোতে কোনো ছিদ্র আছে কিনা তা পরীক্ষা করার পর একটা ব্যাগের মধ্যে আর একটা ব্যাগ ঢুকিয়ে ব্যাগের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পানি দেই। আনুমানিক ১০ লিটার পানিতে ১২৫ গ্রাম থেকে ২০০ গ্রাম রেণু প্যাকিং করি।

পলিথিন ব্যাগ রেণুসহ একটি চটের ব্যাগের মধ্যে ঢুকাই এভাবে পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে অক্সিজেন পূর্ণ করে মুখ ভালো করে বাঁধি যাতে বাতাস না বেরুতে পারে। দুটি পলিথিন ব্যাগ পৃথকভাবে টাইট করে বাঁধি। এবারে রেণুভর্তি প্যাকেট ঠাণ্ডা রাখার জন্য চটের ব্যাগ ভিজিয়ে দেই। এভাবে প্যাকেট করা রেণু ২০-২৫ ঘণ্টা দূরত্বের জন্য পরিবহন করি।

উপকরণ :

১। প্যাকেটযোগ্য রেণু

২। পলিথিন ব্যাগ

৩। সুতলি

৪। চটের ব্যাগ

৫। অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার

৬। বিকার

৭। খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি।

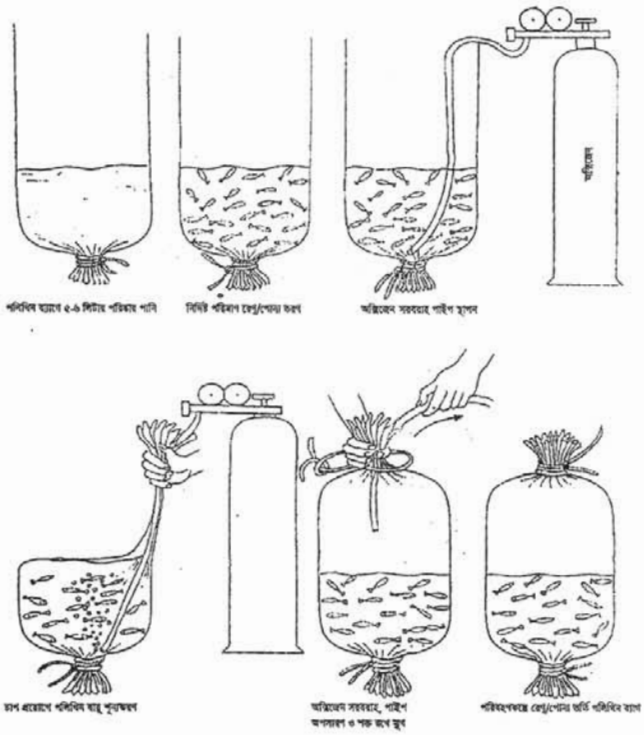

চিত্র– আধুনিক পদ্ধতি

কাজের ধারা :

১। রেণু বিক্রয়ের জন্য প্যাকিং করা হবে এমন একটি হ্যাচারিতে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখি।

২। নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণি শিক্ষকসহ হ্যাচারিতে যাই।

৩। হাপার মধ্যে রেণু টেকসই করি এবং অন্যান্য ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করি।

৪। পলিথিন ব্যাগের ছিদ্র পরীক্ষা করে একটি ব্যাগের মধ্যে আর একটি ঢুকিয়ে রেডি করি এবং ব্যাগে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিষ্কার পানি দিয়ে রাখি।

৫। হাপার মধ্যে থেকে খুব দ্রুততার সাথে বিকার দিয়ে রেণু পরিমাপ করে ব্যাগের মধ্যে দেই।

৬। অক্সিজেন সিলিন্ডারের নল ব্যাগের পানির মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে অক্সিজেন দিয়ে রেণুর ব্যাগ পূর্ণ করি। খুব সাবধান ব্যাগের মুখ খুব শক্ত করে সুতলি দিয়ে বাধি।

৭। রেণুর ব্যাগ চটের ব্যাগের মধ্যে দিয়ে চটের ব্যাগ সামান্য ভিজিয়ে দেই।

৮। প্যাকিং করা রেণু এখন পরিবহনের জন্য তৈরি করি।

৯। গৃহীত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখি।

জব নং-১১

জবের নাম : প্রজনন হাপা তৈরিকরণ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মাছের প্রজননের জন্য উন্নত মানের মশারির যে জাল ব্যবহৃত হয় তাকেই হাপা বলা হয়। হাপায় প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে রেণু পোনা ফুটানোর জন্য যে হ্যাচিং হাপা ব্যবহৃত হয় তা পাতলা মার্কিন কাপড় সেলাই করে তৈরি করা হয়। এ ধরনের হাপায় উপরে ঢাকনা থাকে না। এ ক্ষেত্রে দুটি হাপা থাকে একটি বাইরের দিকে এবং অপরটি ভিতরের দিকে। বাইরের হাপার আকার সাধারণত ২×১×১ ঘন মিটার। ফিতা মার্কিন কাপড় সেলাই করে এর ফিতা তৈরি করা হয়। ভিতরের হাপাটির আকার ১.৫×.৭৫×.৭৫ ঘন মিটার। কাপড়ের তৈরি ভিতরের হাপাটি বাইরের হাপার সাথে সাথে ফিতার সাহায্যে বেধে রাখা হয়। বাংলাদেশে সাধারণত কমন কাপ বা কার্পিও মাছ এবং থাই সরপুঁটি বা রাজপুঁটির ক্ষেত্রে হাপায় প্রণোদিত প্রজনন বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমেই ব্রুড কার্পিও এবং রাজপুঁটি সংগ্রহ করে যত্নের সাথে পুকুরে মজুদ করে প্রতি পালন করতে হয়। সাধারণভাবে প্রজননের সময় একটি স্ত্রী মাছের সাথে দুইটি পুরুষ মাছের প্রয়োজন হয়। প্রতিপালনের পর নির্ধারিত মাত্রায় পুং ও স্ত্রী মাছকে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করে প্রজনন হাপায় ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রজনন হাপায় ছেড়ে দেয়ার ৩ ঘন্টা পর স্ত্রী ব্রুড মাছ ডিম ছাড়ে এবং সাথে সাথেই পুং ব্রুড মাছ শুক্রাণু ছেড়ে দেয় ফলে ডিম নিষিক্ত হয় এবং ভ্রূণ তৈরি হয়। ভ্রূণকে তিনদিন পর্যন্ত কোনো ধরনের খাবার দিতে হয় না। কারণ এসময় ভ্রূণ কুসুম থলি থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে। তিনদিন পর রেণুকে বাইরে থেকে খাবার দিতে হয়। এসময়ে সাধারণত সিদ্ধ ডিমের কুসুম গুলিয়ে খাবার হিসেবে দেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। মশারি আকৃতির মার্কিন কাপড়, সুতা, সুচ, রশি, বাঁশের খুঁটি ইত্যাদি।

২। ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, শার্পনার স্কেল ইত্যাদি।

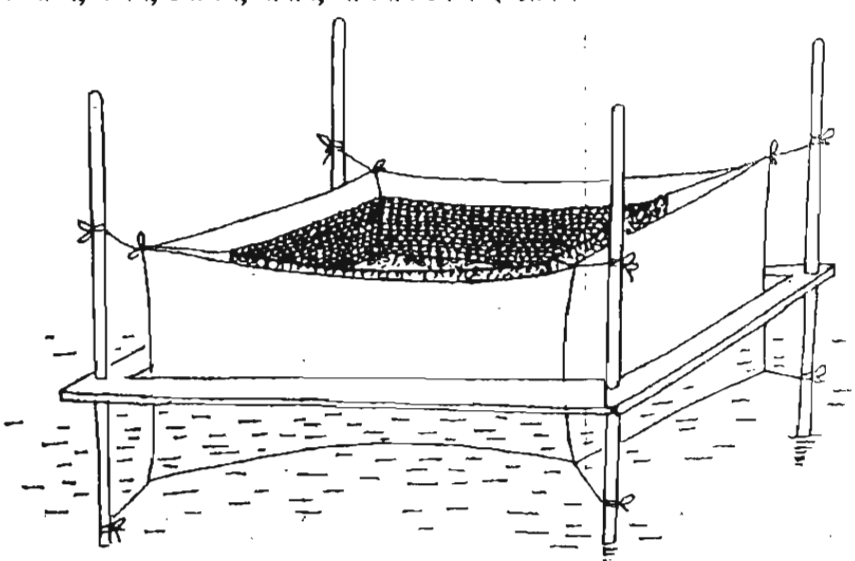

চিত্র : মাছের প্রজনন হাপা

কাজের ধারা:

১। প্রজনন হাপা ব্যবহার করে এমন হ্যাচারির সাথে যোগাযোগ করি।

২। শ্রেণিশিক্ষকসহ নির্দিষ্ট সময়ে হ্যাচারিতে যাই।

৩। প্রথমেই পাতলা মার্কিন কাপড় নিই।

৪। প্রতিটি হাপার আকার ২×১×১ ঘন মটার।

৫। অত:পর কাপড় সেলাই করে মশারি তৈরি করি।

৬। এবার মশারিটিকে উল্টিয়ে স্থাপন করি।

৭। উল্টিয়ে স্থাপনকৃত মশারিটি হলো তৈরিকৃত হাপা

৮। হ্যাচারিতে মৎস্য প্রজননের সময় তৈরিকৃত হাপাটি ব্যবহার করি।

৯। গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

জব নং-১২

জবের নাম : তেলাপিয়া মাছের খাদ্যে হরমোন মিশ্রণ অনুশীলন।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

অনেক দেশে তেলাপিয়া চাষ জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণ ও গ্রীষ্ম অঞ্চলীয় আবহাওয়ায় এদের প্রায় সব বাণিজ্যিক প্রজাতির ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিপক্বতার ফলে পোনা উৎপাদন একটি প্রধান সমস্যা। এই কারণে চাষকালীন সময়ে এদের অধিক হারে প্রজননের জন্য পোনার ঘনত্ব প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং আহরণযোগ্য মাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কমে যায়। এই সমস্যা উত্তরণের জন্য ১৯৬০ সাল থেকেই এই মাছ চাষে অনিয়ন্ত্রণ যোগ্য প্রজনন বন্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটেছে। এসব পদ্ধতি হলো পোনা বাছাই করে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ আলাদাকরণ সংকরায়ণ করে হরমোন প্রয়োগ করে পুরুষ পোনা উৎপাদন এবং জেনেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে তেলাপিয়ার সব পুরুষ জাতের পোনা উৎপাদন খুবই কষ্টসাধ্য বিধায় বর্তমানে এন্ড্রোজেন হরমোন প্রয়োগে মনোসেক্স সব পুরুষ জাতের পোনা উৎপাদন খুব সহজ কৌশল হিসেবে গ্রহণযোগ্য পেয়েছে। এই পদ্ধতিতে ক্ষুদে পোনাকে প্রথম খাবার গ্রহণের সময় হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ করে পুরুষ পোনায় রূপান্তরিত করা হয়।

হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরি :

১। হরমোন মাত্রা ৫০ মিলিগ্রাম ১৭-α (আলফা) মিথাইল টেসটোসটেরন (17- α -Methl Tertosterone) ১০০ মিলি ইথাইল অ্যালকোহল (৯৫%) সাথে দ্রবীভূত করা হয়।

২। হরমোন দ্রবণ এক কেজি পাউডার খাবারের ৫০% সাধারণ খাবার ৫০% ফিশমিল সাথে ১০-১৫ মিনিট সময় ধরে মিশাই।

৩। তৈরিকৃত খাবার পরে সাধারণ তাপমাত্রায় শুকাই।

৪। হরমোন মিশ্রিত শুস্ক খাবার কক্ষ তাপমাত্রায় অথবা ৪ সে. তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটরে (সর্বোচ্চ ৭দিন) সংরক্ষণ করি।

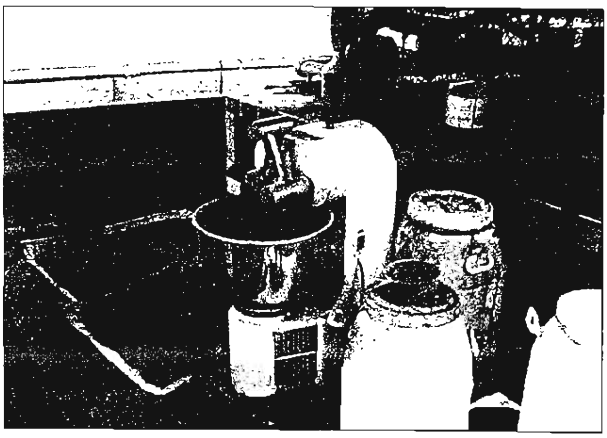

চিত্র : খাবারের সাথে হরমোন মিশ্রণের স্বয়ংক্রিয় মেশিন

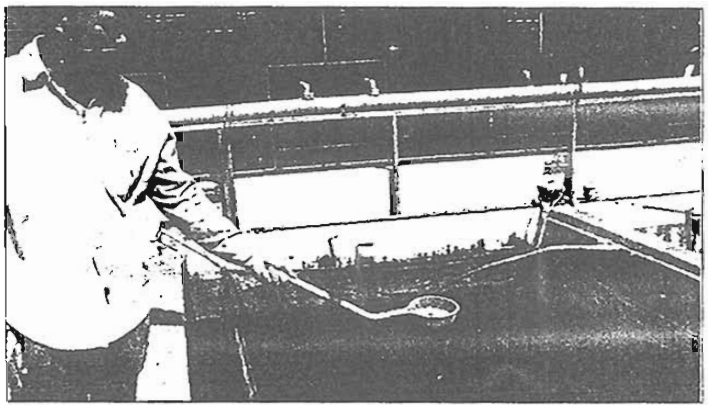

চিত্র : ট্রানজিটরি ট্যাংকে হরমোন মিশ্রিত খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি

মজুদ দ্রবণ ব্যবহার করে হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরি :

মজুদ দ্রবণ তৈরি করে ১০০ কেজি খাবার তৈরির জন্য কয়েক সপ্তাহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায় ।

১ । ১৭-(আলফা) টেসটোসটেরন ১ লিটার ইথানলের (৯৫%) সাথে দ্রবীভূত করে মজুদ দ্রবণ তৈরি করি ।

২ । ১ কেজি মিহি খাবার একটু শুষ্ক পাত্রে রাখি।

৩ । পরে ১০ মি.লি মজুদ দ্রবণ পুনরায় ১০০ মি.লি ইথানলের সাথে মিশাই ।

৪ । এই দ্রবণটি ধীরে ধীরে খাবারের সাথে সংমিশ্রণ করে হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরি করি।

৫ । প্রস্তুতকৃত খাবার ১০-১৫ মিনিট স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শুকিয়ে তেলাপিয়ার মনোসেক্স পোনার উৎপাদন কার্যক্রম ব্যবহার করি ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১ । মাছের পোনা

২ । হরমোন

৩ । হাপা

৪ । ব্যালেন্স ও স্কীং ব্যালেন্স

৫ । সেন্ট্রিফিউজ মেশিন

৬ । হামান দিস্তা

৭ । পিজি

কাজের ধারা :

১ । নিকটস্থ একটি তেলাপিয়ার প্রজনন হ্যাচারিতে যাই ।

২ । শ্রেণি শিক্ষসহ নির্দিষ্ট দিনে ও সময় তেলাপিয়ার হ্যাচারিতে যাই ।

৩ । হরমোন মিশ্রিত খাবার তৈরির যন্ত্রপাতিগুলো পর্যবেক্ষণ করি ।

৪ । গৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি ।

৫ । হ্যাচারির অভিজ্ঞ কর্মীর সহায়তায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছগুলো দেখি ও ছবি আঁকি ।

জব নং-১৩

জবের নাম : পোনা উৎপাদনের কর্মপরিকল্পনা ।

জবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

একটি মৎস্য প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড কখন ও কীভাবে করা হবে কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মালামাল কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে ইত্যাদি বিষয় ঠিক রাখার নামই হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা । বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষের মধ্যে পোনা উৎপাদন অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্প । পোনা উৎপাদন খুব লাভজনক প্রকল্প । খুব অল্প সময়ে অল্প জায়গায় এবং অল্প মূলধনে অনেক বেশি মুনাফা করা যায় । বাড়ির কাছে ছোট ছোট পুকুর তৈরি করে কুটির শিল্পের মতো পোনা উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাড়ানো সম্ভব । এখানে নমুনা হিসেবে পোনা উৎপাদনের পরিকল্পনা দেওয়া হলো :

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	দর	মোট খরচ
রোটেনন	১ কেজি	৩৫০/-	৩৫০/-
চুন	১০ কেজি	১২/-	১২০/-
গোবর	২০০কেজি	১/-	২০০/-
টিএসটি	১ কেজি	৩২/-	৩২/-
ইউরিয়া	১ কেজি	১৬/-	১৬/-
সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন	৫০ মি.লি.	৮০/-	৮০/-
রেণু(সিলভার কার্প)	২৫০গ্রাম	১৫০০ কেজি	৩২৫/-
ডিম (ডিমের কুসুম)	৬টি	৭০০/-	৪২/-
ময়দা	১ কেজি	২৫/-	২৫/-
সরিষার খৈল	১০০ কেজি	৩০ কেজি	৩০০০/-
চালের কুঁড়া	১০০ কেজি	১০ কেজি	১০০০/-
জালটানা		থোক	১৬০০/-
রেণু সংগ্রহর জন্য যাতায়াত		১০০০/-	১০০০/-
মোট			৭৭৯০/-

প্রতিটি পোনা পঞ্চাশ পয়সা হিসাবে ৫০,০০০ হাজার পোনার দাম ২৫০০০ হাজার টাকা

সুতরাং লাভ = ২৫০০০-৭৭৯০ = ১৭২১০ (৩ মাসে আয়)

(স্থানীয় বাজার দর অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে)

উপকরণ :

১ । রোটেনন

২ । টিএসপি

৩ । চুন

৪ । গোবর

৫ । ইউরিয়া

৬ । সুমিথিয়ন

৭। ময়দা

৮। ডিম

৯। চালের গুঁড়া

১০। রেণু সংগ্রহের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা

১১। সরিষার খৈল

মাছের পোনা টেকসই ও পরিবহন

কাজের ধারা :

১। নিকটস্থ একটি মৎস্য খামারে যাই।

২। শ্রেণিশিক্ষকসহ নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য খামারে যাই।

৩। পোনা উৎপাদনের খামারে নিয়োজিত লোকের কাছ থেকে পোনা উৎপাদন বিভিন্ন ধাপ যেমন : পোনা পরিবহন, খাদ্য প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আয়-ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হই।

৪। পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করি।

তথ্যপঞ্জি

১. ইসলাম, মোঃ আমিনুল, ১৯৯৭। মাছের খাদ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ১৫৯ পৃঃ।

২. দাস বিষ্ণু, ১৯৯৭। মাৎস্য ও মাৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ৩৪২ পৃঃ।

৩. দাস, বিষ্ণু, ১৯৯৭। মাৎস্যসম্পদ ও ব্যবস্থাপনা (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ৩৬২ পৃঃ।

৪. দাস, বিষ্ণু, ১৯৯৭। মাৎস্যসম্পদ ও ব্যবস্থাপনা (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ৩৬৭ পৃঃ।

৫. দাস, বিষ্ণু, ১৯৯৭। মাৎস্য ও মাৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা (চতুর্থ খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ৩৪২ পৃঃ।

৬. হোসেন, এম,এ, হোসেন, মোঃ এরশাদ ও সরকার, শাহ আলম, ১৯৯৮। মৎস্য হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, স্কুল অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুলার ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ১৮৩ পৃঃ।

৭. চৌধুরী বজলুর রশিদ ও ইসলাম মোঃ আমিনুল, ১৯৯৮। মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুলার ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ১৪০ পৃঃ।

৮. বি এ আর আর এ, কেয়ার আই আই আর আর, ১৯৯৮। বাংলাদেশ মিঠা পানিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ চাষ : একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা। বাংলাদেশ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা; কেয়ার বাংলাদেশ, ঢাকা এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল রিকনস্ট্রাকশন, সিলাং, ফিলিপিন্স, ২০৮ পৃঃ।

৯. বাংলাদেশ অ্যাকুয়াকালচার অ্যান্ড ফিশারিজ রিসোর্স ইউনিট (বাফরু), ১৯৯৬। পুকুরে উৎপাদন জীববিজ্ঞান-কারিগরি নির্দেশিকা, বাফরু, ৫৮ পৃঃ।

১০. বাংলাদেশ অ্যাকুয়াকালচার অ্যান্ড ফিশারিজ রিসোর্স ইউনিট (বাফরু), ১৯৯৫। কার্পের চাষাবাদ। কারিগরি নির্দেশিকা, বাফরু, ওডিএ, ৭৮ পৃঃ।

১১. বাংলাদেশ অ্যাকুয়াকালচার অ্যান্ড ফিশারিজ রিসোর্স ইউনিট (বাফরু), ১৯৯৬। মৌসুমে পুকুরে মাছের চাষ-কারিগরি নির্দেশিকা, বাফরু, ৫৭ পৃঃ।

১২. মৎস্য উন্নয়ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্য পক্ষ সংকলন, ১৯৯৬। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৩. মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, ১৯৯৯। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

১৪. মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, ১৯৯৮। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

১৫. মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, ১৯৯৯। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

১৬. মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, ২০০০। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

১৭. মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, ২০০১। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

১৮. মৎস্য পক্ষ সংকলন, ২০০২। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

১৯. মাছ চাষ ম্যানুয়েল, মৎস্য পক্ষ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২০. মৎস্য পক্ষ সংকলন, ২০০৩। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২১. জাতীয় মৎস্য পক্ষ, ২০০৫। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২২. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান, ২০০৮। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২৩. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০০৯। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২৪. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০১০। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২৫. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০১১। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২৬. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০১২। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

২৭. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০১৩। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
২৮. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০১৪। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
২৯. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০১৫। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
৩০. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬। মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য পক্ষ, ১৯৯৬ সেমিনারসমূহের প্রতিবেদন।
৩১. নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, এ জেড এম এবং গোলাম ফারুক, ১৯৯৬। সহজ মাছ চাষ, উত্তর-পশ্চিম মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প, পার্বতীপুর], দিনাজপুর।
৩২. মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০০। পাঙ্গাশ মাছের চাষ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, পৃঃ ১৬।
৩৩. মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য ব্রুড মাছ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পুস্তিকা, পৃঃ ৫৫।
৩৪. মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষঃ উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প।
৩৫. খালেক, এম.এ, ১৯৯৭। পুকুর ব্যবস্থাপনা।
৩৬. ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল, ২০০১। অ্যাকোয়াকালচার। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃঃ ৩৫১।
৩৭. ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল, ২০০১। মৎস্য ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃঃ ২৬৭।
৩৮. আজাদ, মোঃ আবুল কালাম, ২০০৬। মাছ চাষের আধুনিক কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা প্রাইম পাবলিকেশনস, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩৯. হোসেন, ড. এম. জি, ২০০৫। বাংলাদেশে তেলাপিয়া চাষ-প্রজনন, মনোসেক্স পোন উৎপাদন এবং চাষাবাদ পদ্ধতি। ৫৫, কৃষ্টপুর, ময়মনসিংহ।
৪০. মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ২০০৬। উন্নত ভুট মাছ উৎপাদন ও প্রজনন পদ্ধতি। পৃঃ ১৪০।
41. Jhingran, V.G. 1982. Fish and Fisheries of India: Hindustan Publishing Corporation (India) Delhi.
42. Boyd, C.E., 1998. Water Quality for Pond Aquaculture, Auburn University, USA.
43. The artificial propagation of warm water finfishes: A Manual for Extension FAO-1980.
44. A Brief of department of fisheries: Bangladesh, July-1990
45. A Hatchery Manual for the common Chinese and Indian Major carps:
46. Nuryyuaman, AKM 1990. Cluster of ideas and actions fisheries Department in Bangladesh.
47. Tave, Doglas. Genetics for fish hatchery managers. Second Edition
48. Rahman, Ayyuur and Darell, 1986. General Guidelines for carp hatchery Brood Fish production and hatchery management.
49. Annual Report-2014; Department of Fisheries, Bangladesh.

সমাপ্ত

২০২০ শিক্ষাবর্ষ

ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য